মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি

(সন্ত্রাসবাদের স্বরুপ উন্মোচন)

لا اله الا الله محمد رسول الله

আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি

(সন্ত্রাসবাদের স্বরুপ উন্মোচন)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Asun Amra Santrasbader Akhra Madrasaguloke Khatam Kori
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ২৬ জানুয়ারী ২০১৫
First Print : 26 January 2015
Compose and PDF Creater Mohd.Abdul Alim (Auther of this Book)

Asun Amra Santrasbader Akhra Madrasaguloke Khatam Kori Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 26 January 2015 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 200/- (Two Hundred Rupise Only)

উৎসর্গ

আমিরুল মোমেনীন হযরত মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহীদ (হাফিযাহুল্লাহ), শহীদে আযম হযরত শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ), সালাহুদ্দীন আউয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) ও মুহাম্মাদ বিন কাসিম (রহিমাহুল্লাহ) প্রভৃতিদের নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য। যিনি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দেন, জীবন ও মৃত্যু দেন, সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, হাসান ও কাঁদান, ধ্বনী ও দরিদ্র করেন, উপকার ও অপকার করেন, যিনি প্রাণীকে এক বিন্দু অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি মানুষকে ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর উপাসনা করার জন্য।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মাদীনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি কোটি কোটি দরূদ ও সালাম, যিনি রাহমাতুল্লিল আ-লামিন, সাইদুল মুরসালীন, সাফিউল মুজনাবীন। যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী, শান্তির দুত, মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং কিয়ামতের দিন কঠিন হাশরের ময়দানে আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপীদের জন্য সুপারিশকারী। যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবী সৃষ্টি, সমগ্র ব্রম্ভান্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে মহান আল্লাহ পাক নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রকাশ করতেন না।

সালাম নিবেদন করি সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সমস্ত ফেরেস্তা (আঃ), সমস্তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), সমস্ত তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (রহঃ), চার মাযাহাবের চার ইমাম (রহঃ) এবং সমস্ত ওলী আওলিয়া-গওস-কুতুব (রহঃ)-এঁর প্রতি।

সালাম নিবেদন করি, পীরানে পীর বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এঁর প্রতি, খাজা মইনুদ্দীন চিশ্তী আজমীরী (রহঃ) এঁর প্রতি, শেখ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এঁর প্রতি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এঁর প্রতি, হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এঁর প্রতি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এঁর প্রতি। যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা বড়ই করুণ। যেখানেই টুপি দাড়িওয়ালা মুসলমান দেখা যাচ্ছে তাদেরকে সেখানেই তাদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে। কাউকে আই. এস. আই এর এজেন্ট বা কাউকে আই. এস এর এজেন্ট বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পাকড়াও করা হচ্ছে। যদি তারা সন্ত্রাসবাদী প্রমাণ না হচ্ছে তাহলে তাদেরকে জোর করে এই. এস. আই এর এজেন্ট বলে স্বীকার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যদি তারা স্বীকার না করতে চায়ছে তাহলে প্রাণের হুমকী

দিয়ে বা আত্মীয় স্বজনদের ক্ষয়ক্ষতি করার হুমকী দিয়ে ভারতে গোয়েন্দা জঙ্গি বাহিনী মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে স্বীকার করতে বাধ্য করছে ।

সুতরাং এক কথায় ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা এমনই একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তাদের এদেশে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্থানটুকুও সুরক্ষিত নেই । চারিদিকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, পুলিশবাহিনী, গোয়েন্দাবাহিনী মুখ হাঁ করে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের ভক্ষণ করার জন্য, এই দেশ থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য কিংবা তাদেরকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য । প্রতিবাদ করতে গেলেই কপালে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে জেলে পুরবে, অত্যাচার করবে, দুই ঠ্যাঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে কারাগারে । যেখানে সেখানে তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একটা হুলস্থুল কান্ড ঘটিয়ে দেবে আর মিডিয়ার সহযোগিতায় তারা প্রচার করবে যে এই বিস্ফোরণ মুসলমানরা ঘটিয়েছে । মুসলমানদের অমুক অমুক সংগঠনের হাত এই বিস্ফোরণে আছে, অমুক অমুক মাদ্রাসায় এই বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল । যদি দেখা যায় যে কোন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কোন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাহলে ছলে বলে কৌশলে গোয়েন্দা বাহিনীর সহযোগিতার তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে এই বিস্ফোরণ মুসলমানরা ঘটিয়েছে ।

আমাদের ভারত সরকার আমেরিকার দালালে পরিণত হয়েছে । ভারতের সার্বভৌমত্ব আর বাকী নেই । আমেরিকা যা বলে তাই শোনে, আমেরিকা যাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয় ভারত সরকারও তাকে সন্ত্রাসবাদী বলে ভারতে বাজেয়াপ্ত করে, আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসবাদী বলায় ভারতও তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করে । আজ ভারতে ওসামার নাম নেওয়া এক ধরণের অপরাধ, মোল্লা ওমরের জয়গান গাওয়া আইনী শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কেন ? কারণ একটাই আমেরিকা ভারতকে যা শিখিয়েছে ভারত সরকারও বাধ্য শিশুর মতো তাই মুখস্ত করে গেছে । আর ভারতের কুত্তা মিডিয়া আমেরিকার পোষ্যপুত্রের মতো তা ফলাও করে প্রচার করেছে । কারণটা কি ? কারণ একটাই মিডিয়াগোষ্ঠী চায় না মুসলমানরা সমাজে শান্তিতে বসবাস করুক । পদে পদে মুসলমানদেরকে হেনস্থা করে তারা মজা লুটতে চায় ।

কিছুদিন আগের কথা । যখন ফ্রান্সের ‘চার্লি হেবদো’ পত্রিকায় আল কায়দা ও তালিবান মিলিত হয়ে হামলা করে এবং সাংবাদিক সহ বারো জন কার্টুনিষ্টকে হত্যা করে । কারণ তারা কয়েকবছর আগে মহানবী (সাঃ) এর কার্টুন চিত্র বানিয়ে তাদের পত্রিকায় সম্প্রসারণ করে । ফলে প্রতিবাদস্বরুপ মুসলমানরা সেই কার্টুনিষ্টদের হত্যা করে । ফলে সারা বিশ্বে উগ্রপন্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা চরমভাবে এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে । কিন্তু যখন এই কার্টুনিষ্টরা মহনবী (সাঃ) এর কার্টুনচিত্র (ব্যাঙ্গচিত্র) তৈরী করে তখন তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেন নি । ইঁদুর যেমন বিলে ঢুকে পড়ে সেইরকম তাঁরাও যে যাঁর বিলে ঢুকে পড়েছিলেন । কোন প্রতিবাদ করেন নি । তাঁদের যুক্তি ছিল যে এই চিত্র বানানো তাদের বাকস্বাধীনতা বা চিত্রশিল্পীর অধিকার । কিন্তু যখন সেই ফ্রান্সেই মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয়

ফরজ (বাধ্যতামূলক) বুরকাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় তখন এই বাকস্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের কোন নামপাত্তা ছিল না, তাঁরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একবারও মুখ খুলে প্রতিবাদ করে বলেননি যে কুরকা হল মুসলমানদের ধর্মীয় অধীকার। এই বুদ্ধিজীবিদের কাজকর্ম দেখে এটাই মনে হয় যে যত বাকস্বাধীনতা শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে। কিন্তু মুসলমানরা কোন প্রতিবাদ করতে গেলেই আমরা হয়ে যায় এই বাকস্বাধীতার ধ্বজাধারীদের কাছে মৌলবাদ, কট্টরপন্থী, সন্ত্রাসবাদ। প্রতিবাদ করা আর আমাদের বাকস্বাধীনতা থাকে না। কথা বলার অধীকার থাকে না অমুসলিমদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলাই হল বাকস্বাধীতা। তবে আমার বক্তব্য হল, যারা এই 'চার্লি হেবদো' পত্রিকায় হামলা করেছে তারা সঠিক কাজই করেছে কেননা, মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন, "আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে।" (সুরা বাকারাহ্, আয়াত ১৯১) সুতরাং হত্যাকারীরা কোন অপরাধ করেনি। তারা কুরআন শরীফ মান্য করে রসুলের দুশমনদের জাহান্নামে পাঠিয়েছে।

তবে এখন শোনা যাচ্ছে যে এই হত্যাকান্ড ফ্রান্সের গোয়েন্দাবাহিনী করেছে মুসলমানদের বদনাম করার জন্য। মুসলমানরা ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাতে যোগদান না করতে পারে সেজন্যই এই চক্রান্ত তারা জেনেশুনে করেছে। তবে আমি বলব যদি সত্যই ফ্রান্সের গোয়েন্দাবাহিনী এইসব মহানবী (সাঃ) এর ব্যাঙ্গচিত্র নির্মাণকারীদের হত্যা করে থাকে তাহলে তারা বরং মুসলমানদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে। যেহেতু ফ্রান্সের সুরক্ষাবাহিনী মজবুত সেজন্য মুসলমানরা সেই ব্যাঙ্গচিত্র নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছিল না তাই মহান আল্লাহই শত্রুদের হাত দিয়ে নবীর দুশমনদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা যারা নবীর ব্যাঙ্গচিত্র বানিয়েছিল তারা নিজেদের বাহিনীর হাতেই বেমত মারা গেছে।

এই বাকস্বাধীতার পান্ডাগুলো শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলাকেই বাকস্বাধীতা বলে এবং মহানবী (সাঃ) এর ব্যাঙ্গচিত্র বানানোকেই শিল্পীর অধীকার বলে দাবী করে কিন্তু কয়েক বছর আগে যখন মকবুল ফিদা হোসেন হিন্দুদের দেবদেবীদের উলঙ্গ মূর্তি অঙ্কন করেন তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, হিন্দু মহাসভা, আর. এস. এস. প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মকবুল ফিদা হোসেনের উপর চমরভাবে ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য করে তখন এই শিল্পীর স্বাধীনতার পান্ডারা বিলের মধ্যে লুকিয়েছিলেন। একবারের জন্যও তাঁরা ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন নি যে এটা শিল্পীর অধীকার। কারণ মকবুল ফিদা হোসেন মুসলমান ছিলেন। আর বুদ্ধিজীবিদের নিকট তো মুসলমানদের বাকস্বাধীনতার অধীকার নেই। বাকস্বাধীনতা তো কেবল তাদের নিজেদের জন্যই সীমাবদ্ধ। মকবুল ফিদা হোসেন জীবনের শেষ দিনেও ভারতর্ষ ফিরতে পারেন নি। এই হল আমাদের দেশের অবস্থা।

আমাদেরর বক্তব্য হল, যার যা মন চায়বে তাই বলার বা লেখার বা অঙ্কন করার অধীকার থাকাকেই কি বাক্স্বাধীনতা বা শিল্পীর স্বাধীনতা বলে ? এই স্বাধীনতাকে যদি স্বীকৃতি

দেওয়া হয় তাহলে কি অন্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে না ? উদাহারণস্বরুপ বলা যায়, কারও মাইকে গান শুনতে ভাল লাগে বলে সে নিজের বাড়িতে রাতে যতক্ষণ খুশি জোরে শোরে মাইক বাজাবে তাতে অন্যের নিষেধ করার কি অধীকার আছে ? এতো তার স্বাধীনতা । অন্যদিকে তার পাশের বাড়ির কর্মক্লান্ত লোকদের রাতেই তো বিশ্রামের প্রয়োজন হয় কিংবা কোনো মারাত্মক অসুস্থ লোককে নিয়ে পাশের বাড়ির লোকেরা খুবই ব্যতিব্যস্ত । তাই এই মাইক বাজানোর ফলে তাদের একটু আরামে থাকার স্বাধীনতায় বা নিরুপদ্রব অবস্থায় থাকার স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটবে না ?

আমরা জানি এর উত্তরে প্রত্যেক মত প্রকাশের বা বাক্স্বাধীনতার প্রবক্তারা এক বাক্যেই বলবেন, এরকম লাগামছাড়া বল্গাহীন স্বাধীনতাকে কোনদিন প্রকৃত স্বাধীনতা বলবেন না, কারণ - তাতে সামাজিক ভারসাম্য বা শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং এর দ্বারা দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

আর আমরা জানি এইসব বাকস্বাধীতার প্রবক্তারা যেভাবে বল্গাহীনভাবে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করেছেন তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয় । আর মহানবী (সাঃ) এর ব্যাঙ্গচিত্র তৈরী করে তাঁরা সমাজের কি উপকার সাধন করতে পেরেছেন ? এতে দেশের, সামাজের, মানবজাতির কি উন্নয়ন হয় ? এতে শুধু ধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছাড়ানোই হয় আর দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় । তাছাড়া আর কিছু হয়না ।

আমি আমাদের দেশের হিন্দু - মুসলমান আপামর জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলব, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন । দেশকে ভালবাসতে শিখুন । একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী করুন । সংঘবদ্ধ হন । আপনারা কো রাজনৈতিক পান্ডাদের কথায় কান দেবেন না । রাজনৈতিক নেতারা আজ পর্যন্ত দেশের জন্য কিছু করেনি । তারা আপনাদেরকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করে দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে । তাদের কাছে দেশের জনগনের কোন মূল্য নেই । তারা তাদের পোষা কুকুরকে যতটা ভালবাসে ততটা আপনাদেরকে ভালবাসেনা । তারা রাজনীতির জন্য সবকিছু করতে পারে । নিজের বাড়ির মেয়েকেও তারা রাজনৈতিক সার্থসিদ্ধির জন্য নিষিদ্ধপল্লীতে প্রেরণ করতে পারে । নিজের মাকেও তারা ওবামার বিছানায় পাঠাতে পারে । রাজনীতির জন্য তারা কি যে করতে পারে তা মুখে বলার নয় । তারা তসলিমা নাসরিনকে এমনি এমনি দেশে প্রবেশ করতে দেয়নি । বিনা সার্থে তারা তসলিমা নাসরিনকে ভারতের ভিসা দেয়নি । তসলিমা নাসরিনের যৌবন দেখে এই নারীলোলুপ নেতারা আজ উন্মত্ত কুকুরের মতো হয়ে গেছে । আর নিষিদ্ধপল্লী থেকে উঠে আসা তসলিমাও নিজের শরীরকে নেতাদের হাতে বিলীন করে দিয়েছে । সুতরাং দেশবাসী সাবধান হন । সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে শিখুন । একে অপরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা মনোভাব তৈরী করুন । তানাহলে এই রাজনৈতিক পান্ডারা বিচ্ছিন্নতাবাদের ফায়দা উঠিয়ে দেশকে বিক্রি করে দেবে । তাই দেশকে বাঁচাতে গেলে আমাদের ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ।

পরিশেষে একটি কথাই বলব, আমরা ভারতবাসীরা সন্ত্রাসবাদী নই । আমরা সন্ত্রাসবাদকে পছন্দ করি না । আমরা সন্ত্রাবাদকে ঘৃণা করি । আমরা সন্ত্রাসবাদের নির্মূল চায় । কারণ সন্ত্রাসবাদ দেশের জন্য অভিশাপ । সমাজের বুকে ফুটে উঠা মারাত্মক ক্যান্সার । এই ক্যান্সারের আমরা সমাপ্তি চাই । আর আমরা জানি দেশের মধ্যে সন্ত্রাস কারা সৃষ্টি করে ? কোন হিন্দু সন্ত্রাসবাদী হয়না, কোন মুসলমান সন্ত্রাসবাদী হয় । সন্ত্রাসবাদীদের কোন জাতই হয়না । তাদের পেশাই হল সন্ত্রাস । আর এই সন্ত্রাসসের মূল কারণ হল যে কোন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক নেতারা । তারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মুসলমানদের ঘাড়ে এর দায় চাপিয়ে দিয়ে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে তাদের অসৎ সার্থসিদ্ধির জন্য ।

তাই আমি আমার ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলব, কোন কুচক্রির কথায় কান দিয়ে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন না । মিডিয়ার কথায় কান দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করবেন না । মিডিয়া হল রাজনৈতিক নেতাদের কেনা গোলাম । রাজনৈতিক নেতরা যা বলে তাই তারা সম্পসারণ করে । যে নেতা যে মিডিয়াকে ক্রয় করেছে সেই মিডিয়া কখনো তার প্রভূর বিরুদ্ধে কথা বলবে না । কথা শুনবেও না । তাই আমি এইসব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্টিং মিডিয়ার নাম দিয়েছি কুত্তা মিডিয়া । এই কুত্তা মিডিয়া কখনো সঠিক তথ্য সম্প্রসারণ করেনা । যখন ইজরাইলের হানাদাররা ফিলিস্তিনের ৩০০০ হাজারের অধীক সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করল তখন তারা এই পুরো ব্যাপারকাকেই ধামাচাপা দিয়ে দিল । তারা তার কোন চিত্র সম্প্রসারণ করেনি । যদিও কেও ঠেলার চাপে প্রচার করেছে তাও ক্ষুদ্রায়তনে । পক্ষান্তরে যখন তেহরিকে তালিবানরা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এ্যন্ড কলেজে হামলা করে তখন এই কুত্তা মিডিয়া মিথ্যা তথ্য ফলাও করে প্রচার করতে থাকে । এই হল আমাদের দেশের কুত্তা মিডিয়ার অবস্থা । তাই আমরা এতদিনে বুঝতে পারছি কেন ইরাকের আবু বকর আল বাগদাদীর সংগঠন আই. এস. আই. এস.রা (ISIS/Islamic State Iraq and Siriya) মার্কিন সাংবাদিকদেরকে দিনের বেলায় খোলা আকাশের নিচে জবাই করছে । তাদের জবাই করে সেই দৃশ্য ইন্টারনেটে (Youtube) আপলোড করছে । এর জন্য দায়ী হল মিডিয়া । মিডিয়া যদি সত্য তথ্য প্রচার করত তাহলে তাদেরকে বাগদাদীর হাতে মরতে হত না ।

বর্তমানে আমেরিকা কথায় কথায় মানবতাবাদের বুলি আওড়ায় অথচ আমেরিকাই হল পৃথিবীর সবথেকে বড় মানবতা বিরোধী রাষ্ট্র । আমেরিকার হাতে যত নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে ততটা অন্য কোন সন্ত্রাবাদীদের হাতে হয়নি । আর এই মানবতা বিরোধী কাজ করতে সাহায্য করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ. নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন । আমেরিকা অস্ত্র তলাশের নাম করে ইরাকের মতো শান্তিপ্রিয় দেশকে তছনছ করে দিয়েছে । অথচ ইরাকে অস্ত্রের ভান্ডর আছে বলে কোন প্রমাণ আমেরিকা আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি । আর যদি ইরাকে অস্ত্র থেকেই থাকে তাহলে আমেরিকায় তাতে নাক গলানোর কোন অধীকার রাখে না, কেননা সেটা ইরাকের রাষ্ট্রগত ব্যাপার । আর থাকলেই বা কি হল ? আমেরিকার কাছে কি অস্ত্র নেই । সারা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় অস্ত্র সাপ্লাইকারী দেশ হল আমেরিকা ।

আমেরিকার অস্ত্র রাখার অধীকার আছে, আর ইরাকের নেই এটা কোন ধরণের নীতি ? এটা অবশ্য সকলের জানা হয়ে গেছে অস্ত্র রাখা ব্যাপারটি ছিল আমেরিকার একটি অজুহাত মাত্র । এই অজুহাতেই তারা নিরপরাধ সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেয় । সাদ্দামের স্থানে তারা তাদের অনুগত পুতুল সরকার বসায় । কিন্তু পুতুল সরকার বসিয়ে কি হল ? আজকে আবু বকর আল বাগদাদীর আক্রমনে সেই পুতুল সরকারও তছনছ হবার মতো অবস্থা । সেই সরকার তো আজ উচ্ছেদ হবার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ।

আজকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাবাদী হল আবু বকর আল বাগদাদী । কেন ? তার কারণ সে আজ আমেরিকার সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সে ইরাকের পুতুল সরকারের উচ্ছেদ করে ইসলামী শরীয়াত মোতাবিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় । তাই আমেরিকা ও তার পোষ্যপুত্রদের এতো জ্বালা । আমি বলব, বাগদাদীর উত্থানের জন্য দায়ী কে ? আমেরিকা যদি অবৈধভাবে ইরাকে আগ্রাসন না চালাত তাহলে বাগদাদীর উত্থান হত না । আমরিকা কর্তৃক অবৈধ আক্রমনের জন্যই বাগদাদীর সংগঠন উন্মত্ত হয়ে আমেরিকার পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে ।

যেটা বলছিলাম যে আমরিকাই হল পৃথিবীর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র । কিছুদিন আগে একটি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল, "নগ্ন ইরাকীদের সামনে সৈন্যরা দাঁত বের করে হসছে - এই বিকৃতরুচির ছবি প্রকাশিত হবার একসপ্তাহ পরেফ৬ঢ৬ফঢ়..........মার্কিন বাহিন স্বীকার করল, তাদের জিম্মায় থাকার সময় ইরাক ও আফগানিস্তানে ২৫ জন বন্দি মারা যায়, তাদের মধ্যে দুজন ইরাকে বন্দিকে আমেরিকানরা হত্যা করে ।" (Bush promises justice after abuse, The Times of India, Kolkata, 06.05.2004, p13 col 4)

নিউইয়ার্কের একটি পত্রিকা একখানা ছবি সংগ্রহ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে "কতকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন ভয়ে জড়সড় একজন বন্দি ।" (Iraq furore, The Hindustan Times, Kolkata, 30.04.2004, p 11 col 3)

আমেররকার "সেনাবাহিনীর একজন সেনা এবং সি. আই. এ-র একজন কন্ট্রাকটর একজন করে বন্দি হত্যা করে ।" (US probes prisoner death, The HindustanTimes, kolkata 03.05.2004)

"শনিবার দি ডেইলি মীরর পত্রিকা ব্রিটিশ বাহিনীর পাঁচটি সাদা কালো ছবি ছেপেছে, বলা হয়েছে এই সৈন্যরা বসরায় বোরকাঢাকা ইরাকিদের লাথি মেরেছে, পদদলিত করেছে, তাদের গায়ে মূত্রত্যাগ করেছে । বসরায় ইরাকের দক্ষিনাঞ্চলে, সেখানে বৃটেনের প্রায় ৭,৫০০ জন সৈন্য আছে ।" (Blair appalled by Basra abuse, The Times of India, Kolkata, 03.05.2004, p 13, col 2)

চোদ্দটি ইরাকি পরিবার অভিযোগ করেছে, "যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে ব্রিটিশ সৈন্যরা অন্যায়ভাবে তাদের আত্মীয় - পরিজনকে হত্যা করেছে ।" (UK troops accused of unlawful killing, The Times of India, Kolkata, 06. 05. 2004. p 13, col 6)

হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে সেনাদের এই কুকর্ম করতে উস্কানী দিয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরাই ।

"মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি বলছে, সন্দেহজনক বেআইনি হত্যাগুলির যথার্থ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রিটেন ইরাকে আইনের শাসনকে হেয় করেছে............অ্যামনেষ্টি বলেছে, টোটা-য় ২০০৩ সালের ১ মে-র পর থেকে ব্রিটিশ বাহিনী কমপক্ষে ৩৭ জন অসামরিক লোককে হত্যা করেছে, অথচ সেই সময় কিন্তু সাদ্দাম হুসেনকে উৎখাত করার যুদ্ধ সরকারীভাবে শেষ হয়ে গেছে ।" (UK troops accused of killing Iraqui civilians, The Times of India, Kolkata, 12.05.2004, p 14 col 6)

এই হল স্বঘোষিত মানবতাবাদের পুজারী আমেরিকার মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড । আর এই আমেরিকাকে আমাদের ভারত সরকার ভগবানের মতো পুজ্য বলে মনে করেন । আমেরিকার বিরুদ্ধে কারো মুখ খোলার সাহস নেই । কারণ সকলেই জানেন যে আমেরিকার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভূরা তার গলায় সন্ত্রাবাদী তকমা ঝুলিয়ে দিবে । যেমন আমেরিকা শায়খ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ, ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ প্রভৃতিদের গলায় সন্ত্রাসবাদী তকমা ঝুলিয়ে দিয়েছে । আর নেতাকে গদিচ্যুত করে আমেরিকার পুতুল সরকার বসিয়ে দেশটাকে গোলামে পরিণত করে দেবে । সেজন্য ভারত সরকার ও এই দেশের মিডিয়াগোষ্ঠি আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলে না । বরং আমেরিকাকে সমীহ করে চলে । আর যে সরকার একবার দিল্লীর সিংহাসনে বসবে সে পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত একবার আমেরিকা ভ্রমণ করতেই যাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পা চাটবার জন্য । অন্তত একবার বলে আসবে, "হুজুর ! আমি আপনার খিদমতে হাজির আছি । আমাকে কি করতে হবে বলুন ।"

কিছুদিন আগের কথা, রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ফোফি আন্নান বলেছিলেন যে কিভাবে সন্ত্রাসবাদ রুখতে হবে । তিনি সন্ত্রাসবাদ প্রতিকারের একটি ছক বলে দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন (এপ্রিল/২০০৫) পাঁচ 'D' এর কথা । প্রথম 'D' হল, "Dissuading the disaffected from choosing the tactic" অর্থাৎ যারা সন্ত্রাসে প্রভাবিত হয় তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সন্ত্রাবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল করতে হবে । দ্বিতীয় 'D' হল, "Denying terrorists the means to carry out attacks." অর্থাৎ সন্ত্রাসীদের হাতে কেউ যেন অস্ত্র তুলে না দেয় । তৃতীয় 'D' হল, "Deterring state support." অর্থাৎ সন্ত্রাসীদের কোনও রাষ্ট্র বা সরকার যেন সমর্থন না করে । চতুর্থ 'D' হল, "Developing state's preventive capacity." রাষ্ট্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে । পঞ্চম 'D' হল, "Defending human

rights in the struggle against the scourage." অর্থাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানবাধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে ।

কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন হল, আমেরিকা এই পাঁচটি 'D' এর মধ্যে একটাও কি মানে ? তারা একটাও মানে না । এখানে প্রথম 'D' এ বলা হয়েছে যে "যারা সন্ত্রাসে প্রভাবিত হয় তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সন্ত্রাবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল করতে হবে ।" কিন্তু আমেরিকাই হল পৃথিবীর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র । সে আর কাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল করবে ?

এখানে দ্বিতীয় 'D' এ বলা হয়েছে যে "সন্ত্রাসীদের হাতে কেউ যেন অস্ত্র তুলে না দেয় ।" অথচ আমেরিকাই হল পৃথিবীর সবথেকে বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্র । সারা পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রকে সে অস্ত্র বিক্রয় করে সাহায্য করেছে ।

এখানে তৃতীয় 'D' এ বলা হয়েছে যে "সন্ত্রাসীদের কোনও রাষ্ট্র বা সরকার যেন সমর্থন না করে ।" অথচ আমেইকাই হল সারা পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদের জন্মদতা । তারা সকল সন্ত্রাসীদের সাহায্য করেছে এবং নিজেরাই সবথেকে বেশি সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছে ।

এখানে চতুর্থ 'D' এ বলা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে ।" এখানেই কোফি আন্নান আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত করেছেন । বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাস দমনের নাম করে আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় করেছে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে তারা গণ আন্দোলনকে রোধ করার চেষ্টা করেছে এবং রাষ্ট্র নেতাই হয়ে উঠেছে সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নায়ক । ফলে সন্ত্রাস দমনের নাম করে বিভিন্ন রাষ্ট্র হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ।

এখানে পঞ্চম 'D' এ বলা হয়েছে যে, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানবাধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে ।" অথচ ইরাক ও আফগানিস্তানের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় আমেরিকা তথাকথিত সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে । তাদের দ্বারা মানবাধিকার ক্ষুন্ন থাকেনি ।

সুতরাং ফোফি আন্নানের বক্তব্য সন্ত্রাসবাদ দমনের ব্যপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ । সন্ত্রাসবাদ তো দমন হয়নি বরং সন্ত্রাস দমনের নামে রাষ্ট্র নিজেই হয়ে উঠেছে সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী । আর কোফি আন্নান মুলতঃ এই বক্তব্য দিয়ে আমেরিকার উপকার সাধনই করেছেন ।

তবে আমি বলব, কোফি আন্নানের এই বক্তব্য হল একটি ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত । কারণ, সারা পৃথিবীতে ইসলামিক সন্ত্রাস বা জিহাদী সন্ত্রাস বলে কিছু নেই । কোন মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয় । ইসলামিক সংগঠনগুলো সহিংসভাবে যা কিছু করছে

তা হল মূলতঃ তাগুতের (শয়তানের) বিরুদ্ধে ইসলামিক গণ আন্দোলন । ইসলামকে শত্রুর হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার আন্দোলন, আর সেজন্যই আমেরিকা এই আন্দোলনকারীদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করছে । আমেরিকা যাকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে তারই গলায় সন্ত্রাসবাদের তক্‌মা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । আর এই সন্ত্রাসবাদ দমনের নাম করে আমেরিকা একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আসছে এবং হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করছে । কিন্তু এই ব্যাপারে কোফি আন্নানের মুখে কুলুপ আঁটা রয়েছে । তিনি এক বারের জন্যও আমেরিকাকে সাবধান করেন নি । এক বারও আমেরিকাকে সংযত হতে বলেন নি । এমনকি তিনি আমেরিকাকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁর অশুভ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পথকে প্রশস্ত করার জন্য । একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ।

আমরা জানি রাষ্ট্র সংঘের নির্মাণই হয়েছে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য । ইসলামকে পঙ্গু করার জন্য এই রাষ্ট্র সংঘের কর্মকর্তারা দিনের পর দিন নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন । এই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, যখন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে তখন এই রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নান ইঁদুর যেমন বিলে ঢুকে থাকে ঠিক সেই রকম তিনি তাঁর বিলের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ঢুকে ছিলেন । কোন প্রতিবাদ করেন নি । একবারের জন্যও হুমকী দিয়ে বলেন নি যে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক । অথচ যখন তালিবানরা বামিয়ানে বৌদ্ধমূর্তী ধ্বংস করে তখন কোফি আন্নান রাষ্ট্র সংঘ থেকে তিন ঠাঙে লাফিয়ে উঠেন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে আফগানিস্তানের বলেন "যদি তারা (তালিবানরা) বৌদ্ধমূর্তী ভেঙে ফেলে তাহলে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক ।"

এই হল তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্বঘোষিত মানবতাবাদীদের দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । যখন বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হচ্ছিল তখন তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন এই মানবতাবাদীর দালালগুলো । রাতের বেলা মৌমাছি যেমন নীরবে পাখা গুটিয়ে বসে থাকে ঠিক সেই রকম তাঁরাও পাখা গুটিয়ে বসে ছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধমূর্তী ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সেই নীরব পাখা না জানি কোন অজানা কারণে সচল হয়ে উঠে । চাকে ঢিল লাগা মৌমাছির মতো তাঁরা উন্মত্ত হয়ে উঠেন । পাগলের মতো হয়ে মুসলমানদের শরীরে দংশন করে হুল ফোটাতে থাকেন । ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো করতে থাকেন । মনে হয় তাঁদের পাছাতে বিষাক্ত ইঞ্জ্যকশানের ধারালো সূঁচ ভরে দিয়েছে ।

পাঠকগণ রাষ্ট্র সংঘের নির্মাণই হয়েছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য । শুরু থেকে রাষ্ট্র সংঘের সমস্ত ভূমিকা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে । দেখুন বসনিয়া, কসোভা, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক ও অন্যান্য রাষ্ট্রে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে । অথচ কেউ হত্যাকারীকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না । কিন্তু আমেরিকার কিছু হলে রাষ্ট্রে সংঘে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় । ইরাকের বা যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সামান্য ভুলে সারা বিশ্ব গর্জে উঠে । এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্র সংঘ হল মুসলিম দমনের এক মহাযন্ত্র । এটাকে ইউনাইটেড নেশান না বলে ইউনাইটেড অফ কুফ্‌ফার বলা যায় । এটা ক্রুসেডের পর

মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে । রাষ্ট্র আমাদের কি হেফাযত করবে ? আর এই রাষ্ট্র সংঘের মহাসচিব কোফি আন্নান বা বর্তমান মহাসচিবের কাছে আর কি আশা করা যেতে পারে ? ইসলামের সমাপ্তির ষড়যন্ত্র ছাড়া । তারা তো এটাই চাই, যে কোন উপায়ে ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়া যায় । মহানবী (সাঃ) এর গুণকীর্তন কিভাবে মানুষের নিকট থেকে দুর হয়ে যায় । রাষ্ট্র সংঘ হল ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র । আমাদেরকে এর মুকাবিলা করতেই হবে ? এক আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদের হেফাযতের ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে ।

কুচক্রীরা আজ সারা দুনিয়া জুড়ে ব্যপ্ত । ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সারা পৃথিবীতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে । এই জাল দিয়ে তারা পুকুরে মাছ ধরার মতো করে মুসলমানদের ছেঁকে ছেঁকে ডাঙ্গায় তুলে হত্যা করছে । মুসলামনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে । কোথাও কুরআন পোড়ানো হচ্ছে । কোথাও মসজিদ ভাঙা হচ্ছে । আজ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যে আল্লাহর জমীনে বসে আল্লাহর নাম নেওয়াও মুসলমানদের জন্য অপরাধ হয়ে গেছে । ইসলামের বীর সন্তান ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে কুচক্রীদের চক্রান্তে অথচ এই মর্দে মুজাহিদ সারা জীবন ইসলামের সেবা করে গেছেন । পৃথিবীর বিভিন্ন জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন । নিজ পকেট থেকে পয়সা বের করে জিহাদে খরচ করেছেন । সারা পৃথিবীতে ইহুদী ও নাসারা (খ্রীষ্টান) গোষ্ঠী এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে আজ ওসামার নাম নেওয়াও আইনী অপরাধ । এই অপরাধ শুধু আমেরিকা ও ইউরোপের মতো ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রে নয় বরং ভারতের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও এই আইন বলবত করা হয়েছে । লাদেন তো ভারতের বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালাননি । তাহলে ভারত কেন তাঁর উপর রুষ্ট ? সম্ভবত আমেরিকাকে খুশি করার জন্য ভারত এই আইন বলবত করা হয়েছে । কারণ ভারত আমেরিকার বন্ধু । যদিও সুযোগ পেলেই আমেরিকা এই বন্ধুর গলাতে ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করবে না, যদি তারা কোন কারণে বিপন্ন বোধ করে । একসময় লাদেনও আমেরিকার চরম বন্ধু ছিল । আমেরিকা লাদেনের জন্য যা করেছে হয়ত এরকম দৃষ্টান্ত মেলা ভার । আজ সেই ওসামা বিন লাদেনও আমেরিকার চরম দুশমন । সুতরাং ভারতের মতো দেশ এখনো আমেরিকাকে বুঝতে পারেনি যে সে কারো বন্ধু হতে পারেনা । আর যদি বুঝেই থাকে তাহলে ভারতের প্রতিটি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতালাভের পর কমপক্ষে একবার আমেরিকা যায় কেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের পা চাটবার জন্য ।

সুতরাং আমার দেশের ভায়েরা আপনারা সাবধান হোন । এই নেতাদের বিশ্বাস করবেন না এবং দেশের শান্তি - শৃঙ্খলা কোন মূল্যেই বিঘ্নিত হতে দেবেন না । যে রাজনৈতিক নেতা আমাদের হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেশের শান্তি - শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেশকে জাহান্নামে পাঠাবার পরিকল্পনা করবে তাকে লাথি মেরে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন । নিজের দেশকে ভালবাসতে শিখুন । একে অপরের প্রতি মমত্ববোধ তৈরী করুন । মনে রাখবেন, কোন সাধারণ হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈন, ইহুদী, বৌদ্ধ আমাদের শত্রু নয় । তারা আমাদের ভাই । তবে যারা ভারত থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার জন্য বদ্ধপরিকর, যারা এই দেশে ফ্যাসিবাদের বীজ বপন করতে চায়ছে তারা অবশ্যই আমাদের শত্রু

তারা শুধু আমাদের নয় বরং তারা সমগ্র মানবজাতির শত্রু, সমগ্র ভারতবাসীর শত্রু । আসুন আমরা সেই ফ্যাসিবাদের বীজকে নির্মূল করে সুন্দর ভারত গড়ার জন্য এগিয়ে আসি । আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করি । সাম্প্রদায়কতাকে নির্মূল করি । স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, আশ্রম যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা হেফাযত করি । মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার মনোভাব তৈরী করি ।

পরিশেষে বলব, 'মাদ্রাসা হল সন্ত্রাসবাদের আখড়া' এই ভ্রান্ত মতবাদটি এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি, ঐতিহাসিক ও সাধারণ জনগণের নিকট সুপরিচিত । অথচ প্রকৃত ইতিহাস কোনদিনই তা বলে না । মাদ্রাসা কখনোই সন্ত্রাসবাদের আখড়া নয় । এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য । আর এই সত্য প্রমাণ করার জন্য এই পুস্তক লিখতে আরম্ভ করছি এবং করলাম । এই পুস্তকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেও সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন গুজরাটের দাঙ্গা, মুম্বাই দাঙ্গা, কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা প্রভৃতি, কেননা এগুলিকে সরকার ও মিডিয়া কর্তৃক দাঙ্গা বলে অবিহিত করলেও নিছক দাঙ্গা ছিল না । এগুলো ছিল সংখ্যাগরিষ্ট বা সরকার কর্তৃক মুসলমান নিধন বা মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভূল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভূল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম
দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
+৯১ ৯১৫৩৯৭৭২৬৩
E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা

সাধারণত Terrorism এর বাংলা অর্থকে সন্ত্রাসবাদ বলা হয় । যার অর্থ হল আতঙ্ক ছড়ানো । এই Terrorism শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ফরাসী বিপ্লবের সময় । এই Terrorism এর আবিধানিক অর্থ হল use of violence and intimidation in an attempt to archive political aims. ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন হাজার হাজার মানুষকে গিলোটিনে হত্যা করা হয় তখন দেশ জুড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে । সেই সময় Terror শব্দটি বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে । আর আবিধানিক ভাবে Terrorist তাদেরকেই বলা হয় যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য সংগঠিত ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিকে মূলধন করে । সুতরাং সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে যখন কোন গোষ্ঠী সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে অন্যায় ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় । অর্থাৎ সন্ত্রাস এখানে মতাদর্শের রুপায়ণে চালিকাশক্তির কাজ করে । Encyclopaedia of Social Sciences গ্রন্থে Terrorism কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে ঃ The method where by an organised group or party seeks to archive its avowed aims chiefly through the systematic use of violence. সমাজবিজ্ঞানী পল উইলকিনসন বলেছেন, যে কোনও বিপ্লবের সঙ্গে সন্ত্রাসের যোগসূত্র থাকে । যাইহোক সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন, যেমন-

1. Walter Laqueur : Terrorism is the use or the threat of the use of violence, a method of combat, or a strategy to achieve certain targets… [I]t aims to induce a state of fear in the victim that is ruthless and does not conform with humanitarian rules… [P]ublicity is an essential factor in the terrorist strategy. (Laqueur, Walter (1987). *The Age of Terrorism* (2nd ed.). Boston: Little & Brown, p. 143.)

2. Bruce Hoffman: Terrorism is ineluctably political in aims and motives, violent—or, equally important, threatens violence, designed to have far-reaching psychological repercussions beyond the immediate victim or target, conducted by an organization with an identifiable chain of command or conspiratorial cell structure (whose members wear no uniform or identifying insignia), and perpetrated by a subnational group or non-state entity. (Hoffman, Bruce (2006). *Inside Terrorism* (2nd ed.). New York: Columbia University Press, p. 43.)

3. Alex Schmid and Albert Jongman: Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators.(Schmid, Alex, & Jongman, Albert (1988). *Political Terrorism: A New Guide to Actors,*

Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. Amsterdam: North Holland, Transaction Books, p. 28.)

4. David Rapoport: terrorism is the use of violence to provoke consciousness, to evoke certain feelings of sympathy and revulsion. (Rapoport, David C. (1977, November 26). The Government Is Up in the Air over Combating Terrorism. *National Journal, 9*, 1853–1856.)

5. Yonah Alexander: terrorism is the use of violence against random civilian targets in order to intimidate or to create generalized pervasive fear for the purpose of achieving political goals. (Alexander, Yonah (1976). *International Terrorism: National, Regional and Global Perspectives*. New York: Praeger, p. xiv.)

6. Stephen Sloan: the definition of terrorism has evolved over time, but its political, religious, and ideological goals have practically never changed. (Sloan, Stephen (2006). *Terrorism: The Present Threat in Context*. Oxford: Berg Publishers.)

7. League of Nations Convention Definition of Terrorism (1937): terrorist acts are all criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public. (League Convention (1937). Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Article)

8. U.S. Department of Defense Definition of Terrorism: terrorism refers to the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological. (Joint Chiefs of Staff DOD (2008). *Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms*. Washington, D.C.: DOD.)

9. U.S. Department of State: terrorism is „premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine state agents. (U.S. Department of State (1996). *Patterns of Global Terrorism: 1995*. Washington, D.C.: U.S. Department of State.)

এই সন্ত্রাস দুই ধরণের হয়ে থাকে । এক, গোষ্ঠী সন্ত্রাস ও দুই, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস । হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা মালেগাঁও বিস্ফোরণ, আজমীর বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, হনুমান মন্দিরে ও স্বর্ণ মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ নিঃসন্দেহে গোষ্ঠী সন্ত্রাস । অপরদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে মারণাস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত তুলে ইরাকে অভিযান চালিয়ে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়া, অনর্থক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা, গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক হাজার হাজার মুসলমানকে খুন

করা, নন্দীগ্রামে সি. পি. এম কর্তৃক গণহত্যা করা, জার্মানে হিটলার কর্তৃক লক্ষ লক্ষ ইহুদীদেরকে নিধন করা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ।

মাদ্রাসা ও সন্ত্রাসবাদ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে খগড়াগড় বিস্ফোরণের পর পুনরায় ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলির উপর অসুশুভ শক্তির আক্রমন শুরু হয়েছে । ব্রাম্ভণ্যবাদী ও ইহুদীবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর মিডিয়া গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করেছে । অথচ এটা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ।

মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদ তৈরীর আখড়া বলা এটা কোন নতুন বিষয় নয় । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেনীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতা ও মিডিয়া সহ দীর্ঘদীন ধরে এই অপ্রচার করে আসছে যে মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় । তাদের কাছে মাদ্রাসা মানেই মুসলিম জঙ্গি গোষ্ঠির আখড়া ।

আমাদের উপমহাদেশে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা দুই ধরণের । এক, সরকারী মাদ্রাসা যা শুধু সরকারী অর্থে চলে ও দুই, বেসরকারী বা খারিজী মাদ্রাসা যা আরবদেশগুলির এবং আমাদের দেশের জনসাধারণের অনুদানে চলে । তবে আরবদেশগুলি আমাদের দেশে অনুদান পাঠান দেশের মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য । কোন অসৎ উদ্দেশ্যে বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁরা টাকা পাঠান না । তবে কিছু লোক হয়তো সেই টাকা নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করে সেটা তার ব্যাক্তগত অপরাধ । এর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাব্যাবস্থা বা আরবদেশগুলি ও আমাদের দেশের অনুদানকারী জনসাধারণ কোনক্রমেই দায়ী নয় ।

বর্তমানে পাকিস্তানে ৫০,০০০ এর অধিক বেসরকারী মাদ্রাসা রয়েছে যা দেশী ও বিদেশী অর্থে চলে । ২০০২ সালে এই মাদ্রাসাগুলোর জন্য বিদেশ থেকে ৭০০০ কোটি টাকা অনুদান এসেছে । বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের 'ইন্টারন্যাশানাল ক্রাইসিস গ্রুপ' ২০০৫ সালে পাকিস্তানের মাদ্রাসার উপর যে সমীক্ষা করে তার রিপোর্টে লেখা আছে, "The crux of the problem comes down to the type of education that the madrasas impart. Education that creates barriers to modern knowledge stifling creativity and breeding bigotory, has become the madrasa's defining feature. It is the faundation on which faundamantalism-militancy or otherwise - is built."

নাদওয়াতুল উলামা মাদ্রাসার রেক্টর মাওলানা হাসনি নাকভী বলেন, "মাদ্রাসাগুলি উচ্চ নৈতিকতা, মহত্ব এবং মানবতা শেখায় । মাদ্রাসাগুলি জঙ্গি তৈরী করে - এসব স্বার্থন্বেষী মহলের প্রচার । বরং ইউরোপীয় উপনিবেশি শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী সরকারী শিক্ষায় নীতি নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার কোনও পাঠই দেওয়া হয় না ।" তিনি আরও বলেন, "মাদ্রাসাগুলি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই দেয় । নৈতিক জীবনের শিক্ষা বাদ দিয়ে যে শিক্ষা তা অর্থহীন ।"

সুতরাং এককথায় মাদ্রাসায় কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া হয় না । কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট দুষ্ট মিডিয়ার একটা মেনিয়া (Moral Dipsomenia) হয়ে গেছে এটা জোরে শোরে প্রচার করা যে মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া হয় । আর এই অপপ্রচারে ফলে মাদ্রাসায় চালানো হয় সরকারী তদন্ত । তদন্তের নামে মদ্রাসাগুলোকে হেনস্থা করা হয় । এই তদন্ত চালানো হয় মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিন ২৪ পরগণার মত বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী জেলাতে এবং হুগলী জেলাতেও । ইমাম ও মুআয্যিনদের সম্পর্কে তথ্যাবলী চেয়ে গোয়েন্দারা মসজিদ পরিদর্শন করেন ।

সন্ত্রাসের নামে মুসলমানদেরকে হেনস্থা

সন্ত্রাসের মানে মুসলমানদেরকে শুধু হেনস্থা করা হয় । তার কয়েকটি উদাহারণ এখানে তুলে ধরা হল,

১) ৯/১১ এর পাঁচ বছর পর ২০০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ এয়ারলাইন্স বিমানটি হিথরো বিমানবন্দর থেকে ওয়াশিংটনে যাচ্ছিল । হঠাৎ পাইলটের সন্দেহ হল, বিমানের কয়েকজন যাত্রীকে । তাঁরা মুসলমান, মুখে দাড়ি । সুতরাং এরা সন্ত্রাসবাদী হতে পারে । কারণ তারা মুসলমান ও মুখে দাড়ি । তাঁদের অপরাধ ছিল তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলে । পাইলট দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসকে জানিয়ে দিলেন, “বিমানে জঙ্গি রয়েছে ।” বিমান ঘুরিয়ে নেওয়া হল । অর্থাৎ বিমানটি আর ওয়াশিংটনে না গিয়ে হিথরো বিমানবন্দরেই ফিরে গেল বিমানটি । ততক্ষন যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তাঁরা হট্টগোল শুরু করেছেন । বিমান হিথরো বিমানবন্দরে ল্যান্ড করা মাত্র কমান্ডোরা বিমানটিকে ঘিরে ফেলল । অত্যাধুনিক রাইফেল নিয়ে কমান্ডোরা বিমানের ভিতর ঢুকে পড়লেন । নির্দেশ হল, “কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বেন না ।” সন্দেহজনক দাড়িওয়ালা পাঁচজন মুসলমান ও একজন বোরকায় আবৃত মহিলাকে কুকুর বেড়ালের মতো বিমান থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় । প্রতিটি সাজসজ্জার জিনিস - বিউটি ক্রিম অথবা হেয়ার রিমুভার জেল অথবা খাবার দাবার যা ছিল সব কেড়ে নেওয়া হয় । সেই দিন হিথরো বিমানবন্দর থেকে জঙ্গি আতঙ্কে কোন বিমান বন্দর থেকে ছাড়া হয়নি । যাত্রিদের জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে তলাশ করা হয় এবং যাত্রীদেরকে হেনস্থা করা হয় । মার্কিন মিডিয়া সারা বিশ্বে প্রচার করে দিল যে মুসলমান জঙ্গিরা ৯/১১ এর মতো আবার বিমান ছিনতাই করার চেষ্টা করেছেন । মিডিয়া বিভিন্ন ভাবে উপরের পাতায় বড় বড় করে হেডিং দিয়ে ফলাও করে প্রচার করে দিল ধৃতরা জঙ্গি । পরে পুলিশের জেরা করার পর প্রমাণ হয়ে গেল এঁরা কেউ জঙ্গি নন সকলেই আমেরিকার বৈধ নাগরিক । যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে ধৃতরা কেউ জঙ্গি নন তখন মিডিয়া নিশ্চুপ । যদিও কোন মিডিয়া এটাকে প্রচার করল তবুও সেটা ভিতরের পাতায় ক্ষুদ্রভাবে । যাতে কারো নজর না পড়ে ।

২) ২০০৬ সালের ১০ অক্টোবর মাসের আর একটি ঘটনা । কয়েকজন মুম্বায়ের পেশাদার যুবক মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে জার্মানী যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন । তাঁদের কেউ

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, কেউ ব্যাবসায়ী, কেউ বিদেশের কলেজের ছাত্র । তাঁরা বিমানের পাশাপাসি আসনে বসে ছিলেন । এঁদের বেশিরভাগ মুসলমান ছিলেন দু-একজন হিন্দু ছিলেন । যুবকদের একটাই দোষ ছিল যে তাঁরা কোলে ল্যাপটপ নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলেন । বিমান কর্মীদের হঠাৎ মনে হলো এরা বিপজ্জনক, এরা জঙ্গি, হয়তো কোন অপারেশন চালাতে যাচ্চে । বিমানকর্মীরা এসব ভাবামাত্র ওদের উদ্দেশ্য করে চেঁচাতে লাগলেন, "ইউ আর টেররিষ্ট, বি অ্যাওয়ার । আদারওয়াইস উই উইল ল স্যুট ইউ ।" আতঙ্কে ওরা সকলে হাত উঠিয়ে আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে বলে, "নো, ইউ আর মেকিং রং । উই আর প্রফেশনালস ।" সে কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি বিমান থেকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারে খবর চলে যায় মাঝপথে অন্য বিমানবন্দরে বিমানটিকে ল্যান্ড করা হয় । কমান্ডোরা ছুটে আসে । সন্দেহের বসে টেনে হিঁচড়ে তাদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে যাওয়া হয় । মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করে যে, "বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা ।" এক সপ্তাহ পর প্রমান হয় তারা নির্দোষ । ওরা মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরে আসে । আত্মীয়স্বজনকে দেখে তারা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে । তারা অভিযোগ করে, "কুকুরের মতো ব্যাবহার করা হয়েছে ওদের সঙ্গে । প্রথম রাতে খেতে দেওয়া হয়নি । বেধড়ক পিটিয়েছে পুলিশ ।" অনেকের গায়ে কালশিটের স্পষ্ট দাগ । তাদের অধিকাংস মুসলমান হলেও তাদের মুখে দাড়ি ছিল না । ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য হিন্দু যুবকদেরও হেনস্থা করা হয় । এরপর পুলিশ ভুল স্বীকার করে । এমনকি স্থানীয় আদালতও পুলিশকে ভৎর্সনা করে । আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সন্দেহের বশে এত যাত্রীকে হেনস্থা করার অধিকার বিমানকর্মীদের নেই । মুসলমান যুবকরা নির্দোষ প্রমাণ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কিন্তু ইহুদীচক্রের দোসর মিডিয়া আর প্রচার করেনি । তারাই এর আগে প্রচার করেছিল, "বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা ।"

৩) একজন মার্কিন মুসলিম যুবক । পাকিস্তানি বংশদ্ভুত তার মাতাপিতা । যুবকটির জন্মসুত্রে ব্রিটিশ নাগরিক ছিল । তার স্টেশনে পৌছানোর আগে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল । তাই সে ছুটে ট্রেন ধরতে আসছিল । কাঁধে ছিল রুকস্যাক । পরনে ব্লু জিনস, শার্ট, ঝকঝকে মুখ । পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে তাকে গুলি করা হয় । মিডিয়া সারা বিশ্বে প্রচার করে দেয়, লন্ডনে টিউব রেলে বিস্ফোরণ ব্যর্থ করে দিয়েছে লন্ডন পুলিশ । তার রুকস্যাকে নাকি বিস্ফোরক পদার্থ ছিল । পরে তদন্তের পর জানা গেল, তাতে ছিল মিনারেল ওয়াটার, টিফিন বক্স, বইপত্র । ব্রিটিশ পুলিশ যে আতঙ্কের বশে নির্দোষ যুবকটিকে সন্দেহের বশে হত্যা করেছিল তা এখন প্রমান হয়ে গেছে । পুলিশের বিরুদ্ধে এখনও মামলা চলছে । যুবকটির বাবা ক্ষতিপুরণের দাবী করেছেন আদালতে । এরপর আর মিডিয়া নির্দোষ প্রমান হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি প্রচার করেনি ।

অমুসলিমরাই সর্বপ্রথম সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল

পৃথিবীতের সর্বপ্রথম অমুসলিমরাই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করেছিল । মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছিল আর. এস. এস. এর নাথুরাম গডসে । আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে খুন করেছিল আমেরিকার অভিনেতা উইলকিস বুথ । থিয়েটারে নাটক দেখার সময়

তাকে হত্যা করা হয় । আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান জন এফ. কেনেডিকে মোটরসাইকেলে চেপে যাওয়ার সময় তাঁকে খুন করে হারভি অসোয়াল্ড । ১৮৯৪ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সারি কামোটকে সান্টে ক্যাসারিও নামে একজন ইতালীয় পর্যটক খুন করে । এছাড়াও ১৮৯৮ সালে অস্ট্রিয়ার যুবরানি এলিযাবেথ, ১৯০১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলে, ১৯১৩ সালে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিসকো মাদেরো, ১৯১৫ সালে রাশিয়ার ধর্মগুরু রাসপুটিন, ১৯২০ সালে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ভেনুসতিয়ানো কারাঞ্জা, ১৯৩২ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পল ডেমার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর এঞ্জেলবার্ট ডলফাসকে নাৎসীদের দ্বারা, ১৯৪০ সালে লিও ট্রটস্কিকে মাথায় হাতুড়ি মেরে, ১৯৫৬ সালে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যান্টসিও সোমাজা, ১৯৫৭ সালে গুয়েতেমালার প্রেসিডেন্ট কার্লোস আরমাস, ১৯৫৯ সালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েক, ১৯৬৬ সালে দক্ষিন আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হেনড্রিক ডারউডকে, ১৯৬৮ সালে জুনিয়ার মার্টিন লুথার কিংকে, এই বছরেই প্রয়াত জন এফ কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডিকে, ১৯৭১ সালে জর্ডনের প্রধান মন্ত্রী ওয়াসফি তাইকে খুন করা হয় ।

১৯৭৫ সালে মাডাগাসকারের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড রাটসিমানডাভাকে, ১৯৭৯ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ১৯৮০ সালে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টলবার্ট, ১৯৮৩ সালে ফিলিপিন্সের বিরোধী নেতা বেনীগনো অ্যাকুইনোকে ম্যানিলা বিমানবন্দরে খুন করা হয় । ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর রুশ পরিচালক পিটার উস্তিনভের এক তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকারের জন্য যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী । তাঁরই দেহরক্ষী সতবন্ত সিং ও বিয়ন্ত সিং হঠাৎ স্টেনগান চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দেহ । তারা পরে স্বীকার করে স্বর্ণমন্দিরে 'অপারেশান ব্লুস্টার' অভিযান চালানোর অপরাধে তারা ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করেছে ।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তামিলনাডুর পেরুমবুদুরে এল. টি. টি. ই জঙ্গিরা হত্যা করে । অভ্যর্থনা জানানোর বাহানায় এল. টি. টি. ইর একজন মহিলা জঙ্গি নিজের দেহে রাখা বিস্ফোরক ফাটিয়ে রাজীব গান্ধীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় । পরে তাঁর পায়ের পাতা দেখে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় । পরে জানা যায় ওই আত্মঘাতি মহিলাটির নাম ধানু ।

১৯৮৬ সালে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামে আততায়ীর হাতে ১৯৭৩ সালে চিলির রাষ্ট্রপ্রধান সালভাদোর আলেন্দেকে, ১৯৮৯ সালে লেবাননের প্রেসিডেন্ট রেনে মোয়াওয়ার খুন করা হয় ।

১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর ইজরাইলের প্রেসিডেন্ট ইৎঝাক রাবিনকে, ১৯৯৬ সালে বুলগেরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেই লুকানভকে, ১৯৯৯ সালে প্যারাগুয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুই মারিয়া আরগানাকে, আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভাজগেন, ২০০০ সালে সার্বিয়ার আধাসামরিক বাহিনীর প্রধান জেজিকা রাজনাজতভিচকে, ২০০১ সালে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট লরেন্ট কাবিলা, এই বছরেই নেপালের রাজা বীরেন্দ্র সপরিবারে খুন হন ।

উপরে যাঁদের আমি নাম উল্লেখ করলাম তাঁরা সকলেই সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই খুন হয়েছেন । আর এই সন্ত্রাসবাদীরা কেউ মুসলমান ছিলেন না । সকলেই অমুসলমান ছিলেন । তাঁরা কেউ মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেননি । সকলেই স্কুল কলেজে পড়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন । এখনও যদি কেউ বলেন মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদের আখড়া এবং মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া হয় । তাহলে আসুন আমি উপরে যে নেতা মন্ত্রীদের নাম লিখলাম তাদের হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলিকে খুঁজে খুঁজে খতম করি ।

এছাড়াও ১৮৮১ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটাসবার্গের রাস্তায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হয়েছিল । তিনি বুলেট প্রুফ গাড়িতে ঘুরছিলেন । বোমা বিস্ফোরণ করে হত্যা করেছিল ইগনেসি । এই ইগনেসি মুসলমান ছিল না । আসুন এই ইগনেসি যে মাদ্রাসায় পড়েছিল সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলের মধ্যে ৮ জন অমুসলিম বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১২ জন নিরীহ মানুষ ও ৭ জন পুলিশ একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করে । জেমস ও জোসেফ নামে দুইজন খ্রীষ্টান ১৯১০ সালের ১ অক্টোবর লস এঞ্জেলস নিউজ পেপার ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২১ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল । অমুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ১৯২৫ সালের ১৬ই এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার 'সেইন্ট ন্যাডেলিয়া'র চার্চের মধ্যে ১৫০ জনকে হত্যা করে । এই হামলায় ৫০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছিল । আসুন ৮ জন অমুসলমান সন্ত্রাসবাদী, জেমস ও জোসেফ ও বুলগেরিয়ার চার্চে হামলাকারী অমুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল টিমোথি ও টেরী নামে দুইজন খ্রীষ্টান বোমাভর্তি একটা ট্রাক নিয়ে ওকলাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে বিস্ফোরণ ঘটায় । ফলে ১৬৬ জন মারা যায় ও আহত হয় কয়েকশো জন । প্রথমে এই বিস্ফোরণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানকে দায়ী করা হয় কিন্তু পরে প্রমাণ হয় এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী টিমোথি ও টেরী নামে দুইজন ডানপন্থি খ্রীষ্টান । আসুন আমরা টমোথি ও টেরী নামে দুইজন খ্রীষ্টান সন্ত্রাসবাদীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাকে আমরা খতম করি ।

এছাড়াও ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাফেম বেগান এর নেতৃত্বে ইরগুন ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটায় । ফলে ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদী মারা যায় । ইরগুন আরবীয়দের মতো পোষাক পরেছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে আরবরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । সেই সময় ব্রিটিশরা মেনাফেম বেগানকে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাবাদী বলে ঘোষনা করে । এই মেনাফেম বেগান কয়েকবছর পর ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তারপর এই ব্রিটিশদের নিকট সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদীকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় । মনে হয় বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যই তাকে নোবেল পুরস্কার

দেওয়া হয় । সুতরাং ব্রিটিশদের নিকট বিস্ফোরণকারীরাও শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পায় । তাহলে তাদের নিকট শান্তিকামী কারা ? এখন আসুন এই ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব ও ১৭ জন ইহুদীকে হত্যাকারী ও এই হত্যাকান্ডের জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী মেনাফেম বেগান যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছিলেন সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

ইতালির রেগব্রিগেড ১৯৭৪ সালে অমুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা গিলফোর্ড বারে দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । সেই বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত হন । বার্মিংহোম বারে বিস্ফোরণ করে তারা ২১ জনকে হত্যা ও ১৮২ জনকে আহত করে । এই বিলগ্রেড ১৯৯৬ সালে লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২ জনকে হত্যা ও ২০৬ জনকে আহত করে । ১৯৯৮ সালে ৫০০ পাউন্ড ওজনের একটি বোমা ফাটিয়ে ৩৫ জনকে আহত করে এবং সেই বছরেই ৫০০ পাউন্ডের আর একটি গাড়িতে বোমা ফাটিয়ে ২৯ জনকে হত্যা ও ৩৩০ জন ব্যাক্তিকে আহত করে । আসুন ইতালির রেগব্রিডের সন্ত্রাসীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি । এছাড়াও আসুন আমরা স্পেনের সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ই টি এ যারা এ পর্যন্ত ৩৬ টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমন চালিয়েছে, আফ্রিকার ‘লর্ডস্ সালভেশন আর্মি’ যারা শিশুদেরকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের প্রশিক্ষন দেয়, শ্রীলঙ্কার এল টি ই, তামিল টাইগার্স নামক কুখ্যাত হিংস্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খুঁজে খুঁজে খতম করি ।

স্পেনের সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ই টি এ যারা এ পর্যন্ত ৩৬ টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমন চালিয়েছে, আফ্রিকার ‘লর্ডস্ সালভেশন আর্মি’ যারা শিশুদেরকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের প্রশিক্ষন দেয়, শ্রীলঙ্কার এল টি ই, তামিল টাইগার্স, শিখ সন্ত্রাসীদের ভিন্দ্রানোয়ালা গ্রুপ, ত্রিপুরার এ টি টি এফ (অল ত্রিপুরা টাইগার্স ফোর্স), এন এল টি এফ (ন্যাশানাল লিবারেশান ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা) যারা ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর মাসে ৪৪ জন নিরীহ হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, আসামের উলফা নামে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ১৬ বছরে ৭৪৯টি ভারতের মাটিতে আক্রমন চালায়, নেপালের মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীরা ৯৯ টি সন্ত্রাবাদী আক্রমন চালিয়েছে আর ভারতে ৬০০টি জেলায় ১৫০টি আক্রমন চালিয়েছে, স্তালিন ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছে এবং তার নির্দেশে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা গেছে । অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধে ১ লক্ষের বেশী মানুষকে হত্যা করে । মুসোলিনী ইতালিতে ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে । ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে । আসুন এইসব কুখ্যাত হিংস্র সন্ত্রাসবাদীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খুঁজে খুঁজে খতম করি ।

জর্জ বুশের কারণে ইরাকে ৫০,০০০ শিশু মারা গেছে । এবং ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজ বলেছেন, “পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ ।” ইংল্যান্ডের সাংসদ জর্জ গ্যালওয়ে বলেন, “জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার এই দুইজনের হাতে যত পরিমান রক্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষের রক্ত রয়েছে লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণকারীদের হাতে ।” তিনি আরও বলেন, “কোনও আত্মঘাতী হামলাকারী যদি ব্লেয়ারকে মেরে ফেলে এবং এতে যদি

কোনও নিরীহ মানুষ মারা যায় তাহলে এতে কোনও অপরাধ হবে না ।” পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যাতি বসু বলেন, “এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ ।” নোবেলজয়ী বেটী উইলিয়াম বলেছেন, “বুশকে খুন করতে তার ভালোই লাগবে ।” আসুন বিশ্ববিখ্যাত ব্যাক্তিদের মতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী জর্জ বুশ যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

খ্রীষ্টান চার্চের নির্দেশে ১৫৫৩ সালে কুরআন পড়ার অপরাধে স্পেনের ৪২ বছর বয়স্ক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ মাইকেল সার্ভিটাসকে জেনেভায় একটি কাঠের খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় । এই বিজ্ঞানী খ্রীষ্টান ধর্মের তিন ঈশ্বরের নীতিকে আপত্তি জানিয়েছিলেন । মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের লেখা কিছু বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ রাখার অপরাধে তাকে চার্চ উক্ত শাস্তি দেয় । আসুন আমরা ঐ চার্চ মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

অমুসলিমরাই সর্বপ্রথম আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করেছিল

আত্মঘাতী বোমা বিশেষজ্ঞ রবার্ট পেপ ‘ডাইন টু উইন’ বইয়ে লিখেছেন যে আত্মঘাতী সন্ত্রাস আমেরিকাতে এক নম্বর এবং আত্মঘাতী বোমা ইসলাম ধর্মে কখনোই ছিল না ।

সর্বপ্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছিল ‘তামিল টাইগার্স’ । পরবর্তিতে এই বোমা হামলা শুরু করেছিল মার্কসবাদী আর লেনিনবাদীরা । রবার্ট পেপ লিখেছেন, ইরাকে আমেরিকানরা আসার পূর্ব আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল না । আত্মঘাতী আবিস্কার করা হয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থে । রাজিব গান্ধীকে যখন এল. টি. টি. ই জঙ্গিরা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ করে হত্যা করে তখন মুসলমানরা আত্মঘাতী বোমার ব্যবহার জানতই না । এল. টি. টি. ই জঙ্গিরা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রণসিং প্রেমাদাসকেও হত্যা করে ।

জার্মানে ফ্যাসিবাদী হিটলারের সন্ত্রাস ও ইহুদী নিধন

জার্মানে ইহুদী নিধনের ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক । ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় আসার পর, জার্মানী থেকে ইহুদীদের নির্মূল করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল পুরোদমে । হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই জার্মানীর বিভিন্ন শহরে ইহুদী বস্তীগুলিতে ব্যাপকভাবে হামলা ও লুঠতরাজ শুরু হয় । দিনের পর দিন ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ইহুদীদের ধর্মীয় উপাসনা কেন্দ্রগুলিতে যাওয়া, মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়া, চাকুরী বা ব্যবসাক্ষেত্রে যোগদান, এমনকি দৈনন্দিন হাটবাজার করা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায় । এর সঙ্গে শুরু হয় উহুদীদের বয়কট । এবং নাজীরা ইহুদীদের ভোগ্যসামগ্রী, ধোপা, নাপিত, যানবাহন, খাদ্যসামগ্রী এমনকি হাসপাতালে যেতে বাধা দিতে থাকে ।

হিটলারের ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষনা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশ দফতর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত উচ্চ থেকে নিম্নপদ পর্যন্ত কর্মরত ইহুদীদের চাকুরী থেকে একে একে অপসারণ করা হয় । তারপর আইন প্রণয়ন করে প্রায় সমস্ত ধরণের সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ও ব্যবসাতে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় ।

পরিকল্পিতভাবে ইহুদীদের মহল্লাতে হামলা করা হয় । নাজীরা ইহুদীদের বাড়িঘর, দোকানপাট দিনের পর দিন লুঠ ও জ্বালিয়ে দেয় । নাজীদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, দোকান, কারখানা, গুদাম প্রভৃতির জন্য ইহুদীদের প্রাপ্য ইনসিওরেন্স-এর টাকা, নানা অজুহাতে সরকার বাজেয়াপ্ত করতে থাকে । ইহুদীরা বেশিরভাগ বীমা কোম্পানীর মালিক ছিল । ব্যাপক ক্ষতিপুরণের দায়ে কোম্পানীগুলি সম্পূর্ণ দেওলিয়া হয়ে যায় । প্রাণভিক্ষা করে জার্মানী ছেড়ে বিদেশে পালাবার অনুমতি নিতে ঘুষ দিতে গিয়ে ধ্বনী ইহুদীরাও নিঃস্ব হয়ে যায় । নাজীরা আক্রমণের পর আক্রমণ করে ইহুদীদেরকে উৎখাত করতে শুরু করে এবং ইহুদীরা দুর দুরান্তরে পালিয়ে জনমানবশুন্য এলাকায় আশ্রয় নেয় । প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান ইহুদীকে দাস শ্রমে নিয়োগ করায় শীত, খাদ্যের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে এবং সংক্রামক রোগে হাজার হাজার ইহুদীর মৃত্যু ঘটে । জার্মান, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ৫ লক্ষ ইহুদী বিতাড়িত হয়ে নিজেদের শত শত বছরের বসতবাড়ি, ধনসম্পত্তি ফেলে সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় ।

১৭ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে দেশ থেকে প্রাণের দায়ে জার্মান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশান্তরিত ১৭ বছর বয়সী এক জার্মান ইহুদী, নাম হারশেচল গ্রিনসজপ্যান প্যারিসে জার্মান দুতাবাসের থার্ড সেক্রেটারী আর্নেস্ট ভন রাথকে গুলি করে খুন করে ।

যেখানেই ইহুদী পাওয়া যেত খুন করে মারা হত । খোদ বার্লিনে ৮১৫ টি দোকানে অগ্নিসংযোগ ও ৭,৫০০ দোকান লুঠ করা হয় । দলবদ্ধভাবে ইহুদী নমণীদেরকে ধর্ষন করা হয় তারপর তাদের খুন করা হয় । ন্যুরেমবার্গ বিচারকালে একজন আসামী জানিয়েছিল যে তার গোষ্ঠী ৯০ হাজার ইহুদী খুন করেছিল । হিটলার ও হাইডরিচের নেতৃত্বে গঠিত 'আইনস্টোজ' গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে । তারা গ্রামে গিয়ে ইহুদীদেরকে জড়ো করতো তারপর তাদের বলা হতো যে তাদের দুরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সুতরাং সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী তারা 'আইনস্টোজ' এর হাতে সমর্পন করুক । সামগ্রী পাওয়ার পর, তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করা হত । এটা ছিল ইহুদীদের ইপর চুড়ান্ত আক্রমণের শুরু ।

পরবর্তীকালে যে সমস্ত দেশ নাজীরা দখল করেছিল, সর্বত্রই তারা ইহুদী নির্মূল শুরু করে । পোল্যান্ডে বৃহত্তম সংখ্যক ইহুদী থাকায়, দেশটি দখল করার পর থেকেই সেখানে ইহুদীদের উপর ভীভৎসভাবে অত্যাচার শুরু করে । হাজার হাজার ইহুদীকে ধরে এনে, বিনা পারিশ্রমিকে 'শ্লেভ লেবার' হিসাবে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, সেতু প্রভৃতি নির্মান থেকে শুরু করে

সেনাবাহিনীর ছাউনি ও অফিসারদের বাড়িতে পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত গৃহস্থালী কাজে নিয়োগ করে দখলদার জার্মানরা । না খেতে পেয়ে মৃত্যু ছাড়াও, এক একটি বড় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের গুলি করে খুন করা হত । ইহুদী রমণীদের বাধ্যতামুলকভাবে জার্মানদের যৌন সেবার কাজে নিয়োগ করা হত । যেসব সেনা ইহুদীদের খুন করে তাদেরকে জার্মান কর্তৃপক্ষ পুরস্কৃত করতে থাকে ।

পোল্যান্ডে জার্মান বসবাসকারী এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে ৩,০০,০০০ ইহুদীকে ভিশ্চুলা নদীর ওপারে পাঠানো হয় । ইহুদীদের সমস্ত ধন সম্পত্তি লুন্ঠন করার পর তাদের বসত এলাকাগুলি জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হত । এমনকি ভিশ্চুলা নদীর পরপারে যেসব ইহুদীদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয় ।

অন্যান্য দেশকে পরাজিত করে জার্মানীরা যে 'প্রিজনার অব ওয়ার' (POW/Prisoner of War) বা যুদ্ধবন্দী পায়, তা থেকে ২০ লক্ষকে নিযুক্ত করা হয়েছিল 'ফরেন লেবার ফোর্স' এ, এদের অর্ধেকই ছিল ইহুদী । এমনকি এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে শত শত নারী ছিল । খাদ্যাভাব, চিকিৎসার অভাবে প্রতিদিন তাদের মধ্যে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটত । গর্ভবতী নারীরা 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' এ সন্তানের জন্ম দিত । অধিকাংস ক্ষেত্রেই মা ও সন্তানের মৃত্যু ঘটত ।

জার্মান সমাজ থেকে ইহুদীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা শুরু হয় ১৯৩৯ সালের মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর । ১০ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে ৬০ বছর বয়সের প্রতিটি ইহুদী নারী প্রতিদিন ক্যাম্পের প্রহরী বা সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হতেন । সকালবেলায় সক্ষম প্রত্যেক পুরুষকে 'লেবার সাইট' এ নিয়ে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করিয়ে ক্যাম্পে আনা হত । ১৫ মাইলের মধ্যে পথ হলে হেঁটে নিয়ে যাওয়া হত নাহলে ট্রাকে ভরে নিয়ে যাওয়া হত । ইহুদীরা এক সেটই জামা প্যান্ট পরতে পেতেন । প্রচন্ড শীতেও বন্দীদের পায়ে মোজা পরতে দেওয়া হত না । সামান্য কারণেই তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হত । অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে ইহুদী বন্দীদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখা হত না । সরকারী 'টেকেনবাক' বা মৃত্যু সংক্রান্ত রেকর্ড বুক অনুযায়ী মোট ৭,৮২,০০০ জন বন্দী ইহুদীদের মধ্যে ৭,১২,৫০০ জনকে হত্যা করা হয়েছিল যেসব ইহুদী বেঁচে ছিল তাদেরকে দাস শ্রমের চাহিদা পুরণের জন্য রাখা হয়েছিল যেহেতু যুদ্ধের প্রয়োজনে দাস শ্রমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল ।

ইহুদীদের হত্যা করার জন্য বিশাল বিশাল গ্যাস চ্যাম্বার নির্মাণ করা হয় । দলবদ্ধভাবে স্নান করানোর নামে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু, নির্বিশেষে ইহুদীদের সমস্ত জামা কাপড় খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে দলবদ্ধভাবে ঐসব গ্যাসচ্যাম্বারগুলিতে প্রবেশ করানো হতো - এক সাথে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার জনকে । গ্যাস চ্যাম্বারের মেঝেতে এত পরিমান স্থান না থাকায়, বন্দীরা সবাই ঠেসাঠেসি করে কোনও ক্রমে ভেতরে দাঁড়াত । তারপর সমস্ত দরজাগুলি বাইরে থেকে নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করা হত । ঘরে ঢুকে স্নানের ব্যাবস্থা না দেখে ইহুদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত । তারা

বুঝতে পারত কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ইতিমধ্যে জার্মান প্রহরীরা উপর থেকে 'হায়ড্রোজেন সায়নায়েড' অথবা 'জায়কলন বি'র স্ফটিকখন্ডসমূহ গ্যাস চ্যাম্বারের ভিতরে ফেলে দিত। কিছুক্ষন পরে সেই 'হায়ড্রোজেন সায়নায়েড' অথবা 'জায়কলন বি'র স্ফটিকখন্ডসমূহ মারাত্মক বিষ তৈরী হয়ে যেত। ফলে বন্দীদের মধ্যে ত্রাস ও আর্তনাদের সৃষ্টি হত এবং নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি করত বেরুবার জন্য। পাগলের মতো উন্মত্ত ধাক্কাধাক্কিতে এবং পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে অনেকেই মারা পড়ত। বিষাক্ত গ্যাসে ৩০ মিনিটের মধ্যে সকল ইহুদীদের মৃত্যু ঘটত। ঘরের মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রনায় চিৎকার আর বিস্ফোরিত নেত্রে দমবন্ধ হয়ে ইহুদীরা মারা পড়ত। এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ফ্যাসিস্টরা কাচের জানালা দিয়ে দেখত। জার্মানী ছাড়াও হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার দখলীকৃত এলাকায় এইভাবে ৩০ লক্ষ ইহুদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে এবং হিটলারের পতনের পর ন্যুরেমবার্গ বিচারে জানানো হয়েছিল মোট ৫৭ লক্ষ ইহুদীকে মারা হয়েছে। তা ছাড়াও ৩ লক্ষ ইহুদী নিঁখোজ হয়ে গিয়েছিল।

অত্যাচারের আর এক বীভৎস দিক হল, 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' আটক বন্দীদের নিয়ে ডাক্তারী ও জীববিদ্যাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি। এই পরীক্ষা-নিরিক্ষা কার্যকালে নিছক হত্যাকান্ড ছিল না, ছিল 'স্যাডিজম' বা যৌন বিকৃতজনক নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির প্রকাশ। মনুষ্য গিনিপিগদের মতো ব্যাবহার করা হয়েছিল ইহুদী বন্দী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 'প্রিজনার অব ওয়ার'- দের। এই পরীক্ষাগুলি ছিল বিভিন্ন ও বিভৎস ধরণের। কিছু বন্দীকে 'প্রেসার চেম্বারে' ভরে দেওয়া হত। তারপর চেম্বারের ভেতরের প্রেসার বাড়িয়ে দেওয়া হত। পরীক্ষকরা দেখত কিভাবে একটা সময়ের পর হঠাৎ তাদের ফুসফুস ফেটে নাকমুখ দিয়ে পিচকারীর মতো রক্ত ছিটকে বেরিয়ে মৃত্যু ঘটে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই পরীক্ষাগুলি চলত। একদল বন্দীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত প্রচন্ড বিষাক্ত টাইফাস ও জন্ডিস এর জীবানু। দ্রুত মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করা হত। একদল মানুষকে বরফ জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে বা উন্মুক্ত বরফের প্রস্তরের উপর নগ্নভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখা হত কিভাবে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যু ঘটে মানুষের। বিষাক্ত বুলেট, বিশেষত মাস্টার্ড গ্যাস মাখানো বুলেট, শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে কত দ্রুত ঢলে পড়ে বন্দী, তার পরীক্ষা চলত। র‍্যাভেনশরুইচ কনসেট্রেশন ক্যাম্পে নারীদের উপর প্রয়োগ করা হত গ্যাস, গ্র্যাংগ্রিন জীবানু এবং কারো ক্ষেত্রে 'বোন গ্রাফটিং' করে। পুরুষ ও নারীদের নির্বীর্যকরণ ও বন্ধত্বকরণ করতে বহু পরীক্ষা চলেছিল। শেষ পর্যন্ত বিষাক্ত 'ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম' প্রয়োগ করে সাফল্য পায় নাজীরা। এই নির্বীর্যকৃত নরনারীদের একসাথে কাচের ঘরে রেখে দলবদ্ধভাবে তাদের বাধ্য করা হত যৌন সঙ্গমে। কাচের জানালা দিয়ে জার্মান 'এলিট'রা সপরিবারে এই দৃশ্য উপভোগ করতে আসত। সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন ইহুদী যুবকদের গলায় গুলি করে হত্যা করে, তাদের মসৃন চামড়াতে উল্কি চিহ্ন ছেপে বাজারে বিক্রি করা হত। এই চামড়া দিয়ে মেয়েদের সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ, টেবিলল্যাম্পের আচ্ছাদন প্রভৃতি তৈরী করা হত উপহার সামগ্রী হিসাবে। ইহুদী নারীদের খুন করার পর, যাদের মাথার চুল ভাল থাকত, সেই চুল দিয়ে জার্মান নারীদের জন্য 'উইগ' বা পরচুলা তৈরী করে তা বিক্রি

করা হত । বায়ুশূন্য চেম্বারে বন্দীদের নিয়ে পরীক্ষা, বিনা অক্সিজেন-এ ২৯,৪০০ ফুট উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে ইহুদী বন্দীর শরীরে পরীক্ষা চালানো, ইত্যাদি অজস্র বীভৎস হত্যাকান্ডমূলক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ঘটনাবলী 'ন্যুরেনমার্গ বিচার' কালে জানা গিয়েছিল ।

তাহলে দেখুন জার্মান হিটলার বাহিনী ইহুদীদের উপর কিরকম বীভৎস সন্ত্রাসী হমলা চালিয়েছে । তারা ইহুদীদেরকে মানুষ বলেই মনে করত না । তাহলে আসুন এই ফ্যাসিবাদী (Fasism) জার্মান হিটলারের সন্ত্রাসবাদী বাহিনী যে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

কোয়েম্বাটুরে বোমা বিস্ফোরণ ও পুলিশ জঙ্গির অত্যাচার

১৯৯৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাসে কোয়েম্বাটুরে মারাত্মক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন । এই এতে মারা যায় ৩৫ জন ও আহত হয় প্রায় ২০০ জন । প্রথমে এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা হয় মুসলমানদেরকে । এবং নিষিদ্ধ করা হয় মুসলিম আল উম্মাহ ও জেহাদ কমিটিকে । মিডিয়াও মুসলিম সংগঠনগুলোকে দায়ী করে । পরে প্রমাণ হয় হিন্দুত্ববাদীরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । এই বিস্ফোরণের আগে মুসলমানদের উপর শুরু হয়েছিল অত্যাচারের ষ্টীম রোলার । নুর মহম্মদ নামে জনৈক ব্যক্তিকে (২৩) ১৯৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারো টার সময় হিন্দুত্ববাদীরা তার মাথা কেটে ফেলার চেষ্টা করে । সে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে বাড়ি ফিরে আসে । একই দিনে সাড়ে বারোটার সময় জনৈক পুলিশ অফিসারের পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে গুলি চালাতে আরম্ভ করে । ফলে ১৭ জন নিহত ও ১০০ জনের বেশী আহত হয় । ২০ জন পুলিশ কর্মীকে নিয়ে ঐ পুলিশ অফিসারকে গুলি চালাতে দেখা যায় । এই হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি পুলিশ ১৩ বছরের আবু বকর সিদ্দিক নামে এক মুসলমান ছেলেকে লক্ষ করে গুলি চালায় । ঘটনাস্থলেই ছেলেটি মারা যায় । একটি বুলেট তার হৃৎপিন্ড ভেদ করা চলে যায় । এই অপরাধ ঢাকার জন্য হিন্দু জঙ্গি পুলিশ সেখানে একটি গর্ত খুড়ে তাতে পেট্রোল ঢেলে দেয় এবং আবু বকরের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় । পরে এটাকে হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গার ফল ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে চালানো হয় । এবং এইভাবে যেন তার পোষ্ট মার্টম করা হয় তারও ব্যাবস্থা করে পুলিশ ।

এই কোয়েম্বাটুরে মুসলমান হওয়ার অপরাধে পুলিশ আয়ূব খান নামক এক মুসলমানকে গুলি করার নির্দেশ দেয় । গুলি চললে মাথা নিচু করেন আয়ুব খান ফলে গুলি হালকা ভাবে মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় । তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর ডান কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে । পরের গুলি তাঁর পাশের সাহুল হামীদকে ঘায়েল করে মাটিতে ফেলে দেয় ।

এই কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা যখন হয় তখন সি. আর. পি. এফ. এবং র‍্যাফ বাহিনীর উপস্থিত সত্যেও মুসলমানদের দোকানপাঠ ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ করতে থাকে

হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা । এমনটি এতে পুলিশরাও হিন্দুত্ববাদীদের সহযোগিতা করে । এই ঘটনাই মুসলমানদের ৫০০ কোটি টাকার উপর ক্ষয়ক্ষতি হয় ।

১৯৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী একদল পুলিশ তিরুমল ষ্ট্রীটে বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অপরাধে একটি গ্রুপকে পাকড়াও করতে যায় । ইন্সপেক্টর চন্দ্রশেখর এতে নেতৃত্ব দেন । মিডিয়া ঘটনাটিকে এভাবে প্রচার করে যে পুলিশ ইন্সপেক্টর এই গ্রুপের লোকগুলোকে একটি ঘরে বন্ধ করে দেয় । গুলি চালানোর ফলে বিস্ফোরণ হয়ে ৬ জন উগ্রবাদী মারা যায় । পরে ওই ঘরের যে নক্শা তৈরী করা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে সেখানে উগ্রবাদী লুকিয়ে থাকতে পারে । অর্থাৎ চক্রান্ত করে পুলিশ জঙ্গি বাহিনী ওই গ্রুপকে হত্যা করে ।

এই অঞ্চলে আট বাড়িতে পুলিশ অবাধে লুটপাঠ চালায় । ফ্রিজ, টিভির মত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায় । সমস্ত মানুষকে গ্রেফতার করা হয় । বালির বস্তা দেখিয়ে বলে এতে বিস্ফোরক পদার্থ রাখা ছিল ।

১৩ বছরের ছেলে শরফুদ্দীনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ভারতীয় আইনের ১৪৭, ১৪৮ ও ৩০৭ অধীনে । পরে এই পুলিশ জঙ্গি ৩০৭ ধারাকে (হত্যার প্রয়াস) ৩০২ ধারায় (হত্যা) রুপান্তরিত করার চেষ্টা করে । অথচ সেই সময় (১৩ ফেব্রুয়ারী) শরফুদ্দীন স্কুলে ছিল । কিন্তু সার্টিফিকেট পেশ করা সত্যেও তাকে ছাড়ে নি কোয়েম্বাটুরের জঙ্গি পুলিশ ।

আসুন এই কোয়েম্বাটুরে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি ও পুলিশ জঙ্গি বাহিনী মুসলমানদেরকে যে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

মুম্বাই দাঙ্গায় হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন

১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে দাঙ্গা হয় । এই দাঙ্গার মুল কারণ ছিলেন শিবসেনা জঙ্গি নেতা বাল ঠাকরে । এই দাঙ্গায় অভিযুক্তরা ছিল শিবসেনা ও বিজেপি সদস্য । এই দাঙ্গায় মহাআরতির সময় আগরীপাড়াতে ৯ জানুয়ারী ৩ জন মুসলিমকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় । এই দিনে ডি বি মার্গে মহাআরতির সময় গ্রান্ট রোডের মসজিদ থেকে আযানের শব্দ আসতে থাকে । আযানের শব্দ শুনে মহাআরতিতে অংশগ্রহণকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে । পুলিশ মসজিদের আযান বন্ধ করতে বলে । কিন্তু মহাআরতীরা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে আরতির পর তারা মুসলমানদের দোকানে হামলা করে লুটপাঠ চালায় । ৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তারাদেব নামক জায়গায় মহাআরতীতে অংশগ্রহণকারীরা 'শিবসেনা জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে মুসলিমদের দোকান লুঠ করে । এসিপি এই মহাআরতীকে শান্তিপূর্ণ বলে আখ্যা দেন । তিনি বলে মহাআরতীতে কোন উস্কানীমুলক ভাষন দেওয়া হয়নি । পরে জেরার

সময় কমিশনারের সামনে স্বীকার করেন, মহাআরতীতে অংশগ্রহনকারীরা মুসলিমদের দোকান ভাঙচুর করে এবং লুঠপাট করে ।

৮ জানুয়ারী বি. আই. টি. চাল, মাওলানা আযাদ রোড, সাখালী ষ্ট্রীট এবং কল্পনা জংশনে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে । হামলাকারীরা মুসলিমদের উপর সোডা বোতল, পেট্রোল বোমা এবং পাথর ছোঁড়ে এবং স্লোগান দিতে থাকে - ‘‘লন্ডীয়া ভাইকো মার দো (খৎনাওয়ালাদেরকে হত্যা করো), পাকিস্তানীয়োকো ভাগাও আওর বারা নাম্বার মে ঘুসো (পাকিস্তানীদেরকে তাড়িয়ে দাও এবং ১২ নম্বরে ঢুকে পড়)’’

মমতায রহমান নামে একজন আগরীপাড়া থানায় ফোন করে জানায় ১২ নং চালে হামলা হতে চলেছে । পুলিশ বলে, ‘‘লন্ডীয়া ভাই চুপ ব্যায়ঠো, অভি কুছ নেহী হুয়া ।’’ এরপর রিসিভার রেখে দেয় ।

পুলিশের উপস্থিতি থাকা সত্যেও দুস্কৃতরা ১২ নং চালের টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও পানীর সংযোগ কেটে দেয় । তারা মুসলমাদের দুটি ট্যাক্সি ও মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় । মুসলমাদের বাড়ী থেকে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিনিয়ে তাতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে । কিন্তু পুলিশ বিপদ বুঝে গ্যাস সিলিন্ডার রক্ষা করে ।

৮ জানুয়ারী ৮ নং চালে রাত সাড়ে দশটায় দুস্কৃতিরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে । এবং সতীশ নাগাওয়াঙ্কার নামক এক ব্যাক্তি ঘরের জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করে দেয় । এই লুটপাট ও দাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতিতেই হয়েছিল । ১২ নং চালে হামলা করার সময় দুস্কৃতিরা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছিল, ‘‘লন্ডীয়া ভাই কা ঘর কিধর হ্যায় ।’’ মুসলমানরা পুলিশকে অভিযোগ করলে বলে, ‘‘পাকিস্তান চলী যাও ইঁহা কিঁউ আতী হো মরনে কে লিয়ে ।’’

এই মুম্বাই হামলার সময় হিন্দু জঙ্গিদের হাতে ছিল লোহার রড, তরবারী, কাটারী এবং গুপ্তী (একধরণের ছুরি যা ছড়ির মধ্যে লুকোনো থাকে) তাদের স্লোগান ছিল, ‘‘লন্ডীয়াকো মারো আওর অপনে ঘর সে বাহার আও ।’’ এই হামলার সময় ‘সামনা’র সম্পাদকীয়তে (Exh 355c) ‘‘রাষ্ট্রীয় জীবন্ত থেওয়া’’ শিরোনামে ছাপা হয়, যাতে হিন্দুদেরকে প্ররোচিত করা হয় আক্রমনে অংশগ্রহণের জন্য । অথচ সরকার এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি ।

৮ নভেম্বর ১৯৯২ সালে অর্থাৎ বাবরী মসজিদ ধংশের ঠিক এক সপ্তাহ আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি সাইকেল মিছিল সংগঠিত করে । এই মিছিলের স্লোগান ছিল,

নাম মিটাও বাবর কা
তেল লাগাও ডাবর কা
হিন্দুস্তান হিন্দুওকা
নেহী কিসি কে বাপ কা ।।

অর্থাৎ -

বাবরের নাম মুছে দাও
ডাবরের তেল লাগাও
হিন্দুস্তান হিন্দুদের
নয় কারো বাপের ।

হিন্দুত্ববাদীদর আরও স্লোগান ছিল,

কমর মে লুঙ্গি মুহ মে পান,
ভাগো লন্ডীয়া পাকিস্তান ।

বিজেপির স্লোগান ছিল,

এক ধাক্কা আওর দো
বাবরী মসজিদ তোড় দো ।

❖

ইস দেশ মে রেহনা হোগা
তো বন্দে মাতরম কেহনা হোগা ।

❖

সৌগন্ধ রাম কি খাতে হ্যাঁয়
মন্দির ওহী বানায়েঙ্গে ।

❖

অযোদ্ধো তো এক ঝাঁকি হ্যায়
কাশি মথুরা বাকী হ্যায় ।

❖

তলওয়ার নিকলী ময়দান সে
মন্দির বনেগা শান সে ।

এই মুম্বাই দাঙ্গার সময় একুশ বছরের মেহেরুন্নিসা হায়াত নামে একজন কলেজের ছাত্রী হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশেন দাখিল করেন । এই পিটিশনে তিনি পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, “তাঁর পিতা মুহাম্মাদ হায়াত পেশাগত টেলার মাস্টার । তাঁর ভাই সেলিম ১০ মার্চ (১৯৯৩) বাড়ি থেকে এই বলে চলে যায় যে, সে সৌদী আরব যাবে । সাদা কাপড়ে মাহিম থানার কয়েকজন পুলিশ গত ৩১ মার্চ সেলিমের খোঁজে তাদের বাড়ি আসে । ঘরে তন্নতন্ন করে খানা তল্লাসী চালায় । এরপর তাঁর বাবা, তিনবোন, ছোট ভাই এবং মাকে থানায় নিয়ে যায় । সেলিমের ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে । তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা পুলিশকে জানায় যে, তাঁরা নিজেরাই সেলিমের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন । তাঁরা কিছুই জানে না তার সম্পর্কে । তখন পুলিশের লোকেরা মরধর করতে শুরু করে তাদের সবাইকে ।”

মেহেরুন্নিসার কথায়, "একজন পুলিশ অফিসার আমার দোপাট্টা (ওড়না) খুলে ফেলতে বলেন। আমি অস্বীকার করি। তখন হেঁচকা টানে আমার দোপাট্টা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ফেলে দেন। আমার হাতে আঘাত করেন ব্লেড দিয়ে। এরপর তিনি আমার ভেতরের জামা ধরে আমার বাবাকে বলেন যে, তিনি যদি তাঁর সামনে তাঁর মেয়েকে নগ্ন করুক এবং মারধর করুক। শেষে এই অফিসার সবাইকে ঘুসি মারেন।" মেহেরুন্নিসা আরও বলেন, "পুলিশের লোকেরা তাঁকে হুমকি দেন যে, তিনি যদি তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে মুখ না খোলেন তাহলে তাঁর পরিনতি এমন করা হবে তার ভাবী স্বামী তাকে ঘৃনা করবে।" এরপর মেহেরুন্নিসাকে জিজ্ঞেস করা হয় তার কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা ? জবাবে তিনি বলেন, "না। তখন পুলিশ তার গালে চড় মারে। তার চুল ধরে বলে, তুই কি সতী-সাবিত্রী।" মেহেরুন্নিসা হাইকোর্টে বলেন, তার সাথে বলাৎকারকারী পুলিশ নওজয়ানকে তিনি সনাক্ত করতে পারবেন।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন ! এই মুম্বাইয়ে দাঙ্গাকারী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি শিবসেনা নেতা কোন মুসলমান ছিল না। সে কট্টরপন্থী হিন্দু। দাঙ্গাকারীরাও ছিল হিন্দু। দাঙ্গায় সাহায্যকারী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি পুলিশরাও ছিল হিন্দু। তাহলে আসুন বাল ঠাকরে (লাআনাতুল্লা), দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও দাঙ্গায় সাহায্যকারী পুলিশ জঙ্গি বাহিনী যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি।

গুজরাটে হিন্দুত্ববাদীদের ভয়াবহ সন্ত্রাস

গুজরাটে হিন্দুত্ববাদীদের জঙ্গি নেতা নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের উপর মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়। তার ইশারায় ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যাক্তিদের তালিকা নিচে দেওয়া হল,

১. আকবর খান মাকরানী, ২. জাহিরুদ্দীন নাসিরুদ্দিন আনসারী, ৩. মহম্মদ ইদ্রিস ও মহম্মদ ইসমাইল, ৪. তাহকির আহমেদ মুনীর আহমেদ, ৫. জামিল মিঞা ও কিফাইতু মিঞা মিস্ত্রী, ৬. কাদ্রি কার্মালুদ্দিন আহমেদ আলি, ৭. নুরবান মহম্মদ আনসারী, ৮. আব্দুল রেহমান আব্দুল রাজ্জাক সেখ, ৯. হাদিভাই পিতা গোলাম রসুল আব্দুল ভাই, ১০. আনসারী মহিউদ্দিন জমাদার, ১১. সুলতান ভাই আজিজ ভাই মালেক, ১২. আনসারী ইলিয়াস ভাই জুমরাতি, ১৩. সাবির হুসেন ফতেহসাদ, ১৪. হানিফ ভাই আলি বক্স রেলওয়েওয়ালা, ১৫. মহঃ হুসেন আল্লারাখা শেখ, ১৬. আব্দুল করিম মেহবুব মিঞা পাঠান, ১৭. জাকির হুসেন মেহমুদ হুসেন আরিয়ান, ১৮. ইলিয়াস আহমেদ জুমরাতি, ১৯. মহঃ ইশাক আব্দুল আজিজ, ২০. মহঃ মুবিন আলি, ২১. শারির আহমেদ ইকবাল আহমেদ আরিয়ান, ২২) জুম্মাদিন ম জাকিরা, ২৩. মাহমুদ হাফিফ মাহমুদ সেখ, ২৪. গুলাম রসুল গুলাম নবী, ২৫. ত্রোহাদ আলি হায়দার আলি, ২৬. গব্বর ভাই, ২৭. ইস্তিয়াক খান নিজামুদ্দিন খান, ২৮. পারভেজ ভাই গুলাম দস্তগীর, ২৯. শামির ইকবাল ভাই মনসুরি, ৩০. কৌসরভাই সোব্রাতি আলি, ৩১. নাসির খান কায়াম খান, ৩২. জাকির ভাই, ৩৩. শামির ভাই, ৩৪. আজহারউদ্দিন সিরাজউদ্দিন, ৩৫. ইসমাইল ভাই ফ্রাইওয়েল, ৩৬. আনোয়ার হুসেন, ৩৭. নাসির ভাই রাজপুত, ৩৮. আখতার ভাই, ৩৯. মহঃ

নঈম নাসরুল্লা, ৪০. মহঃ আজিম, ৪১. নিসার আহমেদ এ হামিদ, ৪২. আসলাম ভাই, ৪৩. ইমতিয়াজ খান নিজামুদ্দিন পাঠান।

এছাড়াও জামালপুরের গুল্লুভাই করিম ভাই শেখ (৪২), সার্ফরোজ তাকুব ভাই বাল্গিওয়ালা (২৩), মহম্মদ ইরফান আব্দুল জব্বার আনসারী, সিকন্দার খান পাঠান, সাইয়েদ ফরজানা বুখারী (৩০), অ্যাডভোকেট নিজাম নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি বাহিনীর গুলিতে নিহত হন।

এই শিশুদেরকেও গুলি করা হয়েছে,

১. মহম্মদ হুসেন - আহত (শিশু)
২. ইরসাদ মির্জ - আহত (শিশু)
৩. আইয়ুব খান আইয়ুব খান - আহত (শিশু)
৪. ইকবাল মির্জা মহম্মদ খান - আহত (শিশু)
৫. হানিফ মির্জা রশিদ মির্জা - আহত (শিশু)
৬. আকবরখান আফসরখান - আহত (শিশু)
৭. সৈয়দ জাভেদ - আহত (শিশু)
৮. মুসির আহমেদ - আহত (শিশু)
৯. নিজামুদ্দিন - আহত (শিশু)
১০. ফিরাজ ফরিক - আহত (শিশু)

গুজরাটের গোধরা কান্ডের বিবৃতি দিতে গিয়ে সুমন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "গোধরার নৃশংস কান্ডের পরে গুজরাতে যা হয়েছে তাকে আর যাই হোক, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যাবে না কিছুতেই। কেননা যে কোন দাঙ্গায় সাধারনতঃ দুটি পক্ষ থাকে, দুটি পক্ষের মানুষই কমবেশী হতাহত হন। গুজরাতে তা হয়নি। সেখানে একটি সম্প্রদায়ের মানুষ সংগঠিত হয়ে আর একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করেছে। প্রতিঘাতের কোন ঘটনাই ঘটেনি।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ, ২০০২)

মহেশ্বেতা দেবী লিখেছেন, "প্রায় ক্ষেত্রেই বালিকা কিশোরী যুবতী মেয়েদের তাদের পরিবারের মানুষদের সামনে প্রথমে গণধর্ষন করা হয়েছে। তারপর নানা ভাবে তাদের মারা হয়েছে যথা : আগুনে পুড়িয়ে, নয়তো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে ছেঁচে, একটি ক্ষেত্রে স্ক্রু ড্রাইভার ছিল তাদের হত্যাস্ত্র। আচমকা শরণার্থী শিবিরে মেয়েরা বলল, শঙ্কার্ত একদল মেয়ের সামনে সশস্ত্র পুরুষরা পোষাক খুলে উলঙ্গ হয়, আরও ভয় দেখাবার জন্য।" মহেশ্বেতা দেবী বলেন, "গুজরাটে দাঙ্গা হয়নি। রামমন্দিরকে ইস্যু করে নির্বিচারে মুসলমান হত্যা হয়েছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মার্চ, ২০০২)

হিন্দুত্ববাদীরা যে ইস্তেহার বিলি করেছে তাতে লেখা আছে, "কেউ মুসলমানদের অফিসে চাকরি করনা, ওদের চাকরিতেও রেখ না । এর ১০-১০ কপি বানিয়ে বিলি কর । হনুমানজির কসম আউর জয় শ্রীরাম ।....এমনকি পুলিশ, কী ফৌজ কেউই হিন্দুর হাত থেকে মুসলমানকে বাঁচাতে পারবে না । ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন ভারতে ৩ কোটি মুসলমান ছিল । আজ ওরা ৩৫ কোটি ।.... রাম নাম লে কে হামলা করেঙ্গে । বাবরী কো জৈসে ধ্বংস কিয়া থা/ বাস্তোকা কাট কে উনসে লহু কি নদীয়াঁ বহায়েঙ্গে/ধন্য হ্যায় নরেন্দ্র মোদী/তুমকো সালাম ।"

দিব্যেন্দু পালিত বলেছেন, "গুজরাতে পরিকল্পিত ভাবে যে গণহত্যা ঘটেছে - ঘটে চলছে এখনও তার কোনও তুলনা স্বাধীন ভারতের পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসে নেই ।.......কিন্তু এই সরকারী হিসাবের বাইরে আরও কত পুরুষ, নারী, শিশু, এমনকি তরবারির আঘাতে গর্ভবতী নারীর পেট চিরে বের করে আনা ভ্রূনকে হত্যা করা হয়েছে তার সংখ্যা কেউ জানে না ।.........কলম সতর্ক হও, ফ্যাসিজম আসছে । এবং তা গুজরাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না । তার লক্ষ্য আরও বড়, আরও ভয়ঙ্কর ।" (রক্তমাংস, পৃষ্ঠা-১১)

অরুন্ধতী রায় লিখেছেন, "মধ্যরাতে বরোদা থেকে ফোনটা এল । আমার এক বান্ধবীর । কাঁদছে । কী ঘটনা শুধু সেটা বোঝাতেই সময় নিল ১৫ মিনিট । যদিও তেমন কিছু জটিল বিষয় ছিল না সেটা । শুধু তার এক বান্ধবী সইদা ধরা পরে গিয়েছিন উন্মত্ত দাঙ্গাবাজদের হাতে । তারপর আর নতুনত্ব কিছু নেই, পেটটা চিরে নাড়ীভুড়ি বার করে পেট্রল ভেজানো ন্যাকড়া তার পাকস্থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারা । এবং কেউ একজন কোন যন্ত্রনা দেবেনা বলেই হয়তো সইদা মরার পর তার কপালে ছুরি দিয়ে খুদে লিখেছিল ওঁ ।

সরকারী মতে মৃতদের সংখ্যা (তখন) ৮০০ । অন্যসূত্রের রিপোর্টে এই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে ২০০০ এর অনেক উপরে । দেড়লক্ষ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি, আশ্রয় থেকে তাড়ানো হয়েছে । এখন উদ্বাস্তু শিবিরগুলিই তাদের ঠিকানা । মেয়েদের জামাকাপড় খুলে বে-আব্রু করে দলবদ্ধভাবে ধর্ষন করা হয়েছে । সন্তানদের সামনে বাপ মাকে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে । ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ২৪০টি দরগা, ১৮০টি মসজিদ । হত্যাকারীরা সব দরজা, লোহার গেট ভেঙে জাফরির বাড়িতে ঢুকেছে । তাঁর মেয়েদের এক এক করে নগ্ন করে ক্ষত-বিক্ষত, খন্ড বিভাজনে পেট্রলে ভিজিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে । এহসান জাফরির শরীরে জ্বলন্ত টায়ার গলিয়ে মাথা কেটেছে এক কোপে তার পরে কেটেছে দেহের প্রতিটি উপাঙ্গ ।"

'কমিউনিজম কমব্যাট' পত্রিকার ৭ মার্চ, ২০০২ এর সংখ্যায় বলা হয়েছে যে গুজরাটে প্রায় ২০০০ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কেটে ফেলা হয়েছে ফালা ফালা করে, খুন করা হয়েছে । বিশেষত যুবতী নারীদের, জামা-কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে প্রকাশ্যে, হাজার হাজার উল্লসিত জনতার সামনে, নগ্ন করা হয়েছে । দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের, শরীরের নারী অঙ্গগুলি কার্যত কামড়ে, ছিঁড়ে নেওয়া, শাণিত শস্ত্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে দেহ থেকে

তারপর নারীদের খুন করা হয়েছে টুকরো টুকরো করে কেটে । বৃদ্ধ ও শিশুদের রেহাই দেওয়া হয়নি । মুসলমানদের বাড়ি ঘর এবং গৃহস্থালী আসবাবপত্র সহ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সামগ্রী কেবল জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়নি, কম্পিউটার কৃত লিস্ট এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি শহর, গঞ্জ ও গ্রামের মুসলমানদের দোকান, হোটেল, ব্যাবসা-বানিজ্যকে টার্গেট করে আক্রমণ করা হয়েছে । প্রথমে তাদের সমস্ত সামগ্রী লুঠ করা হয়েছে তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি, ঘর, দোকান, ফ্যাক্টরি, গুদাম ইত্যাদি ।

সাহিবাগ এলাকার দরিয়াখান ঘুমত্-এ আক্রান্ত ও বসত এলাকা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের ত্রাণ শিবিরের নিকটে গণকবর-স্থানে কবর খননে নিযুক্ত ব্যাক্তিটি ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’কে জানায়, “খুন হওয়া অসংখ্য মানুষের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন গর্ভবতী নারী ছিল, যার মধ্যে একজনরের জঠর থেকে গর্ভস্থ শিশুর দেহপিণ্ড মায়ের শরীরের বাইরে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল । সন্তান দেহকে মায়ের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, তারপর শিশুসহ মাতাকে কবর দেওয়া হয়েছিল ।”

“যে দেহগুলি ধুয়েছি, সেগুলির অনেকগুলিরই মাথা ছিল না, অনেকের ছিল না হাত বা পা, কতকগুলি দেহ ছিল নিকষ কালো কয়লার মত খটখটে; আপনি যদি সেগুলি হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন তবে সেগুলি ভেঙে যেত খন্ড খন্ড হয়ে । কতকগুলি নারীদেহ ছিল ঠিক মাঝখান থেকে দ্বিখন্ডিত । ২ মার্চের আগে আমি ১৭টি নারীদেহের কবর দিয়েছি, তার মধ্যে একটি কেবল অক্ষত ছিল । মনের অবস্থা এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে মৃতদেহগুলি আর ধৌত করতে পারতাম না, দেহগুলির উপর কেবল জল ছিটিয়ে দিতাম ।”

‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ এবং ‘সহমত’ রিপোর্ট দিয়েছে আক্রমণগুলির চরিত্রের । প্রথমে মুসলমান এলাকাগুলির কাছে এসে একটি ট্রাক দাঁড়াত । সেই ট্রাক থেকে মাইকের সাহায্যে উচ্চকণ্ঠে প্ররোচনামুলক ও অগ্নি বর্ষী শ্লোগান ও বক্তৃতা দেওয়া হত । তারপর হাজার হাজার যুবা, বহু সংখ্যক ট্রাকে হাজির হত সেখানে, যাদের হাতে থাকত অস্ত্রশস্ত্র । এদের মধ্যে যে নেতা, সে মপবাইল টেলিফোনে কেন্দ্র থেকে নির্দেষ গ্রহণ করত । তাদের কাছে মুসলমান পরিবারদের বিস্তৃত তথ্য থাকত । যেসব মুসলমান পরিবারে হিন্দুদের বিবাহ হয়েছে তাদের আক্রমণ করা হত না । প্রথমে বোমা এবং কাপড়ের কুন্ডলী করে তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুনের গোলার মত করে ছোঁড়া হত বাড়িগুলিতে । তারপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে মহল্লার প্রান্তিক বাড়িগুলিতে ঢুকে দক্ষতার সাথে গ্যাসে আগুন নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাত । আগুন চারিদিকে দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হত প্রত্যক্ষ হামলা । বাপুনগর এলাকার সুন্দরনগর মুসলমান পল্লীতে ১৫,০০০ হামলাবাজ ট্রাক ভর্তি এল পি. জি সিলিন্ডার নিয়ে আক্রমণ করে । ৩৬ ঘন্টা ধরে মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন । অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর লোকেরা যখন ক্লান্ত হয়েছে, তখন তাদের বিশ্রাম দিয়ে বিকল্প লোকেরা এসে আক্রমণ শুরু করেছে । শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে মুসলমানদের প্রতিরোধ । জল্লাদ বাহিনীর বন্যায় ভেসে গেছে নিরীহ, নিরপরাধ, আর্ত, বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, রোগি সহ এলাকার মুসলমান মানুষেরা । ফিরে যাওয়ার সময় ফ্যাসিস্ট জল্লাদরা ফেলে রেখে

গেছে রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে থাকার মতো অজস্র মৃতদেহ । যাওয়ার আগে বাড়ির দেওয়ালগুলিতে লিখে রেখে গেছে, “ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায়, পুলিশ হামারে সাথ হ্যায় ।” অথবা ‘জানসে মার দেঙ্গে’, ‘বজরং দল জিন্দাবাদ’, ‘নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ’ ।

গুজরাট ক্যাডারের আই. এ. এস. অফিসার হর্ষ মান্দার এই পাশবিকতা সহ্য করতে না পেরে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন । ‘ক্রাই মাই বিলাভেড কান্ট্রি’ নামক একখানি পুস্তক লেখেন । তাতে তিনি লিখেছেন, “......যখন আট মাসের গর্ভবতী এক রমণী আকুলভাবে তার প্রাণ ভিক্ষা করে, তখন আপনার কি মনে হবে । হত্যাকারীরা তাতে কর্ণপাত করার পরিবর্তে তার পেট ফেড়ে ফেলে, সন্তানকে জঠর থেকে টেনে বার করে এনে, মৃতপ্রায় মায়ের সামনে খুন করে । আপনি কি বলবেন এই ঘটনাকে, যখন একটা সমগ্র বাড়িতে জল দিয়ে প্লাবিত করে তারপর তাতে হাইটেনশন বিদ্যুৎ সংযোগ করে ১৯ জনকে খুন করা হয় । ছয় বছরের এক শিশু জুহুপাড়া ত্রান শিবিরে সাংবাদিকদের জানিয়েছে কিভাবে তার মা এবং ছয় বোনকে পিষ্ট করে মেরে ফেলা হয়েছে ।”

গুজরাট মুসলমান নারীদেকে ‘রেপ’ বা ধর্ষণ, ‘গ্যাংরেপ’ বা দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ, ‘ম্যাস রেপ’ বা গণধর্ষণ ‘স্ট্রিপিং’ বা গাত্রবস্ত্র ছিঁড়ে নিয়ে নগ্ন করে ফেলা, ‘ইনসারসান অব অবজেক্টস ইন টু দেয়ার বডিজ’ বা যৌন নালীতে শক্ত জিনিস জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া, ‘কাটিং অব ভ্যাজাইনা’ বা যৌন মুখ কর্তন করা, ‘মোলাস্টেশন’ বা যৌন উৎপীড়ন প্রভৃতি করা হয় । সংবাদপত্র জানিয়েছে, মুসলমান নারীদের ধরে এনে জড়ো করার পর, গুন্ডাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে একে একে ডেকে তাদের দিয়ে নারীদের ধর্ষণ করানো হয়েছে । ১২ বছর বয়সী কিশোরদের পর্যন্ত শেখানো হয়েছে ধর্ষণ করতে । নারীদের উপর যৌন নিপীড়নের জন্য লিফলেট দিয়ে জঘন্য ভাষাতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে । এমন একটি লিফলেট বহু পত্রিকাতেও ছাপানো হয়েছে, ইংরেজিতে । সেটির বক্তব্য এত কুৎসিত যে স্থানীয় ভাষাতে কোনও পত্রিকা অনুবাদ করে ছাপাতে পারেনি । আর একটি লিফলেট হিন্দু পুরুষদের মুসলমান নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে নির্দেষ দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলমান নারীর গর্ভে হিন্দু সন্তান জন্ম নেয় । এইসব যৌন নির্যাতন এবং তারপর অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার ঘটনাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছে লিপিবদ্ধ করেছে প্রত্যক্ষদর্শী বা আক্রান্তদের পরিবারের লোকেরা ।

‘কমিউনিজম কমব্যাট’ পত্রিকার লেখিকা শ্রীমতি তিস্তা শীতলবাদ জানিয়েছেন যে গুজরাতে এই প্রস্তুতি চলছিল বিগত দু’বছর ধরে । বজরং দল উচ্চ বেতন দিয়ে লোক নিয়োগ করেছিল এক সংগঠিত অংশকে তলোয়ার ও ত্রিশূল চালানো শেখাবার জন্য । তারাই পূর্বোক্ত মিলিশিয়াকে ট্রেনিং দিয়েছে । শুধু শারীরিক ট্রেনিং দেওয়ার বিষয়টিই প্রধান ছিল না । মিলিশিয়ার সদস্যদের মানসিক স্তরেও “শত্রু” সম্পকর্র চরম ঘৃণা ও জিঘাংসার প্রবৃত্তি গড়ে তোলা হয়েছে মতাদর্শের গভীর প্রচার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে । পরবর্তীকালে পুলিশ যে সমস্ত তরবারী উদ্ধার করেছে সেগুলির সবগুলি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং একইভাবে তৈরী । এগুলি

গোধরা ঘটনার আগেই হামলা বাজদের মধ্যে বন্টিত হয়েছিল । বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক জয়দীপ প্যাটেল বলেছে যে অস্ত্রগুলি রুটিন করে আনা হচ্ছে এবং ধারাবাহিকভাবে বন্টন করা হচ্ছে । তলোয়ারগুলি চার ফুট লম্বা এবং প্রচন্ড ধারালো । তলোয়ারগুলি অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে রাজস্থানের একটি ফ্যাক্টরি থেকে ।

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতবর্ষে গোমাংস ভক্ষন করাকে নিষিদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে । কেননা গরু হল হিন্দুদের মাতা । তাই তারা গোমাতাকে বাঁচাবার জন মরীয়া অথচ এই হিন্দুত্ববাদীরা গুজরাটে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে যে পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় মুসলমানরা তাদের নিকট গরু ছাগলের চেয়েও নিকৃষ্ট । এই নরঘাতক নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছে । সে বলেছে, "মনে করুন, গাড়ি চালাচ্ছি, হয়তো বা পিছনের আসনে বসে আছি । তখন যদি একটা কুকুরছানাও চাপা পড়ে সেটা কি দুঃখের নয় ? অবশ্যই দুঃখের ।"

একজন মানুষ কতটা নিকৃষ্ট হলে এরকম কথা বলতে পারে পাঠকগণ আপনারাই বিচার করুন । এই হিন্দুত্ববাদীরাই প্রানী হত্যার বিপক্ষে ফতোয়া দেন । মাছ, মাংস, ডিম খান না ।

জার্মানে হিটলারের জঙ্গিবাহিনী যেরকম ইহুদীদের উপর নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছিল ঠিক সেই রকম হিটলারের উত্তরসূরীরা গুজরাটে মুসলমানদের উপর হত্যাকান্ড চালায় এবং পরবর্তীকালে এই ফ্যাসিস্ট হিন্দুত্ববাদীরা জার্মান হিটলার বাহিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমানদের ভারত থেকে তাড়াবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । মুম্বাই ও গুজরাটের দাঙ্গা যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের ভাড়াটে দালাল বাল ঠাকরে তো প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন, "হিটলার ইহুদীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি মুসলিমদের সঙ্গে একই আচরণ করবেন ।" আর গুজরাটে সেটিই করা হয়েছে ।

হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা গুজরাটে যেভাবে মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমন করেছে তা ভারতীয় ইতিহাসে নযীরবিহীন । আর এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল নেতা ছিলেন ভারতের সবথেকে বড় জঙ্গি নেতা নরেন্দ্র দামোদর মোদী ।

তাহলে আসুন আমরা সকলে গুজরাত হত্যাকান্ডের জঙ্গি হিন্দুরা এবং নরেন্দ্র মোদী যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

হিন্দু জঙ্গি সংগঠন আর. এস. এস. এর কিছু নমুনা পুস্তিকা

প্রফেসার গৌতম রায় 'গুজরাট ও হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ' নামক বইয়ের মধ্যে আর. এস. এস. এর কয়েকটি নমুনা পুস্তকের উল্লেখ করেছেন । তার ৩ নং নমুনা পুস্ককে লেখা আছে,

"ওঠ - জাগো - ঐক্যবদ্ধ হও ঢিলের বদলে পাটকেল নাও

আজ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ধ্বংস করতে চাইছে । মুসলমানদের লজ্জিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও তারা হিন্দুস্তানী হয়ে উঠেনি । তবে সংখ্যাগুরুদের শক্তি সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই । গোধরা হত্যাকান্ড আর সিন্ধি বাজার ধ্বংস হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা অনেক বেশী বিশ্বাসঘাতক । এখনও পর্যন্ত মুসলিমরা শুধু কাশ্মীরেই ওদের বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপের নমুনা দেখিয়েছে, তারপর তারা দিল্লী লোকসভা পর্যন্ত ওদের কার্যকলাপ বিস্তৃত করলো । কিন্তু গুজরাটকে লক্ষ্য করে ওরা চরম ভুল করেছে । এখন আর কোন হিন্দু ওদের রক্ষা করবে না

- পুলিশ নয় - মিলিটারী নয় - ভোট পাকড়ানো রাজনৈতিক দাদা যারা ওদের তোল্লাই দেয় - তারাও নয় ।

ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন ভারতের তিন কোটি মুসলিম ছিলো । এখন এই ৫০ বছর পূর্তিতে দেখা যাচ্ছে ওরা ৩৫ কোটি । বুঝে দেখুন অবস্থাটা আর সাবধান হোন । পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ওরা আমাদের সমান হয়ে যাবে । এখানে কেউ ক্রিকেট টিম তৈরী করতে বসেনি । পাকিস্তান তার সৈন্যবাহিনী সাজাচ্ছে ।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেউ বলার আছে যে আপনারাও হিন্দু । অতএব সতর্ক হোন । আপনারাও আক্রান্ত হতে পারেন । আপনাদের উচিত হিন্দুদের সমর্থন করা । আমরা হিন্দরাই পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি ।

হিন্দুভাইসব ঐক্যবদ্ধ হোন, স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরী করুন যেমন হয়েছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় । শত্রুনিধন করুন, দেশ যে পাপের বোঝা বয়ে চলেছে তা হালকা করুন । (অর্থাৎ মুসলমানকে হত্যা)

ভাটোয়া থেকে নারোদা, বাপুনগর থেকে কানপুর ২৯শে মার্চ একটা আহ্বান আসবে । রাম নাম নিয়ে আক্রমণ করুন ।

যেভাবে বাবরী ধ্বংস করেছি ঐভাবে মুসলিমদের মারবো । জামালপুর জ্বালাবো, দরিয়াপুর খালিকরবো । বৃদ্ধ হলেও ছেড়ে দেব না ।

আমরা হিন্দুস্তানীরা তোমাদের খুজে বের করে হত্যা করবো । এই হচ্ছে রঘুকুলের ঐতিহ্য আমরা শপথ নিয়ে বলছি । সোনিয়া ওর ফারুক শেখ আর হাজি বিলালের মতো কুত্তাদের নিয়ে যত খুসি ঘুরুক ।

আমরা ওদের অবস্থা করবো এহসান জাফরির মতো ।
মুসলিমরা দোকান জ্বালিয়ে আকাশ ধোঁয়ায় অন্ধকার করে দিয়েছে ।
আমরা ওদের কেটে রক্তনদী বইয়ে দেব । স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী হবে হিন্দুত্বের ঐক্যের নিদর্শন । হাজারে হাজারে হিন্দুভাই এতে যোগ দিয়েছে ।

নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ । আপনাকে সেলাম, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের পর একজন হিরো জন্মেছে । গুজরাট গর্বিত ভারতের গরিমা আপনারই হাতের মুঠোয় ।

হিন্দুদের অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে ঢিল না ছুঁড়তে । ওরা আপনার ভাই ।

-একজন ভারতীয়

(২৮ মার্চ ২০০২তে সিসি-র হস্তাগত হয়েছে ।)”

প্রফেসার গৌতম রায় ৫ নং নমুনা পুস্তিকার উল্লেখ করে লিখেছেন,

“আর. এস. এস. সদস্যদের কাছে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ ঃ

১. দিনে দু'বার সকালে সন্ধায় মন্দিরে যাও ।

২. নেতা যখন তোমার সাহায্য চাইবেন তখনই সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকো ।

৩. যখন সেনাবাহিনী যাবে তখন বোমা নিক্ষিয় করো ।

৪. খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট ও টুপি পরো, হাতে একটা দড়ি বাঁধো ।

৫. সভায় ও সমাবেশে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য ঘোরাঘুরি করো ।

৬. যদি ওরা স্পর্ধা দেখায় প্রস্তুত হও, চিৎকার করো ।

৭. প্রতি মিটিং এর পর অন্তত তিনবার জোরে জোরে শ্লোক উচ্চারণ করো ।

৮. প্রতি সপ্তাহে একটা মিটিং করো ।

৯. মুসলিমদের সঙ্গে লড়ার সময় প্রতিবেশীদের বেশবাস পরিবর্তন করো যাতে তোমরা চিহ্নিত না হও ।

১০. সামনে থেকে নয় - পিছন থেকে আক্রমণ করো ।

১১. বেশিরভাগ রাত্রের দিকে আক্রমণ করো ।

১২. মুসলিমদের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করো ।

১৩. অস্ত্রশস্ত্র সহ পুলিশের হাতে পড়ো না ।

১৪. যখন মুসলিমদের জন্য কাজ করবে তখন পারিশ্রমিক নিও না ।

১৫. যখন বেতনের সময় হবে তখন খোঁজার ওছিলায় মানুষ সংগ্রহ করো ।

১৬. যদি কোনো মুসলিম দোকান থেকে কিছু কেন তবে শুধু ক্রয়মূল্য দাও - লাভ দিও না ।

১৭. পুলিশকে সত্য পরিচয় দিও না ।

১৮. তোমার মন্দিরকে রক্ষা করো ।

১৯. কোনো তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ তোমার নেতাকে লিখিত আকারে জানাও ।

২০. প্রতি সদস্য অন্তত একাধারে ১০ জন লোকের সাথে লড়ার প্রশিক্ষণ নেবে ।

২১. লড়াই-এর সময় যেকোনো অস্ত্র ব্যবহার করো ।

২২. মুসলিম বাড়িতে কাজ করলে মুসলিম মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলো যাতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ হয় ।

২৩. মুসলিম নবজাতকদের অন্যরকম করে দাও । এ এক সময় নায়কের দেশ ছিলো । এখন এ ভীত লোকে ভর্তি । ওরা আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে আর গরিব নির্দোষ বলিপ্রদত্ত হচ্ছে । যদি হিন্দু যুবকেরা জাগে তবে ওদের মাথায় শুধু জুতো বৃষ্টি হবে । হিন্দু জাগো আর মুসলিদের ধাওয়া করো ।”

দেখুন এখানে হিন্দুত্ববাদী আর. এস. এস. জঙ্গিরা তাঁদের কর্মীদেরকে কিরকম সন্ত্রাসবাদী শিক্ষা দিচ্ছেন । তাহলে আসুন এই আর. এস. এস. জঙ্গিরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

এছাড়াও ১৯৮০ সালের মোরাদাবাদ দাঙ্গার মুল কারণ ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা । ১৩ই আগস্ট ইদুল ফিতরের নামায পড়ার সময় ৫০,০০০ নামাযীর মধ্যে একটি শুকরকে তেড়ে ঢুকিয়ে দেয় হিন্দুরা । নামায চলাকালীন মুসলিমরা শুকরটিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন নি । সেখানে পুলিশের পাহারা ছিল । নামায শেষে পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । পুলিশ জানায় শুয়োর তাড়াবার জন্য তাদের রাখা হয়নি । শুরু হয় ধস্তাধস্তি এবং পরে ইঁট পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয় । ফলে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে তাতে ৪০০ জন মানুষ মারা যায় । বেসরকারী মতে আরও বেশী । এই দাঙ্গার কারণ ছিল মোরাদাবাদে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবসায়ে পেরে উঠতে পারছিলেন না । তাহলে আসুন এই মোরাদাবাদ দাঙ্গার মুল নায়ক হিন্দুরা ও পুলিশ জঙ্গিরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

ফিলিস্তিনে ইহুদী সন্ত্রাস

এই বছরই ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমানদের উপর নির্মম হত্যাকান্ড শুরু করে । এই ইহুদী জঙ্গিরা রকেট ও কামানের গোলা বর্ষন করে মুসলমানদের উপর । ফলে প্রায় ৩ হাজার নিরীহ মুসলমান মারা যান । তাদের বিমান থেকে বেপরোয়া গোলা বর্ষনে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় পুরো গাজা শহর । গাজার উত্তরাঞ্চল একেবারেই মানবশূন্য হয়ে পড়ে । এবং এই ১৪০ বর্গকিলোমিটারের গাজা একেবারে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে ।

এই ফিলিস্তিনে ২৮ দিনের মধ্যে ইজরাইলি ইহুদীদের হানায় প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনীর মৃত্যু হয়েছে । এর মধ্যে ৪০০ শিশু, ৩০০ মহিলা, বয়স্ক মানুষ ১০০ কাছাকাছি । এই ফিলিস্তিনে ২৮ দিনের মধ্যে ইজরাইলি ইহুদীদের হানায় প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনীর মৃত্যু হয়েছে । এর মধ্যে ৪০০ শিশু, ৩০০ মহিলা, বয়স্ক মানুষ ১০০ কাছাকাছি । ইহুদীদের আক্রমণে কয়েক হাজার আবাসন, মসজিদ, বাজার, শিশুত্রাণ শিবির, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে । ১৩৪ টা কারখানা ধ্বংস হয়েছে । ৩০ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে । এই হিংস্র বর্বর, ইহুদী জঙ্গিদের আক্রমণে ফিলিস্তিনের গাজায় বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই, ওষুধপত্র নেই, শিশুদের খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই । গাজা শহর শুধু ধ্বংসস্তুপ, আর শুধু বারুদের গন্ধ । ফিলিস্তিনের গাজাকে এখন বিশ্বের উন্মুক্ত কারাগার ও কসাইখানা বলে পশ্চিমা সমালোচকরা বলেছেন । এই ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের হত্যাকান্ডে ৭৭ শতাংসই নারী ও শিশু মারা গেছে ।

এই ইজরাইল রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয় তখন এই ফিলিস্তিনিদের দেশচ্যুত করেই আমেরিকার জারজ দেশ ইজারাইলের জন্ম হয় । এবং সেই থেকে আমেরিকা ১২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, যার সবটাই ব্যবহৃত হয়েছে ফিলিস্তিনের

মুসলমানদের মারার জন্য । আর এই অস্ত্র দিয়েই ১৯৮২ সালে ইজরাইল লেবানন আক্রমণ করে ১৯ হাজার ফিলিস্তিনি মুসলমানকে হত্যা করে । শাতিলা উদ্বাস্তু শিবিরে তিন হাজার নিরস্ত্র ও অসামরিক ফিলিস্তিনি মুসলমানকে হত্যা করে এই মার্কিন অস্ত্র দিয়েই । সেখানে ছড়িয়ে থাকা টোটার খোলে Made in USA ছাপ । এমনকি যে বুলডোজার দিয়ে ওই গণকবরস্থানে বর্বরতা আড়াল করার চেষ্টা হয়, তাও মার্কিন । ফিলিস্তিনিদের হত্যাকারী ইহুদীদের হলেও তাদের ছোঁড়া প্রতিটি বুলেট, প্রতিটি মর্টাস সেল, প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র, প্রতিটি ট্যাংক আমেরিকার তৈরী । তাই ইজরাইলের ইহুদীরা যত হত্যাকান্ড করেছে তাতে ইজরাইলের মতো আমেরিকাও সমানভাবে দায়ি । কারণ এই হত্যাকান্ডে আমেরিকা ইজরাইলকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করে ।

আসুন আমরা এই ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা ও মার্কিন সন্ত্রাসবাদীরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

নরেন্দ্র মোদীর সহযোগীতায় গুজরাটে পুলিশ জঙ্গির সাজানো এনকাউন্টার

২০০৪ সালের ১৪ই জুন ১৯ বছরের ইশরাত জাহানকে গুজরাট পুলিশ ইনকাউন্টার করে হত্যা করে । এনকাউন্টারকারীর নাম ডি. জি. বানজারা । তার উদ্দেশ্য ছিল এনকাউন্টার করে পদোন্নতি লাভ করা । তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে খাকি পোষাকধারী, নরেন্দ্র মোদীর পোষা বর্বর, হিংস্র, খুনি, পুলিশ জঙ্গিবাহিনীকে উলঙ্গ করে দেন এস. পি. তামাঙ্গ । আহমেদাবাদ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি. তামাঙ্গ ২৪৩ পাতার তদন্ত রিপোর্টে লিখেছেন যে ইশরাত এবং অন্য তিন যুবককে মুম্বাই থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অবৈধভাবে আটক রাখা হয় । ইশরাত জাহানকে ধর্ষন করা হতে থাকে । এরপর চারজনকেই হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয় । যাতে এই তদন্ত রিপোর্টে কোনরকম বিকৃতি না ঘটে সেজন্য তিনি নিজে হাতে লেখেন এই রিপোর্ট । এনকাউন্টারের পর জানানো হয় ইশরাত জাহান ও তার সঙ্গী জাভেদ আলম উরফে প্রমেশ কুমার বাল্টী, আমজাদ আলি উরফে রাজকুমার এবং যীশান জওহর আব্দুল গনী লস্কর ই তাইয়েবার মহিলা শাখার কমান্ডর ছিলেন । কিন্তু এস. পি. তামাঙ্গ যে রিপোর্ট তৈরী করেন তাতে বলেছেন, লস্করের সঙ্গে এই চারজনের কোন সম্পর্কই ছিল না ।

গুজরাটের পুলিশ জঙ্গিবাহিনী সার্ভিস রিভালভার দিয়ে এনকাউন্টার করে এই চারজনকে রাত্রি ৮-৯টা নাগাদ । লাশগুলোকে ঘটনাস্থলেই রেখে দেওয়া হয় । তবে ইশরাত জাহানের মায়ের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি. তামাঙ্গের রিপোর্টে নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গিবাহিনীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেয় । এস. পি. তামাঙ্গ রিপোর্টে প্রমাণ করে দেন চারজনকে মেরে ফেলা হয় অন্য কোথাও কয়েক ঘন্টা আগে । সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে গুলি চালানো হয় তা ভিত্তিহীন । যে পিস্তল সেখানে পাওয়া গেছে বলা হয় সেটা মরচে পড়া তাতে কোন গুলি চলেনি বহুদিন থেকেই । যে সন্ত্রাসবাদীদের উপর একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করার কথা

বলা হয় তার হাতে গান পাউডার পর্যন্ত পাওয়া যায় নি এবং ঘটনাস্থলে খালি কার্তুজও পাওয়া যায়নি । তিনি প্রশ্ন তোলেন, সেই রাতে ধর্মীয় মিছিল বেরুনোর কথা ছিল এবং আহমেদাবাদ নিরাপত্তার ঘেরাবন্দি ছিল । তাহলে ইন্ডিকা গাড়ি যাতে, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী ছিল, কিভাবে আহমেদাবাদ পৌঁছে যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি ।

এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি বাহিনী ৩৭টি মুসলিমকে এনকাউন্টার করে । পরে তা প্রমাণ হয় সমস্ত এনকাউন্টরগুলিই সাজানো ।

২০০২ সালের ২২ অক্টোবর রাত দুটোর সময় সমীর খান পাঠানকে গুজরাট পুলিশ এনকাউন্টার করে । এই এনকাউন্টার করে গুজরাট পুলিশ হিরো সাজার চেষ্টা করে । সমীর পাঠানের উপর অভিযোগ ছিল সে নাকি লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট ছিল । পরে প্রমাণ হয় পুরো এনকাউন্টারই সাজানো ।

২০০৩ সালের ১৩ জানুয়ারী গুজরাটের পুলিশ জঙ্গি সিনেমা হলের সামনে সাদিক জামালকে লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট হওয়ার অভিযোগে এনকাউন্টার করে । এরপর সাদিক জামালের বড় ভাই শাব্বির জামাল গুজরাট হাইকোর্টে একটি আরযী দায়ের করেন এই আরযীতে সাজানো এনকাউন্টারের তদন্ত করার আবেদন করা হয় ।

২০০৫ সালের ২৫শে নভেম্বর নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি হিংস্র বর্বর সুহরাবুদ্দিনকে এনকাউন্টার করে । পুলিশ দাবী করে সুহরাবুদ্দিন নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করতে এসেছিল । হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর স্ত্রী কাওসার বানুকেও হত্যা করা হয় এবং অভিযোগ লাগানো হয় সুহরাবুদ্দিনের স্ত্রী কাওসার বানু পাকিস্তানের নাগরিক । পরে সে ফিরে আসে । কিন্তু পরে প্রমাণ হয় নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গির এই এনকাউন্টারটা সাজানো ।

২০০৬ সালের ১৭ই মার্চ চারজন মুসলিম যুবককে এনকাউন্টার করা হয় । এভাবে অসংখ্য মুসলমান যুবককে গুজরাটের পুলিশ জঙ্গি বাহিনী মিথ্যা অভিযোগে এনকাউন্টার করে । প্রতিবারেই একটি অভিযোগ সবাই নাকি নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করতে আসছিল । সবাই নাকি লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট । গুজরাট পুলিশ জানাই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা (যদিও নয়) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও এনকাউন্টার করার সময় তারাও পুলিশের উপর ডজন ডজন রাউন্ডের পর রাউন্ড গুলি চালাচ্ছিল । কিন্তু গুজরাট পুলিশ এতই বাহাদুর যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের একটি গুলিও পুলিশের গায়ে লাগেনি । এমনকি পুলিশের গাড়িতে একটি গুলিও লাগেনি । এরকম ধরনের ঘটনা কোন কাল্পনিক রোমাঞ্চকর হলিউডের সিনেমাতেও ঘটে না যে । সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালো আর পুলিশপক্ষের তরফে কোন ক্ষয় ক্ষতি তো দুরের কথা তাদের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগে নি । আসলে সাজানো এনকাউন্টার হলে আর কি হবে ? কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তদন্তের পর পুরো সত্য আমাদের সামনে এসে গেছে এবং নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি বাহিনী পুরো উলঙ্গ হয়ে গেছে ।

একটি সাক্ষাৎকারে বিরোধী দলনেতা ও অ্যাডভোকেট হর্ষ গোহেল বলেন, "গুজরাটে গোধরা ঘটনার পরে মুসলিমদের গণহত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণকরে বিজেপি এবং অগনিত লোককে চরম বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হয় বিভিন্ন পন্থায় । ইশরাত জাহানের হত্যা সেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃতেই বিজেপি সরকারের অপরাধমূলক মস্তিস্কের পরিণতি । দাঙ্গার পরে গণহত্যা করার পরিকল্পনা করা হয় অন্যান্য পন্থায় । ইশরাত জাহান মামলার তদন্ত রিপোর্ট দ্বারা আমাদের পার্টির এই ভাবনা আরও দৃঢ় হয় যে বিজেপি মানবতার শত্রু হিসাবে কাজ করে ।"

তিনি আরও বলেন, "গুজরাটে কেবলমাত্র আড়াই বছর মেয়াদে ৩৭ জনকে বিভিন্ন সাজানো পুলিসি সংঘর্ষে হত্যা করা হয় । এসব হল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম দৃষ্টান্ত । ৩৭ জনকে কেবল সাজানো সংঘর্ষেই মারা হয়েছে । সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এই কাহিনী বানানো হয় যে, তারা নরেন্দ্র মোদীকে মারতে আসে অথবা আদবানীকে মারার চক্রান্ত করতে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু সত্য চিরদিন ঢাকা থাকে না ।"

আসুন মানবতার স্বঘোষিত ঠিকেদাররা গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি ডি. জি বানজারা ও অন্যান্য জঙ্গি পুলিশ ৩৯ জন নিরীহ মুসলমানকে মিথ্যা অজুহাতে হত্যা করে নিজেদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ সন্ত্রাস

যে গৌতম বুদ্ধকে আমরা শান্তির বানী প্রচারক অহিংসার ধর্ম হিসাবে জানি সেই বুদ্ধের অনুসারী অর্থাৎ বৌদ্ধরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত । বৌদ্ধদের জঙ্গি নেতা গালাগোদা আথে নানাসারা শ্রীলঙ্কার মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হুমকি দিয়েছে । সে বলেছে, যদি কোন মুসলমান কোন সিংহলিদের ওপর হাত তোলে, তাহলে সব মুসলমানকে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে । বৌদ্ধদের এই জঙ্গি নেতা জনসভায় তার অনুসারীদের আলুথগামা, বেরুয়ালা ও অন্যান্য এলাকায় মুসলিমদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছে । শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থিত আলুথগামা, বেরুয়ালা শহরে ১৭ ও ১৮ আগস্ট ২০১৪ রবিবার ও সোমবার রাতে তারা দাঙ্গায় নামে । এই দাঙ্গায় নেতৃত্য দেয় বৌদ্ধ বলা সেনাই (বিবিএস) এবং তাতে তিনজন মুসলিম নিহত ও পঞ্চাশের অধিক আহত হয় । বৌদ্ধ জঙ্গি নেতা গালাগোদা আথে নানাসারা নেতৃত্যে দাঙ্গায় মুসলমানরা ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন ।

শুধু শ্রীলঙ্কায় নয় সারা বিশ্বের বৌদ্ধরা জঙ্গিরা আজ মুসলমানদের উপর হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে । তার মধ্যে মায়ানমার, চিন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধ জঙ্গিরা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে মুসলিম নিধনে নেমে পড়েছে । মুসলিম মা বোনেদের ধর্ষন করা হয়েছে । এই শান্তির ধর্মের ধ্বজাধারী বৌদ্ধ জঙ্গিরা নারী, শিশু, বৃদ্ধদেরকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি । তারা মুসলমানদের

ঘরবাড়ি, মসজিদ, মাদ্রাসা সব পুড়িয়ে দিয়েছে । আর এইসব সন্ত্রাসবাদী কাজগুলো করছে লালসালু পরা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ।

মায়ানমারে বৌদ্ধরা সরাসরি মুসলমানদেরকে গুলি করে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে । এখানে আজ মুসলিমরা আজ নিশ্চিহ্ন হবার পথে । কয়েক লাখ মুসলিম নর-নারী আজ সেখানে বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে । তারা আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি করছেন । কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত তাদের নেই । মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করতে তৎপর এই বৌদ্ধ ধর্মের জঙ্গিরা । চিনের মুসলিমদের উপর প্রায় অত্যাচার করার খবর পায় । নির্মমভাবে সেখানে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয় । মুসলমানরা ঠিকমতো নামায পড়তে পারেন না ।

আসুন আমরা সকলে মিলে এই বৌদ্ধ জঙ্গি গালাগোদা আথে নানাসারা ও বিভিন্ন বৌদ্ধ জঙ্গিরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

মূল্য : ২০০/- (দুই শত টাকা)

মূল্য ২০০/- (দুই শত টাকা)

BUDDHISM EXPOSED!!!

Kyun Musalmano Ko Maara Ja Raha Hain Burma Mein?

Aisa Bhi Kya Ker Diya Burma Ke Musalmano Ne Ki Burma Ke Buddhist Sare Police Ke Saath Milker Musalmano Ko Qatl Kar Rahe Hain????

মূল্য : ২০০/- (দুই শত টাকা)

Sirf Ek Buddhist Ladki Ka Musalman Hona Itnaa Bhaari Pad Gaya Ki Ab Burma Ke Saare Musalmano Ka Qatl Kar Doge!!!???!!!!

Content Copied From Hasan Ashrafi Bhai

হিন্দু সন্ত্রাসবাদ

হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকালাপে লিপ্ত থাকলে সাধারণত খবরে প্রকাশ করা হয় না । যদিও চাপের মুখে পড়ে মিডিয়া তা প্রকাশ করে তাহলে ক্ষুদ্রায়তনে প্রকাশ করা হয় যাতে সহজে কেউ বুঝতে না পারে যে হিন্দুরাও সন্ত্রাসবাদী হতে পারেন । কেননা, আমাদের দেশের অধিকাংশ মিডিয়া হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত । এখানে কয়েকটি হিন্দু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা হল,

১) মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঃ- মালেগাঁও বিস্ফোরণে যুক্ত ছিলেন ১১ জন সনাতন সদস্য । ২০০৯ সালের দীপাবলীর সময় গোয়ার মালেগাঁও বিস্ফোরণকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পানাজীর সেশন জজ ইউ. ভি. বাকরের এজলাসে চার্জশিট পেশ করা হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (NIA) বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করার সময় দুজন সনাতন হিন্দু মারা যায় তাদেরকেও ঐ ১১ জনের মধ্যে রাখা হয়েছে । এই দুজন হিন্দু জঙ্গির নাম মালগান্ডা পাতিল ও যোগেশ নায়েক । হিন্দু জঙ্গি গোয়েল বিনয় তালেকর, বিনায়ক পাতিল, ধবঞ্জয় আস্টেকার এবং মহারাষ্ট্রের দিলীপ মনগাঁওকর এখনো বিচারের অধিনে । এই ঘটনার পর প্রশান্ত জুভেকর, সারভ আকোলকার, জয়প্রকাশ রুদ্র পাতিল ও প্রশান্ত আস্টেকার নিঁখোজ হয়ে যায় । এরপর ২৫০ জন সাক্ষীর নামসহ ৩০০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট তৈরী করা হয় । তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার । বিস্ফোরক দ্রব্য ও অবৈধ কার্যকলাপে তারা আইনে অভিযুক্ত । কয়েক বছর আগে ঘটা বিস্ফোরণের সঙ্গেও তারা যুক্ত । যারা এই মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা কেও মুসলমান নয় সকলেই হিন্দু সনাতন ধর্মী । তারা কেও আর. এস. এস., কেও সংঘ পরিবারের সদস্য । (তথ্যসূত্র ঃ নতুন গতি, ২৪ - ৩০মে, ২০১০ সংখ্যা)

২) আজমীর বিস্ফোরণ ঃ হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) দরগাহ শরীফে হিন্দুত্ববাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাই । আর এই বোমা বিস্ফোরণের আর. এস. এস. এর ইন্দ্রেশ কুমার সহ আরও বড় বড় হিন্দু নেতাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে । এমনকি রাজস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তি ধারীওয়াল বলেছেন, আজমির, হায়দ্রাবাদ, ও মালেগাঁও বিস্ফোরণে আর. এস. এস. এর কয়েকজন প্রচারক শামিল আছেন । তিনি এও বলেছেন, আর. এস. এস. এর কয়েকজন বড় পদাধিকারী এই বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড । আর যাঁরা হিটলিষ্টে আছেন তাঁরা হলেন, ইন্দ্রেশ কুমার, সুনীল যোশী, প্রজ্ঞা টাকুর । সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে এটিএসের থেকে আজমীর শরীফ বিস্ফোরণ মামলায় আজমীরের সিজেএম কোর্টে পেশকৃত চার্জশিট থেকে । চার্জশিটের বায়ান অনুসারে জানা যায়, ২০০৫ সালে ৩১ অক্টোবর জয়পুরে আর. এস. এস. এর এক গোপন বৈঠক বসেছিল । তাতে ইন্দ্রেশ কুমার সহ সাতজন শামিল ছিলেন । বৈঠকে আজমীর শরীফ দরগাহ, হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদ ও মালেগাঁও সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । ২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর আজমীর দরগায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় । এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া দেবেন্দ্র গুপ্ত, লোকেশ শর্মা, ও চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে এটেসের তদন্ত কর্মকর্তা এস. জি. সত্যেন্দ্র সিংহ রানাওয়াত চার্জশিট পেশ

করেন। এতে বলা হয়েছে, গুজরাটি সমাজের গেস্ট হাউসের ২৬ নং কক্ষটি মনোজ সিংহের মানে বুক ছিল। বৈঠকে ইন্দ্রেশ কুমার অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার কথা বলছিলেন, যাতে মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। চার্জশিটের ভিত্তিতে কার্জনির্বাহী সিজেএম জগেন্দ্র আগারওয়াল, অভিযুক্ত দেবেন্দ্র গুপ্তা, লোকেশ শর্মা ও চন্দ্রশেখর লেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেছেন। উল্লেখ্য যে, এসব কর্মকান্ড আর. এস. এস. পান্ডারা বিভিন্ন ইসলামী নামে চালিয়েছিল - বাস্তবে এসব নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আড়াল করতে ইসলাম ও মুসলমানদের কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্রে এরা শুরু থেকেই লিপ্ত।

৩) সমঝোতা বিস্ফোরণ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে সমঝোতা ট্রেনের বিস্ফোরণ ঘটাই হিন্দুত্ববাদীরা। এই সমঝোতা এক্সপ্রসে বিস্ফোরণে ৬৮ জন মারা যান এবং অনেক মানুষ আহত হন। এই বিস্ফোরণের ছক কষা হয় গুজরাটের ডাং-এ এবং পশ্চিম বঙ্গের চিত্তরঞ্জনে। এই বিস্ফোরণের মূল পান্ডা বামালী হিন্দু মনুবাদবী জঙ্গি ব্রতীন চ্যাটার্জি ওরফে স্বামী অসীমানন্দ। প্রজ্ঞা ঠাকুরকে গ্রেফতারের পরেই অসীমানন্দের নাম জানা যায়। তার বিরুদ্ধে ৮০ পাতার চার্জশিটে এন. আই. এ. জানিয়েছে যে, বারাণসী সংকোচমোচন মন্দিরে বিস্ফোরণের ১০ দিনের মধ্যেই (মার্চ ২০০৬) সমর্থকদের নিয়ে নিশ্চিত করেন তিনি। এই সংস্থার অনুমান ২০০৬ এর ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী ডাং-এ শবরী কুম্ভমেলা চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বামী অসীমানন্দ আর. এস. এস. এর সংগঠন বনবাসী কল্যান আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ডিসেম্বরে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করান।

'নতুন গতি' পত্রিকার ১৭ - ২৩ জানুয়ারী, ২০১১ সংখ্যায় নিউজব্যুরোতে বেরিয়েছে, "দিল্লী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক জেরায় হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি স্বামী অসীমানন্দ স্বীকার করেছেন যে মালেগাঁও, আজমীর, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন হামলায় তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা জড়িত। জবানবন্দী ৪২ পাতার। মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত জেনেও তিনি ওই সকল বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে মুসলিমদের আত্মরক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। মিডিয়ার খবর, মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে 'জড়িত' এই সন্দেহে কলীম নামে সেলফোন বিক্রয়কারী এক যুবককে গ্রেফতার করে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় এবং দেড় বছর জেল খাটতে হয় তাকে। পরে, অন্য এক 'অপরাধে' আবার জেল হয়। তখন গারদখানায় অসীমানন্দের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বিনাদোষে গণতন্ত্রের নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেও কলীমের মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়েই নাকি 'স্বামী' অপরাধের দায় কবুল করেছেন। খুনীর দয়ালু হওয়ার চেষ্টা!"

মালেগাঁও বিস্ফোরণে কালা আইন মোকায় (MCOCA) কোনো প্রমাণ ছাড়াই সিমির ৮ সদস্য-সহ ৯ জনের কারাদণ্ড হয়। এখন, অসীমানন্দের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ হচ্ছে তা মিথ্যা। মালেগাঁও বিস্ফোরণের মূল পান্ডা হচ্ছে সুনীল যোশী। হায়দ্রাবাদের নিজাম যেহেতু

পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তার প্রতিশোধ নিতেই মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ বলে স্বামী জানিয়েছেন।

সুনীল যোশির হত্যা

২৯ ডিসেম্বর ২০০৭-এ মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসের বাড়ির চত্বরে আকস্মিকভাবেই খুন হতে হয় সুনীল যোশিকে। যোশির পরিবারের সদস্যরা এবং সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর দাবী করে যে, নিজের লোকের হাতেই খুন হয়েছেন সুনীল যোশী। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ প্রথমে মামলাটি সমাধান না করেই গুটিয়ে নেয়। ওই একই পুলিশ পরে স্বীকার করে যে আর. এস. এস. এর সদস্য বন্ধুরাই সুনীলকে হত্যা করেছে। তার দায়ে মৈয়াংক, হর্ষদ সোলাংকি, মেহুল, মোহন (সবাই গুজরাটের), আনন্দরাজ কাটরে (ইন্দোর), বাসুদেব পারমার (দেওয়াস, মধ্যপ্রদেশ) কে অভিযুক্ত করে। সোলাংকি তার অপরাধ স্বীকারও করেছে। অপরাধ চাপা দিতেই নাকি এই বিশ্বস্থ সংঘ কর্মীকে হত্যা করেছে?

মন্দিরেও বিস্ফোরণের চেষ্টা

স্থানীয় মুসলিমদেকে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে এবং হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গা ঘটাতে মো (Mhow) জেলার বিভিন্ন মন্দিরেও বোমা বিস্ফোরণে চেষ্টা করে সুনীল যোশি। আর. এস. এস. মহলে গুরুজী বলে পরিচিত আর এক সদস্য সন্দীপ ডাঙ্গেকে নিয়ে মো-র কড়ে হনুমান মন্দির ও স্বর্গমন্দিরে বোমা ফাটায়। রাজেশ মিশ্র বলে এক আর. এস. এস. কর্মীর জবানবন্দীতে তা স্পষ্ট। ২০০৩ এর আগস্টে উপজাতীয় কংগ্রেস নেতা পিয়ারে সিং নিনামা ও তার পুত্র দীনেশকে হত্যা করে যোশি ও ডাঙ্গে। পুলিশ বরাবরই যোশিকে আড়াল করেছে এবং ছার দিয়েছে। তখনই যোশিকে আটকানোর চেষ্টা হলে এই বিস্ফোরণ ঘটত না।

ইজতেমায় বোমা

২০০২-এর ডিসেম্বরে ভূপালে অনুষ্ঠিত তবলিগি ইজতেমা থেকে ১৫টি পাইপ বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। মিশ্রই ওই পাইপ বোমা সরবরাহ করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নির্দোষ মুসলিমদের মুক্তির দাবী

অসীমানন্দের স্বীকারোক্তির পর গ্রেফতার হওয়া নির্দোষ মুসলিমদের মুক্তির দাবী উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে কে? কে ক্ষমা চাইবে তাদের কাছে? এতগুলো জীবন, পরিবার নষ্ট করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ‘সরকারী কর্মীদেরকে’ কি সাজা দিতে পারবে ভারতীয় গণতন্ত্র? সর্ষের মধ্যে ভূত তাড়াতে পারবে কি? কে দেবে কৈফিয়ত?

তার থেকেও বড় প্রশ্ন হল, ভারত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস ও ফ্যাসিবাদকে দমন করতে পারবে কিনা। ভারতের সমৃদ্ধ, শান্তির জন্য তা করাটা খুবই জরুরি। আর. এস. এস. ও

সমধর্মী হিন্দুত্ববাদী ও মনুবাদী সংগঠনগুলোকে এখনো নিষিদ্ধ করতে পারেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিতাম্বরম ।

৪) মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ঃ ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা । এই বিস্ফোরণে দুজনের নামে সি. বি. আই চার্জশিট দিয়েছে । দেবেন্দ্র গুপ্তা ও লোকেশ শর্মার বিরুদ্ধে ৮০ পাতার চার্জশিট বন্ধ খামে অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর ১৪ নং আদালতে জমা দেওয়া হয় । রাজস্থানের এটিএসের চার্জশিটেও ওই দুজনের নাম আছে । স্বামী অসীমানন্দ, সুনীল যোশি, সন্দীপ ডাঙ্গে ওরফে পরমানন্দ, রামচন্দর ওরফে রামজী, বিষ্ণু পাটেল প্রভৃতি আর. এস. এস হিন্দু জঙ্গিরা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । এই বিস্ফোরণের আসামী স্বামী অসীমানন্দ অনেকবার নাম বদল করেছেন । বেনামে তার পাশপোর্টও রয়েছে । রেশন কার্ডও রয়েছে । এই স্বামী অসীমানন্দকে ধরতে গোয়েন্দাদের কালঘাম ছুটে গেছে । হুগলীর কামারপুকুরে ছোটবেলায় কাটান । এক সময় শিক্ষকতাও করেছেন এবং পরে সন্যাসী হয়ে যান । দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাক্ষাতকারে তিনি বলেন যে, ভারতের সামনে দুটি বিপদ, এক নম্বর ইসলামী জেহাদ ও দুই নম্বর ধর্মান্তকরণ । এই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা স্বামী অসীমানন্দ আজমীর, মালেগাঁও প্রভৃতি বিস্ফোরণের জড়িত ছিলেন ।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণেও হিন্দুত্ববাদীদের হাত রয়েছে । যেমন বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ, শীতলাঘাট বিস্ফোরণ, মুম্বাই বিস্ফোরণ প্রভৃতিতেও হিন্দুত্ববাদীরা সমানভাবের নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করেছে । কিন্তু সত্য কোনদিন ধামাচাপা থাকে না । একদিন না একদিন তা প্রকাশ হবেই হবে । আর আমরা জানি এইসব প্রমাণ হয়ে গেছে যে উক্ত বিস্ফোরণগুলি হিন্দুত্ববাদীরাই করেছে ।

(SYNOPSIS AND LIST OF DATES
08.09.2006 At about 1350 hrs., four bombs exploded in Malegaon, three bombs in the compound of Hamidiya Masjid and BadaKabarastan and fourth one at MushawaratChowk, killing 31 persons and injuring 312 others. It being a Friday (Jumma) and 'Shab-e- Barat', a day of religious importance, many Muslim devotees had converged to offer Namaz.

Sep/Oct 2006 Initially the local district police had been investigating the case on the correct lines and had found some important clues, but the I.B. suddenly stepped in, in the garb of the then ATS Chief K.P. Raghuvanshi and by totally changing the direction of investigation started picking up innocent Muslim boys on flimsy ground and started fabricating evidence against them.

Dec. 2006 The ATS worked on the theory that some SIMI activists, with the help of two Pakistanis, caused the blast, arrested nine persons and sent

chargesheet against them. One of the accused charged of actually planting one of the bombs was reportedly leading a Friday prayer in a place 700 kms. from Malegaon at the time of the blast and one other had been in the custody of the Mumbai police since four months prior to the blast. The main evidence adduced was in the form of confessional statements of accused while being in police custody, statement of one accused turned approver statements of witnesses under section 165 Cr.P.C., some tickets etc. which could easily be manipulated. Dec. 2006 Following the public out cry the Government ofIndia ordered the transfer of investigation to the CBI on the recommendation of Government of Maharashtra. However surprisingly before the papers and investigation were actually handed over to C.B.I. the ATS hurriedly filed the charge sheet. This was intentional to prejudice the further investigation by C.B.I. Feb. 2010 CBI further investigated the case, but for some unknown reasons stuck to the theory of ATS and filed a supplementary chargesheet on the lines of the ATS chargesheet.

19.02.2007 Bomb blasts took place on 'Samjhauta' Express killing 68 persons and injuring many. The Indian Government, at the instance of the I.B. hinted at the involvement of Pakistani backed terrorist out fits across the order for the blast. March, 2007 The Haryana Police on the basis of a vital clue visited Indore (M.P.) and had almost detected the case, but they had to beat a retreat as the M.P. Police, for some mysterious reasons refused to cooperate with them. Nov. 2008 The involvement of Lt.Col. Prasad Purohit in the Samjhauta Express blast was disclosed during his narco analysis test conducted by Maharashtra ATS Chief Hemant Karkare in connection with the Malegaon blast case 2008, but the I.B. allegedly pressurized Hemant Karkare through the Central Government not to pursue this line saying "This would impair the Centre's credibility internationally, as when the train blast took place, the Centre had blamed Pakistan ISI for the terror strike on the basis of I.B.'s (baseless) insinuations. 18.05.2007 In Mecca Masjid of Hyderabad a bomb blast took place, in which nine persons were killed and many injured. It was found that two bombs with similar timer devices had been planted; one of which exploded and the other remained unexploded. 21.05.2007 The Times of India, Pune, in its issue dated May 21, 2007 reported that one of the SIM Cards used in the Mecca Masjid blast was traced to one Babulal Yadav of Asansol, West Bengal and was obtained on the basis of a forged driving license. The person by that name however was not traced.

Jan. 2008 Maj (Retd.) Ramesh Updhyaya of "Abhinav Bharat" in a meeting held at Faridabad admitted that Mecca Masjid blast is the handi work of "their men" and Lt. Col. Purohit informed that he had been doing the 'operation' to satisfy Israel's precondition of showing something on the ground before

rendering help for the cause of "Hindu Rashtra". Nov. 2008 During his narco analysis test in the investigation of Malegaon 2008 blast case Lt. Col. Prasad Purohit reportedly admitted his role in Mecca Masjid blast.

11.10.2007 In the Dargah of KhwajaMainuddinChisti of Ajmer Sharif a bomb was exploded at about 6.15 p.m. when a large number of people had gathered for the "Iftar" (breaking of Ramzan fast) in which three persons were killed and 15 injured. In this case also, the perpetrators had planted two bombs one of which exploded and the other remained unexploded. 15.10.2007 'The Times of India', Pune, in its issue dated October 15, 2007 reported that one of the SIM cards used in the blast had been obtained by using the identity of a well known Ayurvedic Practitioner of Gauhati (Assam). Nov. 2008 Lt. Col. Prasad Purohit of "Abhinav Bharat" in his narco analysis test admitted his role in the Ajmer Sharif blast also.

2007 to 2010 Though absolutely specific and positive clues had been available to the local police within a few days of the incidents in respect of Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blasts, they were not followed or not allowed to be followed meticulously and were not taken to their logical end. On the other hand the local police started following altogether different lines of investigation such as involvement of Pakistan's ISI in Samjhauta Express blast case or involvement of Bangladesh based HUJI or Jaish-e-Mohammad and their operative 'Bilal' in Mecca Masjid blast case or LeT supported by HUJI and Jaish in Ajmer Sharif blast case with 'Bilal' and one of the victim of the blast SayyedSaleem as main suspects. In Mecca masjid blast case, the police arrested scores of Muslim boys in frivolous and fake cases and tried to extract confession. But they could not succeed and all the boys were acquitted by the trial courts. Apparently the local police had been acting on the tip-offs given by the I.B., which later proved to be absolutely false and given with ulterior motive. Oct. 2010 Later the investigation of Ajmer Sharif case was taken over first by the ATS, Rajasthan and then by the NIA. The ATS filed its supplementary charge sheet in October, 2010 which was broadly endorsed by the NIA later. The NIA also took over the investigation of Samjhuata Express and Mecca Masjid cases did further investigation and filed chargesheet in 2011. In its investigation, the NIA followed the same clues which had been available to the local police in 2007 itself. The NIA investigated the cases impartially and with open mind and filed the chargesheets against totally different persons i.e. those belonging to right wing radical Hindu groups as against the theory of Muslim originations and persons being touted all along. The Samjhuata Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blasts were tran spired to be the handiwork of the prominent RSS leaders. The plan was originally mooted by Swami Aseemanand and one Sunil Joshi, the head of "Jai Vande Mataram" who

was formerly the district RSS Prachar Pramukh of Mahu (M.P.). The plan was executed by Sunil Joshi, with the help of SandeepDange, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Ramji Kalsangra, Pragya Singh Thakur of “Jai VandeMataram” and of Lt. Col. Purihit, DayanandPandey and Sameer Kulkarni of “Abhinav Bharat”. All of them were associated with RSS.

Dec. 2010 & Jan. 2011 Swami Aseemanand gave his confessional statement before the Judicial Magistrates in connection with both the Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases. He broadly corroborated the facts revealed in the NIA’s investigation. Moreover, he confessed that the Malegaon 2006 blast was also caused by the same group and categorically stated that the Muslim boys arrested in Malegaon blast case 2006 and Mecca Masjid blast case 2007 were innocent. March, 2011 Consequent to the confessional statement of Swami Aseemanand, the Malegaon blast case of 2006 was handed over to the NIA for further investigation. It reviewed the evidence collected by previous investigation agencies viz ATS and CBI and also collected fresh evidence. Its investigation brought out several new facts in the form of statements and forensic reports. Nov. 2011 When the nine accused in the Malegoan case of 2006 made applications for their release on bail, the NIA decided not to oppose it in view of the new revelations and hence the Special MCOCA court released the accused on bail. 2006 It was not only in the investigation of above mentioned four cases that the I.B. gave wrong inputs to the local police and took the investigation on wrong tracks; it has done it in almost all the blast cases. It is because of this that highly sensitive matters such as the contents of the two laptops recovered by HemantKarkare in the Malegaon blast case 2008, which contained the road map to “Hindu Rashtra”, mysterious disappearance of U.S. national Ken Haywood, to whom was traced the e-mail of Ahmedabad blast, the SIM card found with one of the terrorists killed in Batla House (Delhi) encounter having connection with Aurangabad District of Maharashtra, the SIM cards and mobile phones recovered in some other cases, the cordial relations between the then ATS Chief Maharashtra, K.P. Raghuvanshi and the main conspirator and main supplier of RDX Lt. Col. Prasad Purohit etc. have not been thoroughly inquired into but have been deliberately suppressed for the fear that the whole conspiracy of the right wing radical Hindu groups would be exposed. 2006-2008 Like in Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases, many important leads disclosed during the early in vestigation in some other cases, viz. Mumbai train blast case 2006, Ahmedabad and Surat bomb case of 2008, Jaipur blast case of 2008 etc have been left unpursued. 2006 to 2008 Such loop holes, were allowed to be kept in the investigation as the local police or the state investigation agencies did not have a free hand in investigation. From day one the I.B. would guide the course of investigation by declaring the involvement of some Muslim outfits and/or

persons. It would then give wrong inputs to the state investigation agencies or special teams and force them to manipulate evidence to fit in its theory. The investigation agencies would then illegally detain innocent Muslim boys or arrest them in frivolous and false cases, subject them to inhuman methods of torture, even resort to "encounter" and manipulate evidence such as confession, statements u/s. 165 Cr. P.C., seizure of RDX, arms and ammunition, recovery of Jihadi literature, recovery of lap-tops containing incriminating articles record connecting the person to some terror outfit and so on and would file a chargesheet on the basis of such fabricated evidence.

16.10.2009 After the arrest of 11 operatives of "Abhinav Bharat" in October November, 2008 in the Malegaon blast case 2008, the bomb blasts almost stopped for a year, convincing the people that the earlier blasts were also the handiwork of right wing Hindu radical groups To prove this public perception wrong a radical Hindu terror group "SanatanSansthan" attempted to cause a bomb blast on the eve of Diwali festival on 16th October, 2009 at a place in Margaon (Gao) where a large number of Hindus were to gather. But the bomb went off while being planted killing two terrorist of "SanatanSanthan" and their plan failed.

13.10.2010 This failed attempt was a heavy jolt to the right wing radical groups and their sympathizers but they were not to give up. Within four months there was bomb blast in German Bakery (Pune) on 13.02.2010 killing 17 persons and injuring 56. As the bomb did not explode while being planted, as in the case of Goa blast, the Muslim blame game started. The I.B. and its puppet ATS Maharashtra started a trial and error method of investigation and zeroed in on one HimayatBaig. He was arrested and a chargesheet was filed against him and some other Muslim boys. The chargesheet says that "the bomb was triggered with the help of a mobile alarm triggering device." But there is no mention of the number of the mobile phone, the number of the SIM card, the forensic experts report or for that matter nothing to establish the connection between the blast and the accused.

13.07.2011 There was a blast at Zaveri Bazaar (a diamond market) and some other places in Mumbai. As usual the ATS Maharashtra started the investigation with a prejudiced mind-set and started picking up Muslim boys and grilling them. But this time, NIA was also called for assistance. The NIA started the investigation with open mind. But it did not get any coo-operation from the ATS which refused to disclose anything to NIA and started arbitrarily dismissing the facts revealed by the NIA. Ultimately NIA had to withdraw itself and call all its officers to Delhi. In the whole episode the I.B's role has been very dubious. There is a strong suspicion of its having a nexus with the right

wing terrorist groups and pro-“Hindu Rashtra” forces. But over the years it has become such a formidable force that nobody dare touch it with the result not a single I.B. officer has been punished or removed inspite of having a overwhelming evidence against many of them. Even its stooges in the state police are also found to enjoy impunity. Barring some self detected cases like Nanded case of 2006, or Margaon (Goa) case of 2008 or those investigated by the then Maharashtra ATS Chief, Late Hemant Karkare, almost all the blast cases and other terror related cases have been investigated with a biased and prejudiced mind set. There have been umpteen number of cases of utter discrimination where the members of the minority community have been unfairly targeted by law enforcement agencies and those of right wing radical Hindu groups have been treated with kid gloves. It is, therefore, necessary to review all the blast cases and other terror related cases taken place since 2002.

23.01.2012 Hence the present writ petition.)

৫) <u>নানদেড় বোমা বিস্ফোরণ</u> ঃ ৫ এপ্রিল ২০০৬ সালে নানদেড় নামক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ হয় । এই বিস্ফোরণে এমনই প্রতিক্রিয়া হয় যে ফলে হিন্দুত্ববাদীদের রহস্য ফাঁস হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মন্যবাদী সংগঠনে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা হাতে নাতে ধরা পড়েন । এই নানদেড়ে বিস্ফোরণ ২০০৬ সালের ৫ এপ্রিল মধ্য রাতে P.W.D.K এর একজন রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লক্ষমণ গুন্ডয়া রাজকোডয়ার এর ঘরে মারাত্মক বিস্ফোরণ হয় যাতে দুইজন ব্যাক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যায় । এবং তাদের চারজন সঙ্গী আহত হয় । মৃতদের মধ্যে লক্ষমণ গুন্ডয়া রাজকোঁডয়ার এর পুত্র নরেশ রাজকোঁডয়ার এবং দ্বিতীয়জন বজরঙ্গ দলের কর্মচারী হিমাংসু পানসে ছিল । অন্যদিকে মারুতি কেশব বাঘ, যোগেশ দেশপান্ডে (ওরফে বিদুল্কর), গুরুরাজ টুপটীবার এবং রাহুল পান্ডে নামক চারজন ব্যাক্তি আহত হয় । পুলিশের বরিষ্ঠ অধিকারী ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে আসেন এবং এরপর যখন এফ. আই. আর লেখা হয় তখন লোকাল থানায় অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর (এ পি আই) পদের জুনিয়ার অধীকারীর দ্বারা আহত ব্যাক্তিদের বায়ানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয় । এফ. আই. আর এ বলা হয়েছে, নরেশ রাজকোঁডয়ার যে এই বিস্ফোরণে মারা যায় সে নিজের ঘরে অবৈধভাবে পটকাবাজীর ব্যাবসা করত । বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে মৃত ব্যাক্তি নরেশ রাজকোঁডয়ার এবং মারুতি কেশববাঘ পটকাবাজীর একদম নিকটে ধুমপান করছিল । এই বায়ান অনুযায়ী এটাই মনে হয় যে এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছিল । কিন্তু এই গল্পটাকে যারা সত্য বানাতে চেয়েছিল তারা একটা মুর্খতা করে বসেছিল যে পটকাবাজীর একটি বড় গুদামঘর যার মূল্য ১২০,০০০ টাকা ছিল, ঘটনাস্থলে রাখাছিল বলে দেখানো হয়েছে । কিন্তু গল্প যারা বানিয়েছিল তাদের মাথায় এতটুকু আসেনি যে যখন প্রশ্ন করা হবে যে পটকাবাজীর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হওয়া সত্যেও দুইজন ব্যাক্তি মারা গেল আর চারজন ব্যাক্তি ঘায়েল হয়ে গেল এবং ঘটনাস্থলে পটকাবাজীর এত বড় গুদামঘর কিভাবে সুরক্ষিত থেকে গেল এবং তাতে এত বড় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হওয়া সত্যেও কিভাবে তার উপর কোন প্রভাব পড়ল না তাহলে এর উত্তর কি হবে ?

পরে তদন্ত করার সময় বিভিন্ন বিষয় সামনে আসে যেমন,

১) নানদেড় বোমা বিস্ফোরণের ধরা অপরাধী পাশের জেলায় আগে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতে সে দায়ী ছিল । সেই বিস্ফোরণ ছিল, মুহাম্মাদীয়া মসজিদ, পরভনী (নভেম্বর ২০০৩), কাদেরিয়া মসজিদ, জালনা (আগস্ট ২০০৪) এবং মেরাজুল উলুম মাদ্রাসা/ মসজিদে পুরণা, জেলা পরভনী (আগস্ট ২০০৪)

২) যে বোমা ৫-৬ এপ্রিল ২০০৬ সালে নানদেড়ে আর. এস. এস এর স্বয়ংসেবক নরেশ রাজকোঁডাবার এর ঘরে বিস্ফোরণ হয় যাতে সে নিজে শিকার হয় বাস্তবে সে ঐরাঙ্গাবাদের একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করতে চেয়েছিল । হিমাংসু পানসে এবং মারুতি বাঘ ২০০৪ সালে ঐরাঙ্গাবাদের ঐ মসজিদ এবং তার আসেপাশের এলাকা নিরীক্ষণ করেছিল ।

৩) অপরাধীদের ঘর এবং তাদের অন্যান্য ঠিকানায় পুলিশের খানাতল্লাসীর সময় যা প্রমান পাওয়া যায় তাতে একথা স্পষ্ট হয় যে হিমাংসু পানসে, নরেশ রাজকোঁডাবার, মারুতি বাঘ, যোগেশ বিদুল্কর (দেশপান্ডে), গুরুরাজ টুস্টেবার, রাহুল পান্ডে, সঞ্জয় চৌধুরী, রামদাশ মুলাঙ্গে এবং লক্ষ্মী রাজকোঁডাবার আর. এস. এস এর বি. এইচ. পি এবং বজরঙ্গ বলের কট্টরপন্থী কর্মচারী এবং স্বয়ংসেবক ছিল ।

৪) হিমাংসু পানসের ঘরে যখন তল্লাসী করা হয় তখন তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন রুপ ধারণ করার পোষাক পাওয়া যায়, যেমন - নকল দাড়ি, গোঁফ, মুসলমানদের বিশেষ বেশভূষন ইত্যাদী । এই সব জিনিস ঘটনাস্থলে রুপ পরিবর্তন এবং মুসলমানদের মতো রুপ ধারণ করার জন্য ব্যাবহার করা হতো । (আর যাতে মানুষ বুঝতে পারে তার দ্বারা অপরাধ মুসলমানরাই করেছে ।)

৫) নানদেড় ঘটনার অপরাধী সঞ্জয় পুলিশকে এও বলে যে ২০০৬ সালের মার্চ মাসের সংকট মোচন মন্দিরে, বারানসীতে বোমা বিস্ফোরণের পরে ঐরাঙ্গাবাদ মসজিদে বিস্ফোরণের তারা চক্রান্ত করছিল ।

৬) সঞ্জয়কে গ্রেফতারের পর নানদেড়ের বজরঙ্গ দলের নেতা বালাজী পাখাড়ের ফোন এসেছিল যাতে পাখাড়ে সঞ্জয়কে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছিল এবং বলেছিল খুব তাড়াতাড়ি তাকে জমিনে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে । (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 173, 174, 178, 180)

এছাড়াও হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যেমন- ১৮ মে ২০০১ সালে ঐরঙ্গবাদের নাগেশ্বরবাড়ি গনেশ মন্দিরের পাশে পাইব বোমা বিস্ফোরণ করে । (লোকমত, ঐরঙ্গাবাদ, ২৪ মে ২০০৬) ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে পরভনী নামক স্থানে

মুহাম্মাদীয়া মসজিদে সেই সময় বোমা ফেলে যখন নামাযীরা জুমার নামায পড়ে বাইরে আসছিল তিনজন হামলাকারী মোটর সাইকেলের উপর চেপে এসেছিল এবং বোমা ফেলে পালিয়েছিল । (পি টি আই, ২১ নভেম্বর ২০০৩) ২৭ আগষ্ট ২০০৪ সালে পরভনী জেলার পুরনায় মেরাজুল উলুম মসজিদে বোমা হামলা করে । (তেহেলকা, ২০ নভেম্বর ২০০৯)

৪ জুন ২০০৮ সালে থানের 'গডকারী রঙ্গয়াতন থিয়েটারে' বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যেখানে মারাঠী নাটক 'অমহী - অচপুতে' দেখানোর কথা ছিল । সেখানে ৭ জন ব্যাক্তি ঘায়েল হয় । পরে পুলিশ বুঝতে পারে এই চক্রান্ত ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠন 'গুরু কৃপা প্রতিষ্ঠান' 'সনাতন সংস্থা' এবং 'হিন্দু জন জাগৃতি সমিতি' এই বিস্ফোরণ ঘটায় । এবং তারাই 'সিনেরাজ হলে' এবং 'ওয়াশী অডিটরিয়াম' এর মধ্যে বোমা রেখেছিল । (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাইয়ের জুলাই - আগষ্ট সংখ্যার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের তদন্তে বোঝা যায় মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার এই উগ্রবাদী সংগঠনের সম্পর্ক অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আছে ।) এ. টি. এস এই সংস্থায় ছয়জন সদস্যকে গ্রেফতার করে গুরুত্বপূর্ন জানকারী হাসিল করেন যার উপর ভিত্তি করে সিতারা নামক স্থানের মঙ্গেশ নিগম নামক একজন যুবককে গ্রেফতার করে তার ঘর থেকে এবং বাল গঙ্গা নদীর ধার থেকে অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে । ২০০৮ সালে উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কির পুলিশ আর. এস. এস এরেকজন স্বয়ংসেবক সুরজ নারায়ন ট্যান্ডন নামক একজনকে গ্রেফতার করে যে শহরের ঠাকুরদ্বারা মন্দির ধ্বংস করে হিংসা ছড়াবার চক্রান্ত করছিল । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১৬ - ২১ জুলাই ২০০৮ । ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে এবং গুজরাটের মোডাসা নামক স্থানে বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে একটি চরমপন্থী সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ থেকে বোমা বিস্ফোরণ করানো হয়েছিল যেখানে ছয়জন এবং সমস্ত মুসলমান মারা গিয়েছিল । এই মঞ্চের মূল অফিস ইন্দোরে । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনে, ২৩ অক্টোবর ২০০৮)

এই ঘটনার তদন্ত করার পর বোঝা যায় এই বিস্ফোরণে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অভিনব ভারত, কিছু সেনা অফিসার এবং কিছু তথাকথিত সাধু সন্তেরও হাত ছিল । এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য ব্যাবহারের জন্য আনা বিস্ফোটকট এবং তার ব্যাবহারের নিয়মাবলী থেকে বোঝা যায় সমঝোতা এক্সপ্রেস এবং আজমীরের দরগাহ ছাড়া অন্যান্য বিস্ফোরণের চক্রান্তও এই সংগঠনের ছিল ।

এই ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সামনে আসে । যেমন এই রহস্য উন্মোচন হয় যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অভিনব ভারতের সদস্যরা ২০০২ সালে সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল । ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশের পুলিশ ভুপালের রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে দেশি বোমা উদ্ধার করে । ঠিক তার এক বছর পর অনুরুপ একটি বোমা ভুপালের নিকটপর্তী লাম্বাখেড়া নামক স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় । দুটি বোমায় তবলীগি জামাআতের বার্ষিক সম্মেলনে (ইজতেমা) শরীক হওয়া লোকেদেরকে নিশানা বানানোর জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছিল । এই সম্মেলনে ৫ লাখ লোক অংশগ্রহন করে । পুলিশ দ্রুত তদন্ত

করে বুঝতে পারে এই চক্রান্ত হিন্দুত্ববাদী কর্মচারী রামনারায়ন কালসাঙ্গরাম এবং সুশীল যোশীর হাত ছিল । মহারাষ্ট্রের এ. টি. এসের জানকারী অনুযায়ী দুই চরমপন্থী অভিনব ভারত সংগঠনের গুরুত্বপূর্ন হাত রয়েছে । এই দুজনের বজরঙ্গ দল এবং অন্য এই সম্পর্কীয় সদস্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । (দি হিন্দু, দিল্লী, ২০ নভম্বর ২০০৬)

কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ জানে না তাদের উপর আর কি রকম তদন্ত করা হয়েছিল বা কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ? সম্ভবতঃ তাদেরকে কোনরকম জেরা না করেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল তা নাহলে তারা পরে মালেগাঁও, মোডাসা, আজমীর, সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদ এবং অন্যান্য স্থানে বোমা বিস্ফোরণ করতে পারত না ।

আসামের ‘উলফা’ সংগঠনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখেবা অভিযোগ করেন যে “বোডো ক্ষেত্রিয় প্রশাসনিক জেলা” (বি. টি. এ. ডি) এর অক্টোবর মাসে যে ৩০ টি বোমা বিস্ফোরণ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আর. এস. এস এর হাত রয়েছে । এই ঘটনায় ১৪০টি (বোমা বিস্ফোরণের ৮৫ জন এবং হিংসাত্মক ঘটনায় ৫৫ জন) ব্যাক্তি মারা যায় । তিনি দাবী করেন যে উলফার কাছে এই কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে । উলফা তাদের মুখপাত্র ‘ফ্রীডম’ এর মধ্যে কয়েক মাস আগে এই কথা বলেছিল যে আর. এস. এস দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ করার জন্য নিজেদের কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেয় কিন্তু সরকার তাবের উপর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । (ডি. এন. এ, অন লাইন, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

কর্নাটকের হিন্দু চরমপন্থী সংগঠনের নাগরাজ জামবানী নামক একজন ডাকাত একথা স্বীকার করে যে ২০০৮ সালের মে মাসের ১০ তারিখে হুবলী জেলা আদালতে বোমা বিস্ফোরণ সেই করেছিল । রাজ্যে গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র অনুযায়ী জামবাগ এবং তার দুইজন সঙ্গী দুর্গে রমেশ পাওয়ার এবং লিঙ্গরাজ লালগর উক্ত চরমপন্থী সংগঠনের সদস্য ।

এই বিস্ফোরণ সেই সময় করা হয় যখন কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের প্রথমবার ভোট হচ্ছিল । বিস্ফোরণ সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হয় যেখানে সফদর নাগোরীসহ সিমির অন্য সদস্যের বিচার দুইদিন পর হবার কথা ছিল । যদিও এই ব্যাপরে তদন্ত জারী ছিল কিন্তু জনগণের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছিল যেন এই বিস্ফোরণে সিমির হাত ছিল । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনা, ১৩ জানুয়ারী ২০০৯)

৪ এপ্রিল ২০০৯ সালে মহারাষ্ট্রের বীড জেলার একটি ছোট গ্রাম ঘাটসাবালীতে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয় । সেই গ্রামের জনসংখ্যা খুব জোর এক হাজার হবে এবং তাতে ৭০, ৮০ জন মুসলমান ছিল । বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত করে এবং তিনজন ব্যাক্তি অশোক লান্ডে, মেয়র লান্ডে এবং তুলসীরাম লান্ডেকে গ্রেফতার করে । জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে তারা চায়ত না গ্রামে মসজিদ নির্মান হোক সেজন্য তারা গ্রামে বিস্ফোরণ ঘটায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক শোধন, ২৯ মে, ৪ জুন ২০০৯) এই বিস্ফোরণে যদিও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিন্তু এর প্রভাব ছিল ব্যাপক ।

(তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 56-58)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কিরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপে লিপ্ত এবং কি পরিমান তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে অথচ মিডিয়াতে তাদের ব্যাপারে কোন শোরগোল নেই । আর মাদ্রাসার কোন উস্তাদ (শিক্ষক) বা কোন মাদ্রাসার তালিবে ইলম (ছাত্র) আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে নি এবং কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়নি তবুও মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে । এই হল আমাদের দেশের অবস্থা ।

আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের 'জঙ্গি' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের যেসব স্থানে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার স্থান নিচে দেওয়া হল,

১) মার্চ ২০০০ : বজরঙ্গ দল নিজেদের সক্রিয় কর্মচারীদের জন্য একটি সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির মহারাষ্ট্রের পুনায় আয়োজন করে । যেখানে জিলোটিন থেকে কিভাবে বোমা বানানো যেতে পারে এবং তার কিভাবে বিস্ফোরণ করা যায় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । নানদেড়ের বিস্ফোরণের মাস্টার মাইন্ড হিমাংসু পানসে তাদের 'গ্রুপ লিডার' (Group Leader) ছিল এবং সে পরবর্তীকালে বোমা বানাতে গিয়ে মারা যায় । সেই ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল বজরঙ্গ দলের অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা বিভাগ (All India Physical Education Wing) এর প্রধান মিলিন্দ পান্ডে । এর রহস্যের উদ্‌ঘাটন নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় হয় ।

২) ২০০১ : আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের কর্মচারীরা নাগপুরের ভোঁসালা মিলিটারী স্কুলে একটি ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে যেখানে ৫৪ জন কর্মকর্তাসহ ১১৫ জন শরীক হয় । তাদেরকে হাতিয়ার চালানো, বোমা বানানো এবং কিভাবে বোমা বিস্ফোরণ করা হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তারা কেও প্রাক্তন অথবা বর্তমান কর্মরত সিনিয়ার অধিকারী এবং আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এর রিটায়ার্ড সিনিয়ার অফিসারও ছিল । এই রহস্য নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় তদন্ত করার সময় উদ্‌ঘাটন হয় ।

৩) পুনার সিংহগড় কেল্লার পাশে অবস্থিত আকাঙ্খা রিজোর্টে একটি ক্যাম্প গঠন করা হয় যেখানে বোমা বানানো এবং কিভাবে তা বিস্ফোরণ করা হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এতে কমপক্ষে ৫০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে । 'মিথুন চক্রবর্তী' নামে একজন ব্যাক্তি এই ক্যাম্পের প্রধান ব্যাক্তি ছিল যে শুধুমাত্র সেই যুবকদেরকে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যাবহারের

প্রশিক্ষণই দেয়নি বরং অন্তিম দিনে সবাইকে অধিক পরিমানে বিস্ফোটক পদার্থ দিয়ে বিদায় করে । যারা এই ক্যাম্পের মধ্যে ট্রেনিং দেয় তাদের মধ্যে আর্মির সেবক ও রিটায়ার্ড অফিসার, পুনার অস্ত্র বিশেষজ্ঞ রাকেশ ধাওয়াড়ে, ক্যামিষ্ট্রির দুইজন প্রোফেসার যার নাম শরদ কুন্দে এবং ড. দেব প্রভৃতিদের নাম বলা হয়েছে । এই তথ্যও নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় তদন্ত করার সময় উদ্ঘাটন হয় ।

৪) ১৫ই মে ২০০২ : সঙ্ঘ পরিবারের ১৫ থেকে ৪৫ বছরের বয়সের মধ্যে ১৫৩ কর্মচারীরা পুনা শহরে ২১ দিনের একটি ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে । খাকী নেকর পরিধান করে এই কেডাররা 'হিন্দু রাষ্ট্রের' মধ্যে আবশ্যিক লাঠি, যোগ, খো খো, কবাডি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা অভ্যাসসহ সব কিছুর শিক্ষা দেওয়া হয় । এই যুদ্ধের ক্যাম্প বন্ধের দিনে আয়োজন করা হয় এতে কেউ বাইরে বেরুবার অনুমতি ছিল না এবং আগে থেকে না জানিয়ে কেউ ভিতরেও প্রবেশ করতে পারত না । সেই সময় সমগ্র দেশের অন্যান্য ৭১টি স্থানে ঠিক এই রকম ক্যাম্প লাগানো হয় । মহারাষ্ট্রের লাতুরে ৪৫ থেকে ৬০ বছরের বয়স্ক লোকেদেরকেও এক বিশেষ ক্যাম্পে সিনিয়ার সিটিজেন বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । (পুনে নিউজ লাইন [ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস] ১৫ই মে ২০০২) ।

৫) ৩১ মে ২০০২ : বজরঙ্গ দলের সদস্যরা এক সপ্তাহের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প ভূপালের (মধ্য প্রদেশ) মধ্যে আয়োজন করে যাতে ১৫০ জন কর্মচারীকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । বলা হয়েছিল এই ক্যাম্প যুবকদেরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লড়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । (দ্য টাইমস্ আফ ইন্ডিয়া, পুনে, ৩১ মে ২০০২)

৬) ১৮ মে ২০০৩ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা কর্মচারীদের জন্য মুম্বাইয়ে ১৭ মে ২০০৩ সালে একটি শারীরিক শিক্ষার ক্যাম্প গঠন করা হয় যাতে যুবতীদেরকে জুড়ো কেরাটের সঙ্গে চাকু চালানো এবং তরবারীর মাধ্যমে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । (সান্ডে দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, ১৮ মে ২০০৩) ।

৭) ৩১ মে ২০০৩ : আর. এস. এস এর মহিলা কর্মচারীদের জন্য কানপুরে ২৫ মে অল ইন্ডিয়া ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর শিবির শুরু হয় । যাতে কমপক্ষে ৭০ জন যুবতীদেরকে রিটায়ার্ট সেনা অফিসাররা রাইফেল লোড করা, নিশানা লাগানো এবং গুলি চালানোর ট্রেনিং দেয় এবং জুডো ট্রেনার্সরা তাদেরকে মার্শল আর্টসের ট্রেনিং দেয় । উত্তর প্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরেও এই রকম ৬ টি ক্যাম্প লাগানো হয় । সারা দেশে এই রকম ৭৩ টি শহরে ক্যাম্প লাগানো হয় । (সান্ডে এক্সপ্রেস, পুনে, ১ জুন ২০০৩)

৮) ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ : বজরঙ্গ দলের লোকেরা যুবকদের নিয়ে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য' ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিনের একটি ক্যাম্পের আয়োজন করে যার জন্য পুলিশের কাছে কোন অনুমতি নেই নি । এই শিবিরে মুম্বাইয়ের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবকরা অংশগ্রহণ করে । লাঠি, তলোয়ার এবং এয়ার রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয় । তারা ঠিক সেইরকম ভাষনে এবং চর্চায় অংশগ্রহণ করে যাতে তাদের মস্তিস্কে এমন ধারণা ঢোকানো হয় যে সন্ত্রাসবাদের জন্য ইসলামী জিহাদ কিরকম দায়ী । (এশিয়ান এজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ এবং দ্য মিল্লী গ্যাজেট ১৬-৩১ জানুয়ারী ২০০৯) (তথ্যসূত্র ঃ 'Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India' By S. M. Mushrif/ Page 56-58)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কিরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপ শিক্ষা দিচ্ছে অথচ মিডিয়াতে তাদের ব্যাপারে কোন শোরগোল নেই । আর মাদ্রাসাতে আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়না তবুও মাদ্রাসা তাদের কাছে চক্ষুশূল ।

হিন্দুত্ববাদীদের যেসব স্থানে অস্ত্র পাওয়া গেছে

১) ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ : নাসিক পুলিশ শহরের পাশে একটি গাড়ি থেকে ৫০ ডিটোনিটার, জিলোটিনের ছড়ি, ১১টি বাক্স এবং পাঁচ টিন অ্যামোনিয়াম উদ্ধার করে । বোঝা যায় এইসব বিস্ফোরক সামগ্রিক বজরঙ্গ দলের । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

২) ২০০৬ : আহমদাবাদ জেলার একটি গ্রামে শঙ্কর সেলকে নামক একটি ব্যাক্তির ঘরে ১৫ কেজি আর. ডি. এক্স পাওয়া যায় । পরে এই শঙ্কর নামক ব্যাক্তি রহস্যময়ভাবে মৃত পাওয়া যায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৩) পুলিশ পাথারী নামক স্থানে আহমদাবাদ জেলার একটি চিনি কারখানায় অধিক সংখ্যক বিস্ফোরক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৪) ১৪ অক্টোবর ২০০৬ : পুলিশ ঔরঙ্গাবাদ জেলায় চিকল থানায় আডগাঁও গ্রামের প্রধানের ঘরে সাড়ে চার কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ১৮৬ টি জিলোটিনের ছড়ি এবং ৫৬৬ ডিটোনেটার বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৫) ২০০৬ : ঐরাঙ্গাবাদ - মুম্বাই হাইওয়ে এর উপর অবস্থিত একটি ক্লাবে পুলিশ লক্ষণ জয়বন্ত নামক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ২০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ১৮টি জিলোটিন বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৬) ২০০৭ : লাতুর জেলার পুলিশ সাতজন যুবকের নিকট থেকে ১৪ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং জিলোটিনের ছড়ি বাজেয়াপ্ত করে । সেই যুবকদের নাম হল বিকাশ মওয়াড়, কৈলাশ, বিনোদ, ধনঞ্জয়, নিতীশ, মহেশ এবং গনেশ । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৭) ৩১ অক্টোবর ২০০৮ : পুলিশের বোমা অনুসন্ধানকারী ও নিষ্ক্রিয়কারী দল নতুন মুম্বাইয়ের 'বাশী অ্যাডিটোরিয়াম' এ একটি বোমার অনুসন্ধান করে তাকে নিষ্ক্রিয় করা হয় এবং পরে তদন্ত করে বোঝা যায় এই বোমা ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠনের লোকেরা রেখেছিল । (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, জুলাই এবং আগস্ট ২০০৮)

৮) ১৭ আগস্ট ২০০৮ : মালেগাঁও পুলিশ একটি ভবনে বেসমেন্টে অবস্থিত একটি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে খানাতল্লাসী করে সেখান থেকে ৫ টি আর. ডি. এক্স বোমা, ৩টি আর. ডি. এক্স বোমার পুরাতন খোলা, একটি পিস্তল, একটি ল্যাপটপ, একটি স্কেনার, দুটি মোবাইল ফোন, এক হাজার টাকার চারটি জাল নোট এবং পাঁচ হাজার টাকার নগদ পয়সা বাজেয়াপ্ত করে এবং তিনজন ব্যাক্তি নিতীশ অশিরে, সাহিবরাও ধুরবে এবং জিতেন্দ্র খেমাকে গ্রেফতার করে যাদের সম্পর্ক কোন একটি অজানা সংগঠনের সঙ্গে ছিল । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ মে ২০০৮)

৯) ৪ এপ্রিল ২০০৮ : কোলহাপুর জেলার আজারার পাশে পুলিশ দুইজন যুবক 'আওলিবর বারদেশকর' এবং 'দত্তা শঙ্কর পচাওয়াডেকর' কে সেই সময় গ্রেফতার করে যখন সে একটি মোটরসাইকেলে ৩৫টি দেশী বোমা, একটি বন্দুক এবং কিছু কারতুস নিয়ে যাচ্ছিল । (দৈনিক পুধারী, কোলহাপুর, ১১ এপ্রিল ২০০৮)

১০) জুলাই আগস্ট ২০০৮ : আর. এস. এস এর সহযোগী সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু সেনার প্রমোদ মুথালিক ব্যাঙ্গালোরে 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সংস্থা' গঠন করে যাতে ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৫০ জন এবং সমগ্র রাজ্য থেকে ৭০০ জন ব্যাক্তিকে ভর্তী করা হয় । মুথালিক দাবী করে যে সে অ-সরকারী সেনা রাজ্য থেকে সন্ত্রাসকে খতম করার জন্য সেনা গঠন করেছে । (পুনে মিরর, ২৩ আগস্ট ২০০৮)

প্রমোদ মুথালিক শ্রীরাম সেনারও প্রাধান । সে দাবী করে তার আত্মঘাতী সংগঠনে এই পর্যন্ত ১১৩২ জন হিন্দ নওজোয়ান আত্মঘাতী বোমা হিসাবে ভর্তী হয়েছে । শ্রীরাম সেনার আত্মঘাতী সংগঠনের এই বোমারুদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য (Brain Washing) ম্যাঙ্গালোর, বেলগাঁও এবং সামোগার মধ্যে গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প লাগানো হয়েছে । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১১) ২ আগস্ট ২০০৮ : উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার পুলিশ সাধুবাবার রুপ ধারন করা এক ব্যাক্তিকে ঠিক সেই সময় গ্রেফতার করে যখন সে নিজের থলির মধ্যে কারগর বোমা নিয়ে আদালতের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিল । অভিযুক্তের নাম বলা হয়েছে "সন্ত নানকৌব দাস ।" (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১২) ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ : দক্ষিন কন্নড়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চ কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোরে দুরেশ কামথ নামক এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে । সে পতুরের একটি নিজস্ব ব্যাবসার জন্য অধিক

সংখ্যক জিলোটিনের ছড়ি, ডিটোনিটার এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য সামগ্রী অবৈধভাবে জমা রেখেছিল। (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১৩) ৩ অক্টোবর ২০০৮ : পুনা জেলার টালেগাঁও ধাবড়ের দশেরার অবসরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দল একটি সশস্ত্র রৈলীর আয়োজন করে যেখানে অল্প বয়স্ক ছেলেদের তলোয়ার, লাঠি এবং উঠিয়ে ছিল। (দৈনিক লোকমত [হেলো পুনে], পুনে, ৪ অক্টোবর ২০০৮)

ঠিক সেই রকম একটি রৈলী মহারাষ্ট্রের অন্যান্য স্থনেও বের করা হয় যেখানে তরবারী, লাঠি, ত্রিশূল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক শ্লোগান লাগানো হয়। সব থেকে বড় রৈলী সাঙ্গী থেকে বের করা হয় যাতে পাঁচ হাজারের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে।

১৪) ৯ নভেম্বর ২০০৮ : সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে তদন্ত করার সময় পুলিশ মহারাষ্ট্রের জালনা জেলার বদনাপুরের একটি গ্রাম মাজারগাঁও গ্রামে ৭টি জীবিত বোমা উদ্ধার করে। সেই বোমাগুলি এতোই শক্তিশালী ছিল যে শত মিটার দুর পর্যন্ত বিধ্বস্ত করতে পারত। এই মামলায় এ. টি. এস পুনার রাজেশ দত্ত তাতারিরা এবং নানদেড়ে মারুতি বাঘকে গ্রফতার করে। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনা, ইন্ডিয়া ইনফো ডট কম, পি টি আই, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

১৫) বর্ধা নামক স্থানে দীপাবলির সময় উপহারস্বরুপ কিছু প্যাকেট বোমা পাঠানো হয়। এই ব্যাপারে পুলিশ চারজন ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে।তাদের নাম যথাক্রমে, চিন্টু ওরফে মহেশ থাওয়ানী, জিতেশ প্রধান, প্রকাশ চাওলা এবং অজয় জীওতাড়ে। কিন্তু তাদের দলের নেতা বান্টু তেলেগোটে ওরফে 'লাডেন' পলাতক। (দৈনিক ভাস্কর, ৩ নভেম্বর ২০০৭)

১৬) ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ : মুম্বাই থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত কম্বা পারবেলের নিকট 'সিনেরাজ সিনেমাহলে' হিন্দি সিনেমা 'যোধা আকবর' দেখার সময় বোমা রাখা হয়। (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, জুলাই এবং আগস্ট ২০০৮) (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 58-68)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কি পরিমাণ দেশে সন্ত্রাস ছড়াবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা-বারুদ রাখে ? অথচ ব্রাহ্মন্যবাদী মিডিয়া ও প্রশাসন তাদেরকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করে না এবং হিন্দু সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে না অথচ কোন ইসলামী সংগঠন কোন কার্যকলাপে দায়ী না হলেও তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করা হয় এবং যে মাদ্রাসায় কুরবানীর সময় গরু জবাই করার জন্য একটি ছুরিও পাওয়া যায় না সেই মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বা সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর বলে

ফলাও করে প্রচার করা হয় । কেননা, প্রশাসনও হিন্দুদের হাতে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও মিডিয়াও ব্রাম্ভন্যবাদীদের নিয়ন্ত্রনে । তাহলে নিজেদের সম্পর্কে তারা সমালোচনা করবে কেন ?

বোমা বানাতে গিয়ে যেসব হিন্দুত্ববাদী মারা গেছে

বিভিন্ন স্থানে বোমা বানাতে গিয়ে যেসব হিন্দুত্ববাদীরা বিস্ফোরণে মারা গেছে তার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল,

১) ১৭ নভেম্বর ২০০৮ : ঐরাঙ্গাবাদের খড়কেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং নিরালবাগ এলাকার বি. এইচ. পি অফিসে পাইপ বোমা বিস্ফোরণ হয় । (লোকসত্তা ওয়েবসাইট, ২৪ মে ২০০৬ এবং লোকমত, ঐরঙ্গবাদ, ১৭ নভেম্বর ২০০২) এপ্রিল মাসের ২০০৬ সালে নানদেড়ে বোমা বিস্ফোরণে আর. এস. এস এবং বজরঙ্গ দলের দুইজন কর্মচারী বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবং ঘটনাস্থলে মারা যায় । ঘটনাস্থলে পুলিশ পাইপ বোমা উদ্ধার করে এবং ঐরাঙ্গাবাদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে তার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখতে পায় । (লোকমত, ঐরঙ্গবাদ, ২৪ মে ২০০৬)

২) ৬ এপ্রিল ২০০৬ : রাত ১ : ৩০ সময় আর. এস. এস এর স্বয়ংসেবক রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার 'লক্ষমণ রাজকোঁডাবার' এর ঘরে নানদেড়ের মধ্যে ভয়ঙ্কয় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে ফলে তার ২৯ বছর বয়সী পুত্র নরেশ রাজকোঁডাবার এবং বজরঙ্গ দলের নেতা হিমাংসু পানসে মারা যায় এবং তার অন্য তিনজন সাথী ঘায়েল হয় এবং রাহুল নামের এক সাথী বেঁচে যায় যাকে পুলিশ পরে গ্রেফতার করে । এই বিস্ফোরণ সেই সময় হয় যখন তারা বোমা বানাচ্ছিল ।

৩) ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ : নানদেড়ে একটি রহস্যময় বোমা বিস্ফোরণে ২৪ বর্ষীয় 'পান্ডুরাং ভগবান অনিল কান্থবান' মারা যায় এবং তার সাথী দয়ানেশ্বর মানিকরাও গোনেবার (বয়স ৪০ বছর) মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় । বলা হয়েছে এই দুজনেই বজরঙ্গ দলের । (দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, পুনে, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)

৪) ১১ অক্টোবর ২০০৭ : মহারাষ্ট্রের যবতমাল জেলার একটি গ্রামে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে আর. এস. এস এর একজন কর্মচারী ডাক্তর বাফনা মারা যায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক শোধন, মুম্বাই, ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

৫) ২৪ আগষ্ট ২০০৮ : উত্তর প্রদেশের কানপুরে বজরঙ্গ দলের দুইজন কর্মচারী রাজীব মিশ্রা এবং ভোপেন্দর সিং সেই সময় বোমা বিস্ফোরণের মারা যায় যখন তারা ঘরের মধ্যে বোমা বানাচ্ছিল । কানপুর জোনের আই. জি পুলিশ এ. কে সিং সংবাদপত্রকে জানান যে তদন্তে বোঝা গেছে তারা বৃহৎ সংখ্যায় বোমা বিস্ফোরণের চক্রান্ত করেছিল । পুলিশ অধিক

সংখ্যক বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও ডায়রী এবং মুসলিম বহুল এলাকা ফিরোজাবাদের কবরস্থানের হাতে বানানো কক্সা উদ্ধার করে। (আউটলুক, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮, কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, সেপ্টেম্বর ২০০৮) এই ঘটনার তদন্তের সময় উত্তর প্রদেশের এ. টি. এফ বুঝতে পারে এই বিস্ফোরণের মারা যাওয়া বজরঙ্গ দলের কর্মচারী মিশ্র ও ভুপেন্দর এই ঘটনার দুই মাস আগে মুম্বাইয়ের দুটি নম্বরে অনেকবার ফোন করেছে। পরে বোঝা যায় দুটি সিমকার্ড জালী নামে নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ মোবাইল কোম্পানীর কাছ থেকে এদের কথাবার্তার বিস্তারিত জানার জন্য চেষ্টা করছে। পুলিশের কথা অনুযায়ী যত পরিমান বিস্ফোরক দ্রব্য মিশ্রার ঘরে পাওয়া গেছে তাতে সে গুজরাট ও ব্যাঙ্গালোর ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৯ অক্টোবর ২০০৮)

৬) ১০ নভেম্বর ২০০৮ : কেরলের কন্নুর জেলায় আর. এস. এস. এর দুইজন সদস্য বোমা বানাবার সময় বিস্ফোরণে মারা যায়। দ্বিতীয় দিনে এলাকায় তদন্ত করার সময় মুস্কিলভাবে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দুরে অবস্থিত বিজেপি নেতা প্রকাশনের ঘরে ১৮টি দেশি বোমা উদ্ধার করে। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনে, ১১ নভেম্বর, এবং দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮) (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 58-68)

বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে হিন্দুত্ববাদীরা মারা গেছে অথচ এতে কোন শোরগোল নেই কিন্তু বর্ধমানের খগড়াগড়ের বিস্ফোরণে একজন হিন্দু স্বপন মন্ডল সহ একজন মুসলমান মারা গেছে তাতেও মিডিয়া মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া হিসাবে তুলে ধরেছে।

সত্য সেলুকস ! কি বিচিত্র এই দেশ !

হেমন্ত কারকারের হত্যাকারী কারা ?

মুম্বাইয়ের ২৬/১১ হামলা ও মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান হেমন্ত কারকারেকে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা খুন করেন। এরকম ধারণা করেছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং। তিনি '২৬/১১ - একটি আর. এস. এস. ষড়যন্ত্র ?' নামে একটি বই লিখে তা তার এই সন্দেহের প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, নিহত এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে নিহত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে হিন্দু মৌলবাদীরা তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কারণে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে হেমন্ত কারকারে গ্রেফতার করেছিলেন। তাঁর গ্রেফতারে দেশ জুড়ে হই চই পড়ে যায়। হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের যাতে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হেমন্ত কারকারেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাজ হোটেলে জঙ্গি হামলা থামাতে যাওয়ার লক্ষ্যে বেরিয়েছিলেন এই হেমন্ত কারকারে। পথিমধ্যেই তাকে হত্যা করা হয়।

দিগ্বিজয় সিং হেমন্ত কারকারেকে আর. এস. এস.রা হত্যা করার আশঙ্কা করেছিলেন তার প্রমাণও তিনি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি দিল্লীর সাংদাবিক বৈঠকে হেমন্ত

হেমন্ত কারকারের ফোনের কললিষ্ট তুলে দেন । এই কললিষ্ট দেওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর. আর. পাতিলের দাবীকেও উড়িয়ে দেন । পাতিল বলেছেলেন, দিগ্বিজয়ের ওই মন্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই । B.S.N.L -এর দেওয়া ওই কললিষ্টে দেখা যাচ্ছে দিগ্বিজয় তাঁর B.S.N.L নম্বর ০৯৪২৫০১৫৪৬১ থেকে মহারাষ্ট্র এ.টি.এস (ATS/Anti Terrorist Squad) - এর ০২২-২৩০৮৭৩৩৬ নম্বরে ফোন করে প্রায় ৬ মিনিট কথা বলেন । দিগ্বিজয় সিং সাংবাদিকদের কাছে দাবী করেন যে মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আর. এস. এস. এর এক ঝাঁক নেতার হদিস পান যারা ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের ধারণা । তিনি বলেন, মুম্বাই হামলার সঙ্গে পাক জঙ্গি সংগঠনের যোগসাজিস ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু দেশের বেশ কয়েকটি সিরিয়াল বিস্ফোরণ গোয়েন্দাদের নযর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় । দিগ্বিজয় সিং আরও বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ননাশকতার সঙ্গে জড়িতদের ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে । সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, “যখনই কারকারে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে অনেককে চিহ্নিত করে ফেলেন, তখনই দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় । একমাত্র বারাণসী ও পুনের বিস্ফোরণ ছাড়া ।” তদন্তে নেমে কারকারে সংঘ পরিবার অনুগামী অভিনব ভারত নামে এক সন্ত্রাসী হিন্দুবাদী সংগঠনের যোগ খুঁজে পান । তারপর থেকেই হেমন্ত কারকারে হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলে পড়েন । দিগ্বিজয় সিং আরও বলেন, বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে থাকা স্বামী অসীমানন্দ ২০০৭ সালে শর্বরীধামে আর. এস. এস. নেতা সুদর্শন, মোহন ভাগবত - সহ অনেককে একসঙ্গে জড়ো করেন । আশ্চর্যের বিষয়, যে ‘অভিনব ভারতের পান্ডা’রা ধরা পড়তেই দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা ব্যাপকভাবে কমে যায় । মুসলমানদের জানমালের ধ্বংস কমে গেছে । ভারতীয় মুসলমানদের বড় উপকার করেছেন দিগ্বিজয় সিং ও প্রয়াত এটিএস (ATS/Anti Terrorist Squad) প্রধান হেমন্ত কারকারে । এখন প্রশ্ন হল, হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা কি হেমন্ত কারকারে হত্যার জন্য মুম্বাই হামলার মতো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ?

মুম্বাই হামলার সময় এ টি এস প্রাধান হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এর ষ্টক থেকে সন্ত্রাসবাদীদেরকে স্কাডা কার দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছিল । হেমন্ত কারকারে মুখ্য কন্ট্রোল রুমে ১১টা বেজে ২৪ মিনিটে এবং ১১টা বেজে ২৮ মিনিটে ফোন করেছিলেন । তিনি সংকেত দিয়েছিলেন যে এ টি এস, কিউ আর টি টীম এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ, এস বি সাইডে অর্থাৎ কামা হাসপাতালের পিছনের দরজার দিকে যাতে ফোর্স পাঠানো হয় কেননা ফাইরিং এবং বিস্ফোরণ হাসপাতালের ভিতরে জারী ছিল । কন্ট্রোল রুম তাঁর এই সংবাদ ১২টা বেজে ৩০ মিনিটে পুষ্টি করে । শ্রীমতি বিনীতা কামটে ‘টু দ্য লাষ্ট বুলেট’ (To The Last Bullet) নামক বইয়ে লিখেছেন, “রাত ১১টা বেজে ৩৩ মিনিটে কন্ট্রোল রুম থেকে শেষ জবাবের পরে মি. কারকারের কাছে আর কোন জবাব আসেনি এবং ১৫ মিনিটের অধিক সময় পর্যনন্ত নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছিল ।” (পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)

হেমন্ত কারকারে ১১টা বেজে ৫ মিনিট পর্যন্ত কামা হাসপাতালে ছিলেন এবং ১ ঘন্টার অধিক সময় পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে কোন ফোর্স পাঠানো হয়নি। অথচ কন্ট্রোল রুম থেকে সেই জায়গা কেবল কিছু মিনিটের দুরে ছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন থেকে শুরু করে কন্ট্রোল রুমের কর্মচারীরা পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেহেতু কারকারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং হিন্দুত্ববাদী নেতাদেরকে গ্রেফতার করেছিলেন।

তাহলে সকলে আসুন, মালেগাঁও বিস্ফোরণ, আজমীর বিস্ফোরণ, সমঝোতা বিস্ফোরণ, হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণকান্ডের মূল সন্ত্রাসবাদী, স্বামী অসীমানন্দ, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, মালগান্ডা পাতিল, যোগেস নায়েক, গোয়েল বিনয় তালেকর, বিনায়ক পাতিল, ধনঞ্জয় আস্টেকার, দিলীপ মনগাঁওকর, প্রশান্ত জুভেকার, সারভ আকোলকার, জয়প্রকাশ রুদ্র পাতিল, প্রশান্ত আস্টেকার, ইন্দ্রেশ কুমার, সুনীল যোশি, দেবেন্দ্র গুপ্ত, লোকেশ শর্মা, চন্দ্রশেখর, মৈয়াংক, হর্ষদ সোলাংকি, মেহুল, মোহন, আনন্দরাজ কাটরে, বাসুদেব পারমার, সন্দীপ ডাঙ্গে, রামচন্দর, বিষ্ণু পাটেল, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), মুখ্য কন্ট্রোল রুমের কর্মচারীরা যারা (সন্ত্রাসবাদীর) হেমন্ত কারকারেকে খুন করেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি।

আই. এস. আই এর এজেন্ট এখন হিন্দুত্ববাদীরা

বেশ কয়েক দশক ধরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, ভারতের রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া ও গোয়েন্দা এজেন্সি প্রভৃতিরা এই জিগির তুলেছিল যে ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই (ISI/Inter Service Intelligence) এর এজেন্ট। এই ভুয়া দাবী প্রমান করার জন্য তারা ভারতের অনেক বেসরকারী বা খারিজী মাদ্রাসায় হানা দেয় এবং মুসলমানদেরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, যেদিন রাতের অন্ধকারে পুলিশ বাহিনী আই. এস. আইয়ের এজেন্টের সন্ধানে 'নাদওয়াতুল উলামা' লক্ষ্ণৌ-এর ক্যাম্পাসে হানা দেয়। এই হল দেশের বিখ্যাত ও সম্মানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা। তাহলে ছোট ছোট মাদ্রাসার মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর কি ঘটছে তার অনুমান নিজেই করতে পারেন। বিগত কয়েক বছর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কথাবার্তা থেকে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচুর মাদ্রাসা স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়। এবং এই বাহানায় তারা মাদ্রাসার উপর নযরদারী করতে চায়। শুধু তাই নয় এমনকি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মাগরুবুর রহমানকে একের পর এক নিজের নিরপরাধের কসম খেতে হয়েছে।

এইভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে আই. এস. আইয়ের (ISI/Inter Service Intelligence) এজেন্ট বলে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসার শিক্ষক বা ছাত্রকে তারা আই. এস. আইয়ের এজেন্ট বলে প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু যখন হায়দ্রাবাদে মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটার পর সি.বি.আই (CBI/Central Bureau of Investigation) এর তদন্তে আর. এস. এস. (RSS/Rastriya Sayam Sevak Samgha) এর কর্মী ইন্দ্রেশ

কুমার স্বীকার করে যে সে আই. এস. আইয়ের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে । এমনকি সে স্বীকার করে যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের জন্য আই. এস. আইয়ের এজেন্টের কাছ থেকে অর্থও পেয়েছিল ।

সুতরাং এখন প্রমাণ হচ্ছে যে আই. এস. আইয়ের প্রকৃত এজেন্ট হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো । তারা নিজেদের দোষ ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই মুসলমানদের নামে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে ।

নিচের ইংরেজী প্রতিবেদনগুলি পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন কারা আই. এস. আই এর প্রকৃত এজেন্ট ।

1) December 27 : Hyderabad, December 27 : Central Bureau of Investigation probing into the Makkah Masjid blast case has learnt Makkah Masjid case supect Indress kumar had relations with Pakistan's secret agency ISI (Inter Service Intelligence).

Indress kumar was said to be holding an important post 'marg darshak' in an organization Muslim Rashtriya Manch. His work was to enlighten Muslims with the idsology of RSS and persuade them to join Sangh Parivar. CBI (Central Bureau of Investigation) has also learnt that Indress kumar was a salaried agent of Pakistani's ISI prior to the Malegaon blast. CBI source told that Indress kumar was getting salary from Pakistan's secret agency ISI since ling. (Refference: Siasat News/Link :-
http://www.siasat.com/english/news/rss-leader-indresh-kumar-salaried-agent-isi)

2) Mumbai, Feb 18: RSS leader Shyam Apte has alleged two RSS leaders, including general secretary Mohan Bhagwat were founded by Pakistan's ISI, Malegaon blast accused Dayanand Pandey said in his confessional statement to the police. "In August 2008, I had gone to Pune where I met with RSS leader Shyam Apte who told me about (Indresh) Kumar (Muslim wing leader of RSS) and Bhagwat taking money from ISI. Lt Col Srikant Purohit, after learing about this, had asked one Captain Joshi to murder the two," Pandey said in his confession before a Deputy Commissioner of Police (DCP)

The self-styled religious leader, in this statement to the police, has said Purohit who had formed right wing group Abhinav Bharat, had directed one Captain Joshi to murder Indresh Kumar and Mohan Bhagwat.

The statement said Joshi was, however, not able to execute the murder which had infuriated Apte. Pandey said the entire Malegaon blast conspiracy was hatched by Purohit and co-accused Sadvi Pragya Singh Thakur who wanted to teke the lead in the caused of Hindutva and "avenge for the deaths of Hindus caused by Muslims across the country."

"In August 2007, I met Purohit in Deolali camp (near Nastik) where he told me about forming a right wing group by the name Abhinav Bharat for promoting and safeguarding Hindutva," Pandey's confession statement said.

In January 2008, Pandey attended a meeting of Abhinav Bharat in Faridabad in which Purohit, co-accused Sudhakar Chaturvadi and retired Major Ramesh Upaddyay were present it said.

In the morning, Purohit spoke extensively about the setting up of a "Hindu Rashtra" with its own Constitution for the protection of Hindus, it added. "Purohit had also said he would arrange for explosives which can be used to blast Muslim-deminated areas. Upaddyay then said that he can arrange for men to prepare the bombs," Pandey has said.

In July 2008, Pandey had gone to Indore where he met the Sadhvi who told him that she had asked Purohit to arrange for explosives for the protection of Hindus. "Sadhvi said that Purohit was not taking the cause seriously and asked me to convince him to arrange for the explosives immediately," the statement said. Of the 11 arrested accused in the case, two – Pandey and Prakash Dhawde – have given confessional statement. Confession given before a DCP –Level officer is admissible in the court under Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) which has been invoked in the Malegaon case.

Bureau Report
First Published : Wednesday, February 18, 2009

(Reffence Link- : http://zeenews.india.com/news/nation/isi-founded-rss-leaders-pandeyes-confession_508735.html

3) A Militery Intelligence report of the Army on disgraced officer Lt. Colonel Prasad Srikant Purohit - now in jail for this alleged role in the Malegaon 2008 blast and link with Hindus extreminsts – reveals that his Organization, Abhinav Bharat, had plotted to kill senior RSS leader Indress Kumar.

Its reason: Indresh, Purohit suspected, was the "mole of ISI" (Pakistan's Inter Service Intelligence) in the Sangh Parivar and had received fake Indian currency to the tune of Rs 21 crore from the Pak agency.

Indresh name also figures in statements made by some of accused in a string of terror attacts on Muslim targets, including Malegaon, Mecca Masjid and the Samjhauta Express. Indress has denied any role and said the government has been playing politics with the Investigation.

The plot to kill Indresh Kumar was revealed by Purohit in his interrogation in connection with the September 29, 2008 Malegaon blast, according to the MI report which has been obtained by the Indian Express. Incidentally, the MI report on Purohit says: "Malegaon bomb blast coincided with birthday celebration of Col Purohit's younger son. It may not be a mere coincidence." Purohit was jointly questioned by the Maharashtra Anti – Terror Squad (ATS) then haaded by Hementa Karkare, the Intelligence Bureau 29-30, 2008. The MI report says Abhinav Bharat was Purohit's brainchild, set up to counter ISI activities in India with "Fanancial assistance" from wealthy RSS supporters. The report says that a Pune – based rich, "staunch" RSS supporter Shyam Apte was roped in to finance the plot to kill "ISI agent" Indresh with a fraud Sharda Peeth Shankaracharya alias Dayanand Pandey jumping onto the bandwagon to make money.

"Ajay Rahilkar aka Raja handled the financial affairs (of Abhinav Bharat) as directed by Col Purohit. One Shyam Apte (70 years), a committed worker of RSS was the main provider of founds of 3.20 lakh to Rakesh Dhavde (the arms supplier of Abhinav Bharat) to buy arms as directed by Purohit. This has been separately confirmed by Dhavde and Col Purohit, who stated that these weapons were being procured on direction of Shankaracharya who tasked Col Purohit to eliminate one Indresh Kumar was already agent of ISI and along with one Subeder Singh was also involved in pumping of fake Indian currency," says the interrogation report.

(Reffernce Link- : http://archive.indianexpress.com/news/purohit-plotted-to-kill-rss-leader-indress-kumar-report/743063/)

4) New Delhi, Mar 12 (ANI): The Annual General Body meeting of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) called the "Pratinidhi Sabha" will be held in Nagpur from March 20 where party chief K S Sudarshan is likely to sack vice-chief Mohan Bhagwat, according to the website Politicsparty.com.

Politicsparty.com said Sudarshan is expected to appoint a New Second – in Command in place of Bhagwat, who was allegedly charged with regularly receiving payment from Pakistan's Inter Services Intellugence (ISI) Agency.

The RSS spex leadership led by Sudarshan has taken cognizance of the Anti-Terror Investigation and the alleged payments by the ISI to RSS apex position holders, says the website. (ANI)

Copyright 2009/Story first published: Thursday, March 12, 2009, 13:06 [IST]

(Refference Link- http://www.oneindia.com/2009/03/12/rss-to-sack-vice-chief-mohan-bhagwat-for-isi-involvement-.html)
Or
http://www.thefreelibrary.com/RSS+to+sack+vice-chief+Mohan+Bhagwat+for+ISI+involvement.-a0212347798)

5) NEW DELHI: RSS leader Indresh Kumar may be under CBI scanner for his suspected role in "saffron" terror but hi might have been seen as an apostate by the Abhinav Bharat crew with Lt Col Srikant Purohit, held for the Malegaon blast, seeing the Sangh man as an "ISI agent." In his confession in the Mecca Masjid case, Swami Aseemanand, who claims to know a lot about a number of bomb blasts allegedly carried out by Hindu extremists in 2006-08, has said Purohit saw Indresh as a renegade who had crossed over to the other side. Aseemanand has recalled that Purohit had "also" once told him that "Indreshji is an ISI agent" and he (Purohit) had documents with him about this – indicating that others might have earlier told the Swami about the RSS man's Pakistan's links. He however, added, "….Purohit had never shown him those documents." Purohit – who had worked with Military Intelligence for many years – is currently in jail.

Indresh had earlier attracted sharp critism from Purohit and other radicals for his attempt to woo Muslims in Jammu & Kashmir. The RSS leader's bid to flag off Muslim on yatras – a scheme that went largely unnoticed – had incensed some of the Abhinav Bharat members. The Swami in his statement has also claimed that Sunil Joshi (the operational man who was allegedy killed by his own men) had told him that two Muslim boys along with him (Joshi) and others carried out the blast in Ajmeer (in October 2007) "When I asked Sunil Joshi as to how did he get Muslim boys, he told me that Indreshji had given it to him," claimed Aseemanand in his confession, made before metropolitan magistrate Deepak Dabas here last month in connection with the Mecca Masjid blast case of the CBI. The Swami, born as Naba Kumar Sarkar, while referring

to these two Muslim boyes said he warned Joshi that if he was caught then Indresh's name would also be exposed. This was why Joshi had a threat on his life from Indresh. Aseemanand claimed that he also told Joshi that by using Muslim boys he would end up being targeted by Islamic extremists too.

(Refference Link: http://m.timesofindia.com/india/Co-conspirators-saw-RSS-man-as-ISI-mole/articleshow/72447556.cms)

6) RSS leader an ISI agent ?
By : Ketan Ranga Date: 2011-01-13
Place: Mumbai
http://i.mgur.com/Wfubp.jpghttp://i. .mgur.com/Rfsir.jpg
Pics: Aseemanand, Indresh Kumar Aseemanand backed Malegaon blast accused's revelation that Indresh Kumar is an ISI agent. The arrest of Swami Aseemanand and this 42 - page confession statement has dubbed RSS leader Indresh Kumar as a Pakistani Inter Services Intelligence (ISI) agent. It also points to differences within the sangh parivar. Aseemanand's views earlier endorsed by Malegaon blast accused Lt Col Shrikant Purohit. Purohit had stumbled upon Kumar's role as an ISI agent he has attached to the Milittary Intelligince (MI) prior to his arrest by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS) in November 2008.

In the statement, Aseemanand told the Magistrate that he remembers Sunil Joshi telling him that Kumar has provided him with two Muslim bombers to plant the explosives in Ajmeer. Aseemanand feared for Joshi's life, as he felt those two men could kill him. Leter he shared his fears with Purohit when he also angeed that Kumar could have been an ISI agent.

Malegaon blast

Mumbai ATS had arrested Purohit in the 2008 Malegaon bombings, as he had allegedly provided the explosives for the blast. After his arrest, he did not provide many details to the police, but informed them about Kumar's role. According to the Investigation Purohit had told them that Kumar was an ISI agent and he should be kept under surveillance. Investigators believe that Kumar must be getting funds from the ISI. According to the police, the Hindu radicals who have been arrested have named Kumar, but he was never a part of any of the meetings or was in anyway directly involved in the blast conspiracies. It was Joshi who was in touch with him and used to provide him with details, but Joshi was killed leter. The CBI has questioned Kumar and even the National Investigation Agency (NIA) has been keeping a watch on him.

(Refference Link: http://www.echarcha.com/forum/archive/index.php/t-37380.html)

7) Mohan Bhagwat RSS Chief ISI Agent

Latest News about Mohan Bhagwat RSS Chief ISI agent, stories, articales, updates, photos, videos, wiki and blog entries related to Mohan Bhagwat RSS Chief ISI agent.

(Refference Link: http://news.biharprabha.com/bp/mohan-bhagwat-rss-chief-isi-agent/)

8) 'Media reports say that Colonel Purohit (now in jail in connection with the Malegaon blast) had suspected Indresh Kumar to be a mole of ISI who had receivd fake Indian currency to the tune of Rs. 21 crore from the Pakistani agency' party spokesperson Shakeel Ahmed said. After terming alleged shelter being given by BJP-ruled states to bomb blast suspects associated with RSS as "Sanghi terrorism" Congress todey went a step further asking the Sangh to come clean on reports of its leader Indresh Kumar's suspected ISI link.

"Media reports say that Colonel Purohit (now in jail in connection with the Malegaon blast) had suspected Indresh Kumar to be a mole of ISI who had receivd fake Indian currency to the tune of Rs. 21 crore from the Pakistani agency" party spokesperson Shakeel Ahmed told reporters in Delhi.

"Two year ago, an ISI agent arrested in Nepal had also named Indresh Kumar as one who was given money to help creat Hindu-Muslim clases in India. Why RSS is silent? Why BJP leaders who take inspiration from them are silent? RSS chief Mohan Bhagwat says there is no place for radicals in RSS but merely making statements won't do RSS should come clean on it" he said.

"Taking a jibe at senior BJP leader LK Advani for this criticism of the government over the issue of black money, Ahmed said "Advani and others very often talk of black money. Some discussion should also be held on fake money like this. The attention of the investigating agencies should be drown to it." Earlier, addressing a national seminar, senior Congress leader Digvijay Singh accused BJP state governments of sheltering people affiliated to RSS who are allegedly involved in bomb blasts.

"All those who are making bombs run away to Gujrat and they get shelter there….Swami Assemanand shetteld there. Who gave his Organisation the forest land? The governments of BJP give shelter to such elements. There is a need to keep an eye on them," Singh (Digvijay Singh) said. A known detractor

of BJP and RSS, Singh reffered to a number of terror cases like Samjhauta Express blasts in which members of some RSS affiliated or organisation were arreted recently. Training his guns on senior BJP leader LK Advani, Singh said that it was his rath yatra in the 90s which had instigated-trouble in the Hindi belt of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

"Whenever BJP is weak, it takes up a communal issue. They would like to build a temple or horist a flag only where there is dispute. Without dispute they cannot survive. Ramjanambhoomi issue was there for lon, but they took it up in 1985 when their srrength in the Lok Sabha was a mere two," he said. Referring to a reported statement of Advani, he said, "Now I want to tell Advaniji every Hindu is not a terrorist. But why is every terrorist from RSS."

(Refference Link: http://www.dnaindia.com/india/report-congress-asks-rss-to-come-clean-on-indresh-kumars-suspected-isi-links-1500279)

9) Patna, 10 sept 2014: The NIA Wednesday arrested a suspected Pakistan's ISI agent from near the India- Nepal border in Bihar police said.

A district police official said the National Investigation Agency (NIA) team arrested suspected ISI agent. Sarda Shankar Kushwaha from near the India – Nepal border in Motihari, the headquarters of East Champaran district.

Police said NIA official are interrogating Kushwaha and will present him in a Motihari court Thursday.

Kushwaha, a resident of Raxaul town in East Champaran, was wanted in connection with several terror – linked cases, police said.

(Refference Link: http://www.indiatomorrow.net/eng/nia-arrests-suspected-isi-agent-in-bihar)

এইসব প্রতিবেদনগুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আর. এস. এস কে আই. এস. আই ভারতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে এবং টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে এবং আর. এস. এস এর বিভিন্ন স্বয়ং সেবককে আই. এস. আই থেকে রীতিমত বেতনও দেওয়া হত। এমনকি আর. এস. এস লীডার মোহন ভাগবতকেও আই. এস. আইয়ের এজেন্ট বলা হয়েছে।

মাওবাদী এবং সন্ত্রাসবাদ

মাওবাদীরাও আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে খ্যাত । তাদের কার্যকলাপ মারাত্মক হিংসাত্মক । এই মাওবাদীরা কমিউনিষ্ট এবং মাও সে তুং এর অনুসারী । মাও সে তুং বলেছোলেন 'বন্দুকের নলই সমস্ত ক্ষমতার উৎস' সেজন্য মাওবাদীরা ক্ষমতা দখলের জন্য বন্দুককে বেছে নিয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । চারু মজুমদার বলেছিলেন, "মাওয়ের চিন্তাধারাই আজকের যুগের মার্কসবাদ লেনিনবাদ ।" চিন কমিউনিষ্ট বলতে, Marxim, Leninisim and Mao Tse Tung though অর্থাৎ মাওয়ের চিন্তাধারা ।

আমাদের দেশের মাওবাদীরা বিরোধী পক্ষকে হত্যা করার জন্য রাস্তায় মাইন্ড পুঁতে রাখে এবং বিস্ফোরণ ঘটায় । অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে এরা মাইন্ড বিস্ফোরণ ঘটায় । এই মাওবাদীরা সাধারণ মানুষকে এ. কে ৪৭ রাইফেলের মুখে জনসাধারণকে জীবনযাপনে বাধ্য করে । এরা অসংখ্য সি. পি. এম নেতা কর্মীকে খুন করে । এই মাওবাদীরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে হত্যা করার প্রয়াস চালায় । অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান । এই মাওবাদীরা কেবল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই লালগড়, বেলপাহাড়ি, শালবনীসহ লাগোয়া এলাকায় ৪০ বার ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১১১ জনকে হত্যা করে । এর মধ্যে সি. পি. আই. এমের নেতা ও কর্মী ৭৪ জন, রাজ্য পুলিশ এবং সি. আর. পি. এফ মিলিয়ে ২৩ জন । ঝাড়খন্ডীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, মাঝিমাড়োয়া এবং মাওবাদী সন্ত্রাসবিরোধী গণপ্রতিরোধ কমিটি মিলিয়ে ৫ জন, কংগ্রেস ১ জন, একজন প্রাক্তন মাওবাদী নেতা এবং ৭ জন সাধারণ মানুষ ।

এই মাওবাদীরা দীর্ঘ ৮ মাস ধরে পুলিশ প্রশাসনকে ঢুকতে দেয়নি লালগড়সহ শালবনী, গোয়ালতোড়ের লাগোয়া অঞ্চলে । গ্রামের পর গ্রামে তারা সশস্ত্র হামলা করেছে । এই হামলা তারা কখনো দিনে বা কখনো রাতের অন্ধকারে করেছে । বন্দুকের নল ঠেকিয়ে অসংখ্য সি. পি. আই. এমের নেতা ও কর্মীকে বাধ্য করেছে দল ছাড়তে । "আমি ধর্ষণকারী দল সি. পি. আই. এম ছাড়লাম" নিজে হাতে পোষ্টার লিখে টাঙিয়ে দিতে হয়েছে । না করলে মৃত্যুদন্ড । এই মাওবাদীরা নির্বিচারে লুণ্ঠক করেছে, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে অথবা অসংখ্য বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে । তাদের এই হামলাবাজী থেকে বাদ যায়নি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে শুরু করে সি. পি. আই. এমের কার্যালয় । যারা সারেন্ডার করেছে মুগুর মার (দেড় হাত লম্বা শক্ত কাঠের খন্ড দিয়ে মেরে শরীর থেঁতলে দেওয়া), গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো, মাটিতে নাক ঘসড়ানোসহ ধার্য হয়েছে বিশাল অঙ্কের জরিমানা । অনেকের ভেঙে দেওয়া হয়েছে শরীরের হাড়গোড়, প্রতিবাদের সমস্ত কণ্ঠ নির্মূল করে বানানো হয়েছে মুক্তাঞ্চল । বসানো হয়েছে চেক পোস্ট । স্থাপন করা হয়েছে ২টি স্থায়ী অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । বহু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বাধ্য করানো হয়েছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে । বানানো হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের বিশাল ভান্ডার । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বন্দুক, এদের অনেকের শরীরের উচ্চতা এবং বন্দুকের দৈর্ঘ সমান । গ্রামভিত্তিক পরিবারের তালিকা করে সবাইকে

ক বাধ্য করা হয়েছে জনসাধারণের কমিটির ডাকা সভায় যোগ দিতে । না গেলে জরিমানাসহ প্রচন্ড প্রহার, এককথায় দেশের মধ্যে আরো একটি দেশ । (তথ্যসূত্র ঃ কী ঘটছে লালগড়ে ?)

এমনকি চার বছরে মাওবাদীদের হামলায় গোটা দেশে প্রায় ৩২০০ মানুষ খুন হয়েছেন । মাওবাদীরা ৫ জন শিক্ষক, ৪ জন কর্মচারী, ১ জন ডাক্তার, ১ জন নার্স, ১ জন ঝুমুর শিল্পী, ১ জন সাঁওতাল শিল্পী, ১ জন ছৌ নাচ শিল্পী, ১ জন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়, ২ জন ভোটকর্মী, ২ জন গাড়ি চালক, ২ জন রেশন ডিলারকে খুন করেছে । এই মাওবাদীরা প্রতি বছর জেলায় ৭ টি সি. পি. সি. সেন্টারে ১৪০ জন আদিবাসী মানুষ প্রশিক্ষণ পান ।

মাওবাদী হিংসার পরিসংখ্যান, রাজ্যওয়াড়ি হিসেব

২০০৮

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৬	১৪	০০	১১	২৫
বিহার	৩৯	১৪	০৪	০১	১৯
ঝাড়খন্ড	১০৬	২৪	০৪	২২	৪০
ছত্তিশগড়	১২৪	২২	১৮	৩২	৭২
মহারাষ্ট্র	২০	০৬	০১	০৫	১২
ওড়িশা	২৭	০৩	১৮	১২	২৩
অন্যান্য রাজ্য	০৫	০০	০০	০১	০১
মোট	৩৪৭	৮৩	৪৫	৭৩	২০২

২০০৭

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩৮	৪৩	০২	৪৫	৯০
বিহার	১৩৫	৪৫	২২	০২	৬৯
ঝাড়খন্ড	৪৮২	১৪৯	০৮	১৩	১৭০
ছত্তিশগড়	৫৮২	১৭১	১৯৮	৬৬	৪৩৫
মহারাষ্ট্র	৯৮	২২	০৩	০৫	৩০
ওড়িশা	৬৭	১৫	০২	০৭	২৪
অন্যান্য রাজ্য	৬৭	১৫	০১	০৩	১৭
মোট	১৫৬৫	৪৬০	২৩৬	১৪১	৮৩৭

২০০৬

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮৩	৩৭	১০	১৩৩	১৮০
বিহার	১০৭	৪০	০৫	০৬	৫১

ঝাড়খন্ড	৩১০	৮১	৪৩	২০	১৪৪
ছত্তিশগড়	৭১৫	৩০৪	৮৪	৭৪	৪৬২
মহারাষ্ট্র	৯৮	৩৯	০৩	১৯	৬১
ওড়িশা	৪৪	০৫	০৪	১৫	২৪
অন্যান্য রাজ্য	৫২	১৫	০৮	০৭	৩০
মোট	১৫০৯	৫২১	১৫৭	২৭৪	৯৫২

২০০৫

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮৩	৩৭	১০	১৩৩	১৮০
বিহার	১০৭	৪০	০৫	০৬	৫১
ঝাড়খন্ড	৩১০	৮১	৪৩	২০	১৪৪
ছত্তিশগড়	৭১৫	৩০৪	৮৪	৭৪	৪৬২
মহারাষ্ট্র	৯৮	৩৯	০৩	১৯	৬১
ওড়িশা	৪৪	০৫	০৪	১৫	২৪
অন্যান্য রাজ্য	৫২	১৫	০৮	০৭	৩০
মোট	১৫০৯	৫২১	১৫৭	২৭৪	৯৫২

২০০৪

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩১০	৬৮	০৬	৪৭	১২১
বিহার	৩২৩	১৬৬	০৫	০১	১৭২
ঝাড়খন্ড	৩৭৯	১২৮	৪১	২০	১৮৯
ছত্তিশগড়	৩৫২	৭৫	০৮	১৫	৯৮
মহারাষ্ট্র	৮৪	০৯	০৬	০২	১৭
ওড়িশা	৩৫	০৪	০৪	০০	০৮
অন্যান্য রাজ্য	৫০	১৬	৩০	০২	৪৮
মোট	১৫৩৩	৪৬৬	১০০	৮৭	৬৫৩

২০০৩

রাজ্য	ঘটনা	নাগরিকদের মৃত্যু	নিরপত্তারক্ষীর মৃত্যু	মাওবাদীদের মৃত্যু	মোট
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫৭৭	১২৭	১২	১৬৩	৩০২
বিহার	২৫০	১০২	২৬	০৯	১৩৭
ঝাড়খন্ড	৩৪২	১০১	১৬	২১	১৩৮
ছত্তিশগড়	২৫৬	৪৪	৩০	০৮	৮২
মহারাষ্ট্র	৭৫	২৩	০৮	০৯	৪০
ওড়িশা	৪৯	০৩	১২	০১	১৬
অন্যান্য রাজ্য	৪৮	১০	০১	০৫	১৬
মোট	১৫৯৭	৪১০	১০৫	২১৬	৭৩১

২০০১ সাল থেকে নিয়ে ২০০৯ সাল পর্যন্ত জনযুদ্ধ মাওবাদীদের দ্বারা খুন হওয়া সি. পি. আই. এম কর্মী, সমর্থকদের নামের তালিকা

তারিখ	স্থান	নাম
২৩ শে জুন ২০০১	গড়বেতা, পঃ মেদিনীপুর	রমজান মল্লিক
২৮ শে জুন ২০০১	গড়বেতা, পঃ মেদিনীপুর	তপন ঘোষ, শাখা সম্পাদক
১০ ই এপ্রিল ২০০১	সারেঙ্গা, বাঁকুড়া	শিবরাম সৎপতি, জোনাল কমিটি সদস্য
২৮ শে নভেম্বর ২০০১	বাঁশপাহাড়ি, পঃ মেদিনীপুর	সুধীর সিং সর্দার, লোকাল কমিটি সদস্য
৪ ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০২	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	অনিল মাহাতো, লোকাল কমিটি সদস্য
১১ ই ফেব্রুয়ারী ২০০২	রানীবাঁধ, বাঁকুড়া	রামপদ মাঝি, লোকাল কমিটি সম্পাদক
৩১ শে মে ২০০২	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	পুঁটিবালা মাহাতো
৩১ শে মে ২০০২	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	ইছামতি মাহাতো
৩১ শে মে ২০০২	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	প্রিয়াঙ্কা মাহাতো (৪ বছর)
৯ জুলাই ২০০২	গোয়ালতোড়, পঃ মেদিনীপুর	আজিত ঘোষ
২৪শে এপ্রিল ২০০২	গড়বেতা, পঃ মেদিনীপুর	গোলাপ মল্লিক
২১ শে অক্টোবর ২০০৩	বাঁশপাহাড়ি, পঃ মেদিনীপুর	বরিদবরন মন্ডল
২ রা মার্চ ২০০৪	সিংবনী, গোয়ালতোড়, পঃ মেদিনীপুর	অসিত সাঁতরা
৯ ই জুলাই ২০০৫	বান্দোয়ান, পুরুলিয়া,	মহেন্দ্র মাহাতো
৯ ই জুলাই ২০০৫	বারিকুল, বাঁকুড়া	রঘুনাথ মুর্মু
৯ ই জুলাই ২০০৫	বারিকুল, বাঁকুড়া	বাবলু মুদি
৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৫	ভোমরাগোড়া, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া	রবীন্দ্রনাথ কর, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৫	ভোমরাগোড়া, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া	আনন্দময়ী কর
৪ ঠা মার্চ ২০০৬	সিজুয়া, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	কার্তিক সিং
৪ ঠা মার্চ ২০০৬	বারিকুল, বাঁকুড়া	গতিলাল টুডু
৮ ই মার্চ ২০০৬	ভুলাভেদা, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	গুমাই মুর্মু
৮ ই মার্চ ২০০৬	ভুলাভেদা, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	জলধর মাহাতো
১৪ ই জুন ২০০৬	বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	রবি দাস
২৬ শে মে ২০০৬	ধরমপুর, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	স্নেহাসিস দাস, লোকাল কমিটির সদস্য
১৯ শে জুন ২০০৬	চাঁদপুর, নদীয়া	উত্তম সর্দার
১৯ শে জুন ২০০৬	চাঁদপুর, নদীয়া	স্বপন সর্দার
১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০৬	শিলদা, পঃ মেদিনীপুর	অনিল মাহাতো, লোকাল কমিটির সদস্য
১৯ শে সেপ্টেম্বর২০০৬	শিলদা, পঃ মেদিনীপুর	দীনেশ বাস্কে
৯ ই জানুয়ারী ২০০৭	ভুলাভেদা, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	প্যালারাম টুডু, লোকাল কমিটির সদস্য
৩০ শে মার্চ ২০০৭	শিলুলপাল, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	রামপদ সিং, লোকাল কমিটির সদস্য
৩০ শে মার্চ ২০০৭	শিলুলপাল, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	পরীক্ষিত সিং, লোকাল কমিটির সদস্য
২৭ শে মে ২০০৭	বেলাটিকরি, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	মানিক মাহাতো
১০ ই জুলাই ২০০৭	কাটাপাহাড়ি, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	রোহিত রায়, শাখা সম্পাদক
১ লা নভেম্বর ২০০৭	বরাবাজার, পুরুলিয়া	ভগীরথ কর্মকার, লোকাল কমিটির সদস্য
২০ নভেম্বর ২০০৭	পুরুলিয়া	সুফল মান্ডি, লোকাল কমিটির সদস্য
৬ ডিসেম্বর ২০০৭	ভুলাভেদা, বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	গোবিন্দ সিং
১ লা জানুয়ারী ২০০৮	মঙ্গলকোট, বর্ধমান	শিবির চ্যাটার্জি, জোনাল কমিটির সদস্য
১ লা জানুয়ারী ২০০৮	বলরামপুর, পুরুলিয়া	পাহালান কুমার
২ রা জানুয়ারী ২০০৮	দইয়েলবাজার, চাপড়া, নদীয়া	রামপদ মন্ডল
১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮	বাঁশপাহাড়ি, পঃ মেদিনীপুর	মঙ্গল মাহাতো

২২ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮	বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	করমচাঁদ সিং, লোকাল কমিটির সদস্য
২৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮	শিমুলবেড়িয়া, বাঁশপাহাড়ি, পঃ মেদিনীপুর	সুভাষ মাহাতো
৯ ই মার্চ ২০০৮	সিঁজুয়া, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	বুদ্ধদেব পাঠক, ডি ওয়াই এফ আই
১৩ ই এপ্রিল ২০০৮	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	মুকুল তেওয়ারি, শাখা সম্পাদক
১৩ ই এপ্রিল ২০০৮	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	যুগল মুর্মু
১৩ ই এপ্রিল ২০০৮	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	নবকুমার মুর্মু
১৯ ই এপ্রিল ২০০৮	আরশা, পুরুলিয়া	ক্ষেত্রপাল মাঝি, লোকাল কমিটির সম্পাদক
২২ ই এপ্রিল ২০০৮	খয়রাশোল, বীরভূম	শ্রীরাম দাস
৪ ঠা মে ২০০৮	বান্দোয়ান, পুরুলিয়া	গণপতি ভদ্র, জোলাল কমিটির সদস
৫ ঠা মে ২০০৮	বলরামপুর, পুরুলিয়া	দেবরাজ হেমব্রম
১৫ ই জুন ২০০৮	গোয়ালতোড়, পঃ মেদিনীপুর	বিশ্বনাথ মান্ডি, জোনাল কমিটির সদস্য
৬ ই আগষ্ট ২০০৮	কেন্দেমারী, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর	নিরঞ্জন মন্ডল, লোকাল কমিটির সদস্য
৭ ই আগষ্ট ২০০৮	গাড়ুপাড়া, পূর্ব মেদিনীপুর	দুলাল গাড়ু দাস
২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮	খয়রাশোল, বীরভূম	নন্দলাল মিস্ত্রি, জোনাল কমিটির সদস্য
৩১ শে অক্টোবর ২০০৮	বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	ইন্দ্রজিৎ মুড়া
১ লা ফেব্রুয়ারী ২০০৮	মুড়ার, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	নন্দলাল পাল, জোনাল কমিটির সদস্য
৩ রা ফেব্রুয়ারী ২০০৮	গিড়ুয়া, বলরামপুর, পুরুলিয়া	হরাধন মাঝি, জোনাল কমিটির সদস্য
৮ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮	রাজাকাটা, রানীবাঁধ, বাঁকুড়া	বিশ্বনাথ দিগার
১৩ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮	ধরমপুর, লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	সুজিত পান্ডা, যুব সংগঠনের শাখা সম্পাদক
১১ ই মার্চ ২০০৮	জয়পুর, বাঁকুড়া	সৈয়দ আলি ভুঁইয়া, জোনাল কমিটির সদস্য
১৮ ই মার্চ ২০০৮	ভুলাভেদা, পঃ মেদিনীপুর	দুর্গা দেশোয়ালী, লোকাল কমিটির সদস্য
১৮ ই মার্চ ২০০৮	ভুলাভেদা, পঃ মেদিনীপুর	সন্তোষ মাহাতো
২৮ ই মার্চ ২০০৮	আরশা, পুরুলিয়া	কানাই কুমার
১০ ই এপ্রিল ২০০৯	ভুলাভেদা, পঃ মেদিনীপুর	অসীম মন্ডল
২১ শে এপ্রিল ২০০৯	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	হাম্বির মান্ডি
২১ শে এপ্রিল ২০০৯	শালবনী, পঃ মেদিনীপুর	শক্তি সেন
২২ শে এপ্রিল ২০০৯	লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	গোপীনাথ মুর্মু
২৩ শে এপ্রিল ২০০৯	সুপুরড়ি, পুরুলিয়া	বৈকুণ্ঠ মাহাতো, জোনাল কমিটির সদস্য
২৩ শে এপ্রিল ২০০৯	সুপুরড়ি, পুরুলিয়া	বিভূতি সিং সর্দার, লোকাল কমিটির সদস্য
১৫ ই মে ২০০৯	বান্দোয়ান, পুরুলিয়া	মানু সিং, স্থানীয় যুবনেতা
২৩ শে মে ২০০৯	বলরামপুর, পুরুলিয়া	দীনেশ মাহাতো, জোনাল কমিটির সদস্য
৬ ই জুন ২০০৯	বিনপুর, পঃ মেদিনীপুর	মামনি কিসকু
১১ ই জুন ২০০৯	লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	সালকো সোরেন
১৩ ই জুন ২০০৯	বেলপাহাড়ী, পঃ মেদিনীপুর	শঙ্কর টুডু
১৪ ই জুন ২০০৯	লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	অসিত সামন্ত, শাখা সম্পাদক
১৪ ই জুন ২০০৯	লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	নাড়ু সামন্ত
১৪ ই জুন ২০০৯	লালগড়, পঃ মেদিনীপুর	প্রবীর মাহাতো, স্থানীয় যুবনেতা
১৭ ই জুন ২০০৯	লোধাগুলি, পঃ মেদিনীপুর	নীলাদ্রি মাহাতো
১৭ ই জুন ২০০৯	লোধাগুলি, পঃ মেদিনীপুর	অনিল মাহাতো, শাখা সম্পাদক
১৭ ই জুন ২০০৯	লোধাগুলি, পঃ মেদিনীপুর	অভিজিত মাহাতো, স্থানীয় ছাত্রনেতা

(তথ্যসূত্র ঃ কী ঘটছে লালগড়ে ? - বিমান বসু)

সুতরাং এই পরিসংখ্যান দেখেই বোঝা যায় মাওবাদীরা কত মানুষ খুন করেছে । তাহলে আসুন এই মাওবাদীরা যে মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষা করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোলে খতম করি ।

বাবা সত্যলোক রামপালের কান্ডকারখানা

এই কয়েকদিন আগেকার কথা । হরিয়ানার সত্যলোক আশ্রমের বাবা রামপালকে নিয়ে যে কান্ডকারখানা হল তা সারা দেশই জানে । কবীরপন্থী বাবার রহস্য আজ ফাঁস হয়ে গেছে । পুলিশের খানাতল্লাসীতে তাঁর আশ্রমে যা যা পাওয়া গেছে তাতে যে কোন মানুষের চোখ কলালে উঠে যাবে । তাহলে শুনুন দেশদ্রোহী বাবা কান্ডকারখানা,

দেশদ্রোহী এবং হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কবীরপন্থী বাবা রামপালের বরবালায় (হিসার/হরিয়ানা) অবস্থিত সত্যলোক আশ্রমে মহিলা টয়লেটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে । ক্যামেরার মুখও টয়লেটের মুখে লাগানো আছে । কমপক্ষে ৬০ ঘন্টার ঘেরাবন্দী এবং ৪৫,০০০ সেনার বলপ্রয়োগের পরে ১৯ নভেম্বর ২০১৪ সত্যলোক আশ্রম থেকে রামপালকে গ্রেফতার করে পুলিশ আশ্রমে অভিযান চালায় । খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাবা রামপাল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের আদেশ অমান্যকারী বাবা রামপালের আশ্রমে চকিত করার মতো জিনিসপত্র পাওয়া যায় । বাবা রামপালের আশ্রমে কন্ডোম, মহিলা টয়লেটে গোপন ক্যামেরা, নেশাজাতীয় ঔষধ, অজ্ঞান করার গ্যাস এবং আপত্তিজনক অশ্লীল সাহিত্য ।

বাবা রামপালের আশ্রমে মহিলাদের উপর বিশেষভাবে নযর রাখা হত । আশ্রমের সদর দরজার পাশে অবস্থিত মহিলা টয়লেটের বাইরে লাগানো ক্যামেরার মুখ টয়লেটের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে ।

আশ্রমে অবস্থিত মহিলারা একথাও বলেছেন যে বাবা রামপালের কমান্ডোরা বন্দী বানিয়ে মহিলাদেরকে ধর্ষন করত । প্রতিবাদ করতে গেলে পরনের কাপড় কেড়ে নেওয়া হত এবং উলঙ্গ করে রাখা হত । এমন জায়গায় মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হতো যে চিৎকার করলে কেউ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেত না । যেসব মহিলা বাবা রামপালের কাছে ওষুধ নিতে আসত সেসব মহিলাদেকে ধর্ষন করা হত ।

আশ্রমের একজন মহিলা বলেন যে আগের দিন তাঁকে ধর্ষন করা হয় । এই মহিলা আরও বলেন যে তিনি তাঁর স্বামী এবং সন্তানের সঙ্গে আশ্রম এসেছিলেন কিন্তু পাঁচ দিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোনরকমের যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি ।

এই ভন্ড সাধু বাবা রামপাল দুধ দিয়ে স্নান করতেন এবং তাঁর এই স্নান করা দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে প্রসাদ হিসাবে ভক্তদের মধ্যে বন্টন করা হতো । অনুগামীদেরকে বলা হতো এই ক্ষীর তাদের জীবনে মিষ্টতা নিয়ে আসবে ।

এন. এস. জি. এবং এস. পি. জি. থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা বাবা রামপালের সুরক্ষাকর্মী ছিল । হরিয়ানা পুলিশের দাবী অনুযায়ী বাবা রামপালের কম করে ৩০০ বডিগার্ডদেরকে আর্মী এবং পুলিশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা ট্রেনিং দিত । যারা ট্রেনিং দিত তাদের মধ্যে কেউ স্পেশাল প্রোটেকশান গ্রুপ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড প্রভৃতি লোকেরা

ছিল । রামপালের ফৌজিরা ২৫ থেকে ৩৫ বছরের লোকেরাই ছিল তাদের কাছে পাওয়াইন্ট ৩১৫ বোর এবং পাওয়াইন্ট ৩২ বোর এবং পিস্তল ছিল । এছাড়াও মনোটভ ও ককলেট প্রভৃতি অস্ত্র পাওয়া যায় ।

এই বাবা রামপাল আশ্রমের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করে রেখেছিলেন । বাবা রামপাল এই সুড়ঙ্গের লিফটের মাধ্যমে হঠাৎ আবির্ভাব হতেন । এবং সেখানে সমস্ত অত্যাধুনিক সুবিধা রয়েছে । আশ্রমে খানা তল্লাসী চালানোর সময় ৩০ কেজি সোনা পাওয়া যায় । এই সোনাগুলি অধিকাংশ মহিলাদের মঙ্গলসূত্র কিংবা গহনা । আশ্রমে নোটভর্তী বস্তা পাওয়া যায় এবং ১৭ বস্তা সিক্কা পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে বিদেশী মদের বোতলও পাওয়া যায় ।
(তথ্যসূত্র ঃ http://m.bhaskar.com/news/edreferer/521/HAR-HIS-condoms-and-explicit-material-found-in-godman-rampal-ashram-4813357-NOR.html?referrer_url=http%3A%2Flm.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bhaskar.com%252Fnews-ht252FHA-HIS--condoms-and-explicit-material-found-in-godman-rampal-ashram-4813357-NOR.html%26h%3DuAQEWRAbe%26enc%3DZN5INgGPfDMS7OvN6KAp8MOOeMApkhtUr-gUdO98SB5O_K_wuegcq-yv_C49kHwq23QzKkf9E1PySTgLm2TUPwCiFCWgyP43kDfyk47_lyDd3JtvFEt6k_-OBnw170SCAjU98Siv%26s%3D1)

এছাড়াও ফরেন্সিক টিম আশ্রমে ২টি বিস্ফোটক বোম, ২৬টি এয়ার গান এবং রাইফেম পান । যেগুলোকে পুলিশ কব্জায় করে নেয় । এই হাতিয়ারগুলোকে বাবা রামপাল গদীর নিচে বেসমেন্টে লুকিয়ে রেখেছিলেন । এছাড়াও কয়েক হাজার লাঠি, শিল্ড, গুল্টি, পেট্রোম বোম, অ্যাসিড পাউচ এবং ব্ল্যাক ড্রেসও পাওয়া যায় । দেখে মনে হয় বাবা রামপাল নিজের ফোর্স বাড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ।

বাবা রামপালের আশ্রমে বড় বড় মাচা তৈরী করা হয়েছে । সেই মাচার উপর গদীর আসে পাশে রাখা আছে পেট্রোল বোমা, অ্যাসিড এবং পাথরভর্তী বালতির গুল্টি অর্থাৎ মৃত্যুর সমস্ত সামান সেখানে রয়েছে যার দ্বারা হামলা করা যেতে পারে, মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে । হিন্দু ধর্মে যে আশ্রমকে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলনের স্থান বলা হয় সেখানে মরণের এরকম সামগ্রী রয়েছে ভাবতেও অবাক লাগে ।

এই বাবা রামপালের আশ্রমে রয়েছে একটি বিশেষ দরজা । আশ্রমের মেন গেট অর্থাৎ যে গেটে লোক যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে সেই গেটের কিছু দুরে রয়েছে সাইন বোর্ড যেখানে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেক ভক্তকে নিজের তল্লাসী দিতে হত । সেখানে এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়েছে যে সাধারণ ভক্তরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না । কেল্লার অভেদ্য দরজার মতো একটা লোহার দরজা আশ্রমটি দুভাবে বিভক্ত হয়েছে । সেখানে সাধারণ ভক্তের প্রবেশের অনুমতি নেই ।

এই বাবা রামপালের লিভিং রুমের সঙ্গে সুইমিং পুলও রয়েছে । যেখানে বাবা রামপাল ভজন প্রবচনের পর ক্লান্ত ও অবসাদ দুর করার জন্য সাঁতার কাটতেন । এই পুলের পাশেই রয়েছে বিশাল পালঙ্ক, মাখমলের গদী, শানদার সোফা, দান চড়াবার জন্য লক্ষ রকমের ইলেট্রনিক বাক্স প্যাটেরা । আশ্রমের মধ্যে বাবা রামপালের এক্সক্লুসিভ বাথরুম এতই আলীশান যে দর্শক আশ্চর্য হয়ে যাবে ।

এই রামপালের জন্য বলা হচ্ছে তিনি ১৪ বছর আগে সরকারের একজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । এছাড়া তিনি একটি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ এবং মার্সেটিজ গাড়ির মালিক । বাবা রামপাল আশ্রমে রয়েছে স্পিড এয়ার কন্ডিশনার বিলাসবহুল কামরা, ফ্ল্যাট স্ক্রিন ও একাধিক টিভি এবং একটি ম্যাসেজ বেডও আছে । আশ্রমের ভিতর রয়েছে একটি লাইব্রেরী এবং একটি হাসপাতালও রয়েছে । এছাড়াও এলইডি পর্দার একটি বড় আকারের হলঘর রয়েছে ।

এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে গুপ্ত রাস্তা । এই গুপ্ত রাস্তার পঞ্চম তলার সেই প্রাইভেট ফ্লোর পর্যন্ত গেছে যেখানে বাবা রামপাল ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারেন না । বাবা রামপাল লোকেদেরকে বিলাসীতাহীন জীবন যাপনের কথা বলতেন সে বাবা রামপলের আশ্রমে এমন এমন দ্রব্য পাওয়া গেছে যা দেখলেই মানুষ চকিত না হয়ে থাকতে পারে না । বাবা রামপালের আশ্রমে যখন পুলিশ খানা তল্লাসী শুরু করে তখন আশ্রমের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর ওষুধও পাওয়া যায় । সম্ভবত বাবা এইসব ওষুধ ব্যাবহার করতেন ।

বাবা রামপালের আশ্রমে আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্য বিরাট হলঘর রয়েছে যেখানে একসঙ্গে হাজার লোকের শয়ন করার এবং বসার ব্যাবস্থা করা আছে এবং সেই হলঘরের পাশেই রয়েছে বিরাট রান্নাঘর । সেই রান্নাঘর এতোই বড়ো যে যেখানে প্রতিদিন হাজার লোকের খাবারের ব্যাবস্থা করা হয় ।

জেলের সঙ্গে বাবা রামপালের সম্পর্ক অনেক পুরাতন । ২০০৬ সালে তিনি একবার মার্ডার কেসের জন্য জেলে যান । তারপর তিনি নানা কৌশল বের করে নিজেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচান । কিন্তু এইবার রামপাল নতুন নাটকীয়তা করার জন্য তার উপর মারাত্মক ১৯ টি ধারা লাগানো হয়েছে যাতে বাবা রামপালে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সঙ্গে ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে । আদালতকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বাবা রামপাল যা জঘন্য চালবাজী করেছেন তাতে তাঁর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে এবং তাঁর অর্ধেক সম্পত্তিও হারাতে পারেন ।

রামপালের উপর এইবার এমন এমন আইনী ধারা লাগানো হয়েছে যাতে রামপালের কৌশলের সমস্ত পথ বন্ধ । পুলিশ রামপালের এবং তাঁর প্রবক্তা, আশ্রম কমিটি ও অনুসারীদের উপর দেশদ্রোহীর মতো ১৯ টি ধারার ভিত্তিতে চার্জসীট তৈরী করেন । যে যে ধারা বাবা রামপালের উপর লাগানো হয়েছে তা হল, ১) ধারা - ১২০, এই ধারা সামাজিক অপরাধের চক্রান্ত । ২) ধারা - ১২১, এই ধারায় দেশদ্রোহীতার অভিযোগ করা হয়েছে যাতে রামপালের

যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে । ৩) ধারা - ১২১, এই ধারায় দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে যাতে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । ৪) ধারা - ১২২, এই ধারায় যুদ্ধ করার মানসিকতায় অস্ত্রশস্ত্র জমা করার অভিযোগ রয়েছে যাতে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে এছাড়া হত্যা করার চেষ্টা অভিযোগও রয়েছে । ৫) ধারা ১২৩, এই ধারায় দশ বছরের কারাদন্ড থেকে শুরু করে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । ৬) ধারা - ৪২৬, এই ধারায় আগযানী করা এই ধারায় দশ বছরের কারাদন্ড থেকে শুরু করে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । এই ধারাগুলি ছাড়াও যে সরকারী ডিউটিতে বাধা পৌঁছানো এবং অপরাধের ষড়যন্ত্র করা অভিযোগও রামপালের উপর আছে । এই অপরাধ যদি প্রমাণ হয় তাহলে রামপালের সারা জীবন জেলের পোড়া রুটি তো তাকে খেতেই হবে বরং ফাঁসীও হতে পারে । শুধু তাই নয় বাবা রামপালকে ৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপুরণও দিতে হতে পারে । হাইকোর্ট আগেই বলে দিয়েছে বাবা রামপালকে গ্রেফতার করার জন্য ৬০ ঘন্টার ঘেরাবন্দী এবং ৪৫,০০০ সেনাকে মোতায়েন করার জন্য সরকারের যে খরচা হয়েছে তাও বাবা রামপালের সম্পত্তি থেকে উসুল করা হবে । অর্থাৎ যদি জরিমানা লাগে তাহলে বাবা রামপালের অর্ধেক সম্পত্তি তো খতম হয়ে যাবে ।

(তথ্যসূত্র ঃ http://m.aajtak.in/story.jsp?sid=788366)

এই বাবা রামপালকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তাঁর ১৮০০০ অনুসারী পুলিশের সামনে সারেন্ডার করেন । পুলিশ রামপালের ছেলে, ভাই এবং প্রবক্তা রাজকাপুরসহ ১৫০ জন অনুসারীকে গ্রফতার করে । গ্রেফতার করার সময় পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা করার সময় যাঁরা মারা যান তাঁরা হলেন রোহতাকের ভগবতীপুর নিবাসী সন্তোষ (৪৫), দিল্লী নিবাসী সবিতা (৩১), বিজনৌর নিবাসী রাজবালা (৭০), পাঞ্জাব নিবাসী মলকিত কৌর (৫০), রজনী (২০) এবং দেড় বছরের একজন শিশু ।

আশ্রমটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল

পুলিশ যত অভিযান চালায় বাবা রামপালের রহস্য ততই ফাঁস হতে থাকে জানা যায় রামপালের আশ্রমটি নির্মান হয়েছিল অবৈধভাবে । জেলা অফিস থেকে ১২ কিলোমিটার দুরে রোহতাক ঝাজ্জর রোডে করৌথা নামক স্থানে বাবা রামপালের 'সত্যলোক' আশ্রমটি আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বানানো হয়েছিল ।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭১ এ এই আশ্রম কৃষি জমির উপর নির্মাণ করা হয় । আশ্রম নির্মানের জন্য কোন অনুমোদনও নেওয়া হয়নি । প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদের আখড়া এই আশ্রমকে নির্মান করা হয় আর সরকারী অফিসাররা কোথায় যেন ঘুমিয়ে ছিলেন । এই আশ্রমটির সম্পত্তি নিয়েও কোর্টে মামলা চলছে ।

সন্ত রামপালের গ্রেফতারীকে নিয়ে হাঙ্গামা যদিও বারবালাতে অবস্থিত সত্যলোক আশ্রমে হয়েছিল কিন্তু পুরো মামলার সূত্র করৌথা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত । ১৯৯৯ সালে এই আশ্রম নির্মানের সময় প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েক লাখ টাকার রাজস্ব হড়প করা হয় ।

৫/৬ বছর আগে ১২ একর জমি নিয়ে নির্মিত এই আশ্রম সম্পূর্ণ অবৈধ। এর কোন নক্সা পাশ নেই। ২০০৬ সালে রোহতাকের করৌথায় হাঙ্গামা হওয়ার তি বছর পর বারবালাতে ১২ একর জমিনে এই 'সত্যলোক' আশ্রম নির্মান করা হয়।

আশ্রমটি ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। ন্যাশনাল হাইওয়ের ২৫ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত কোন কিছু নির্মান আইন বিরুদ্ধ। এইভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ের স্যাডিউল্ড রোড অ্যাক্ট এবং আইনেরও অবমাননা করা হয়েছে।

করৌথা আশ্রমের জমি নিয়ে ধোকাবাজীর মামলার ব্যাপারে আর্য সমাজের উকিল অ্যাডভোকেট নরেন্দ্র কাটারিয়া বলেন যে, আশ্রম নির্মানের সময় নিয়ম কানুন অমান্য করা হয়। কয়েকবার প্রশাসন ও সরকারের তরফ থেকে করা হয় কিন্তু কোনো ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি। কৃষিজমিকে অন্য কাজে লাগাবার জন্য CLU (Change of Land use) আবশ্যিক এবং নর্মান বিকাশ শুল্ক জমা করাও আবশ্যিক কিন্তু বাবা রামপাল আশ্রম নির্মানের জন্য তিনি CLU নেন নি এবং নক্সা পাশও করান নি। অর্থাৎ তাঁর এই আশ্রমটি সম্পূর্ণ অবৈধ।

রামপাল যদি মুসলমান হতেন তাহলে কি হত ?

একটু চিন্তা করুন সন্ত রামপাল যদি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতেন তাহলে কি হত ? রামপালের আশ্রমে এত পরিমান অস্ত্রের ভান্ডার মওজুদ থাকার কারনে তাকে এতদিনে ইরাকের ISIS (Islamic State Iraq And Siriya) এর এজেন্ট বলে প্রচার করা হত বা ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা বা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের তালিবান বা মুহাম্মাদ মাসউদ আযহারের জৈশ-এ-মুহাম্মাদ বা হাফিয সয়ীদের লস্করে তাইয়েবা অথবা হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল মুজাহিদ, জামাআতুল মুজাহিদ, ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন, সিমির এজেন্ট বলে ভারতীয় ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া শোরগোল শুরু করে দিত।

এতদিনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA (National Investigation Agency) সারা দেশের শ' পাঁচেক মুসলমান যুবককে গ্রেফতার করে তদন্তের নামে প্রহসন শুরু করে দিত। যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রমান না পাওয়া যেত তাহলে I.B (Intelligence Burou) দ্বারা যা অধিকাংশ ব্রাম্ভন্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত এবং আর. এস. এস এর চেয়েও কট্টর হিন্দুত্ববাদী তাদের দিয়ে মনগড়া বানানো প্রমান তৈরী করে মুসলমান যুবকদের ফাঁসানো হত যাতে ইসলাম ধর্মকে বদনাম করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো যায়।

রামপালের জায়গায় যদি মুসলমান হতেন তাহলে এতদিনে সারা দেশে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেত এবং রামপালের সম্পর্ক সিমি বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের সাথে যুক্ত করে শত শত ভারতীয় মুসলমানকে সাজানো এনকাউন্টারে হত্যা করা হত। কিন্তু তা আর হল না কেননা তিনি যে রামপাল, আজমল আমির কাসাব তো নন।

আসারাম বাপু

২০১৩ সালে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি বাবা আসারাম বাপুর নামে নাবালিকা মেয়ের উপর যৌন শোষন করার মুকাদ্দামা (মামলা) করা হয় । ১৬ বছরের পীড়িত বালিকা অভিযোগ করে যে তাকে ভূত ছাড়াবার নাম করে আসারাম তার উপর যৌন শোষন চালায় । মামলা করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যখন আসারাম বাপুকে ডাকা হয় তখন তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে আরম্ভ করেন । তিনি তাঁর ইন্দোরের আশ্রমে লুকিয়ে থাকেন । আশ্রমের বাইরে তাঁর সমর্থকরা মিডিয়া এবং পুলিশের উপর হামলা শুরু করে ।

এইভাবে কয়েকদিন ছলচাতুরির পর যোধপুর পুলিশ আসারাম বাপুকে ২০১৩ সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে গ্রেফতার করে । তিনি বলেন, কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীর ইশারায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতীয় জনতা পার্টী বিজয়ী হওয়ার পর তিনি বলেন, এখন ভালো দিন এসেছে । যদিও এখনও তাঁকে জামানত দেওয়া হয়নি । সুপ্রিম কোর্টও তাঁর জামানতের আবেদন খারিজ করে দেয় । বাবাজীবন আপাতত এখন জেলে আছেন ।

স্বামী নিত্যানন্দ

কর্ণাটকের সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সয়ম্ভু বাবা স্বামী নিত্যানন্দের উপরও যৌন শোষনের অভিযোগের মামলা চলছে । ২০১০ সালে একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছিলো যেখানে স্বামী নিত্যানন্দ একজন মহিলার সঙ্গে আপত্তিজনক ও সন্দেহজনকভাবে ছিলেন । এই ভিডিয়ো ক্লিপের প্রসারণ সান টিভি (Sun TV) করেছিল । এই চ্যানেলের দাবী যে, যে মহিলার সঙ্গে স্বামী নিত্যানন্দ আপত্তিজনকভাবে ছিলেন সেই মহিলাটি তামিল অভিনেত্রী রঞ্জিতা । পুলিশ এই ভন্ড বাবা স্বামী নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা চালায় । এই জঙ্গি স্বামী নিত্যানন্দও গ্রেফতারের ৪৯ দিন আগে পর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিতে থাকেন । তাকে ২১ এপ্রিল ২০১০ সালে হিমাচল প্রদেশ থেকে গ্রফতার করা হয় ।

বাবা চন্দ্রস্বামী

বাবা চন্দ্রস্বামীর হিন্দুদের বিখ্যাত সাধুবাবা ছিলেন । বাবা চন্দ্রস্বামীর সঙ্গে একাধিক রাজনীতিবিদদের সাথে উঠাবসা ছিল । তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তিনি কত উঁচু মানের সাধুবাবা ছিলেন । অর্থাৎ তিনি হিন্দুদের মধ্যে খুব প্রভাবশালী সাধু বলে পরিচিত ছিলেন । প্রাক্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যায় তাঁর যোগসূত্র ছিল বলে ১৯৯৮ সালে এম. সি জৈন রিপোর্টে দাবী করা হয় । আয়কর বিভাগ তাঁর আশ্রমে হানা দিলে একাধিক অস্ত্র ব্যাবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রমান পাওয়া যায় ।

বাবা ধীরেন ব্রম্ভচারী

বাবা ধীরেন ব্রম্ভচারী হিন্দুদের বিখ্যাত সাধুবাবা ছিলেন এবং তিনি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যোগগুরু ছিলেন । অর্থাৎ তিনি একজন বড় মাপের সাধুবাবা ছিলেন । ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ধরণ নিয়ে সেই সময় সারা দেশ তোলপাড় হয় । তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৯৪ সালে । মৃত্যুর পর তাঁর একাধিক সম্পত্তি বেআইনী বলে সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষনা করে এবং তাঁর সম্পত্তি দখল করে ।

গুরমিত রাম রহিম সিং

বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং ডেরা সাচ্চা সাওদা গোষ্টির প্রধান গুরু । তিনি হিন্দুদের বিখ্যাত সাধু নামে পরিচিত । সিরসায় গোষ্ঠীর সদর দফতরে মহিলা ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । এমনকি দুইজন সাংবাদিকের হত্যার অভিযোগও তাঁর নামে রয়েছে ।

স্বামী প্রেমানন্দ

দক্ষিনের তিরুচিরাপল্লী আশ্রমের স্বামী প্রেমানন্দও হিন্দুদের কম খ্যাতনামা সাধুবাবা নন । তিরুচিরাপল্লী আশ্রমের এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ১৩ জন মহিলাকে ধর্ষনের প্রমাণ পাওয়া যায় । শ্রীলঙ্কার এক নাগরিককে হত্যার মামলাও তাঁর উপর চাপে ।

স্বামী সদাচারী

স্বামী সদাচারী হিন্দুদের মধ্যে একসময় প্রচন্ড প্রভাবশালী সাধুবাবা ছিলেন । কিন্তু রাজনীতিতে পদার্পন করার জন্য তাঁর প্রভাব ক্রমে ক্ষুন্ন হয় । যৌনপল্লী (বেশ্যাখানা) চালানোর অপরাধে তিনি আপাতত এখন জেলে আছেন ।

স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ

চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ একজন প্রভাবশালী ধর্মগুরু । ১৯৯৭ সালে দেহব্যাবসা চালানোর অপরাধে তিনি লাজপত নগর থেকে গ্রেফতার হন । জেল থেকে বেরিয়ে নিজেকা সাঁই বাবার শিষ্য বলে পরিচয় দেন এবং এখন প্রভাবশালী ধর্মগুরুতে পরিনত হন ।

মহাঋষি মহেশ যোগী

বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী একনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মগুরু বলে পরিচিত । দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় তাঁর আশ্রম রয়েছে । তিনি মহিলাভক্তদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং টাকা পয়সা নিয়ে নানা কেলেঙ্কারীতেও জড়িয়ে পড়েন ।

রজনীশ

ওশো রজনীশ রাজনীতি, ধর্ম, যৌনতাসহ নানা বিষয়ে ছকভাঙা মতামতের জন্য বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন । আশির দশকে আমেরিকায় অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়ম এড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন । তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেন । চিন্তা করুন হিন্দুদের ঈশ্বরও গ্রেফতার হন তাও আবার আমেরিকার হাতে । অর্থাৎ হিন্দুদের ঈশ্বরের থেকে আমেরিকার ক্ষমতা বেশী ।

সন্ত রামপাল, আসারাম বাপু, নিত্যানন্দ, চন্দ্রস্বামীর, ধীরেন ব্রম্ভচারী, বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সদাচারী, চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ, বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী, ওশো রজনীশ প্রভৃতিরা এত কান্ড করা সত্যেও তাদেরকে মিডিয়া সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করে না । তাদের আশ্রমে এত পরিমান অস্ত্র মওজুদ থাকা সত্যেও আশ্রমগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলা হল না অথচ মাদ্রাসায় আজ পর্যন্ত কোন হাতিয়ার পাওয়া যায়নি তবুও ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে । কারণ একটাই অধিকাংশ মিডিয়াই সন্ত রামপাল, আসারাম বাপু, নিত্যানন্দ, চন্দ্রস্বামীর, ধীরেন ব্রম্ভচারী, বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সদাচারী, চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ, বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী, ওশো রজনীশ প্রভৃতিদের ভক্ত ।

এর আগে এইসব ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়াই ওইসব গুরুদের প্রবচন সরাসরী প্রসারন করেছে । তাহলে রামপালের মতো ব্যক্তিদেরকে সন্ত্রাসবাদী বললে যে তাদের হাঁড়ি খোলা মাঠে ভেঙে যাবে ।

মিডিয়া সন্ত্রাস

ভারতে বা পৃথিবীর যে কোন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ হলে বা যে কোন সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে মিডিয়া প্রথমে স্থানীয় মুসলমান সংগঠনকে দায়ী করে । এবং পত্রিকা হলে তার প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইনে বড় বড় করে ছেপে প্রচার করে দেয় যে এই বিস্ফোরণের জন্য অমুক অমুক মুসলিম সংগঠন দায়ী । পরবর্তীকালে যখন প্রমান হয় যে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য মুসলমানরা দায়ী নয় তখন মিডিয়া সেটা আর প্রচার করে না । যদিও কোন মিডিয়া প্রচার করেও থাকে তবুও সেটা ভিতরের পাতায় ক্ষুদ্রায়তনে । কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ মিডিয়া কট্টর হিন্দুত্ববাদী বা ব্রাম্ভন্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত । এবং প্রায় সকলেই ইসলাম বিদ্বেষী । ইসলামের নাম শুনলে তাদের গায়ে জ্বালা ধরে যায় । সেজন্য সাধারণ হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য যে কোন সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য তারা মুসলমানদেরকেই দায়ী করে যাতে হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের চক্রান্ত সফল হয় ।

উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যখন আহমদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখন আমাদের দেশের ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া প্রচার করে যে এই হামলার জন্য মুসলমান সংগঠন দায়ী । যেমন,

যখন ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাইয়ে ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখন মিডিয়া প্রচার করে যে এই বিস্ফোরণ মুসলমানরাই করেছে । যেমন,

১) প্রথম দিন আই. বি. এটা সুনিশ্চিত করে যে সিমির কর্মচারীরা এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী । (আফটারনুন, মুম্বাই, ১২ জুলাই, ২০০৬)

২) পুলিশের লস্কর এ তাইয়েবা এবং সিমির উপর সন্দেহ আছে । (মিড ডে, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

৩) বিস্ফোরণের যুক্ত জঙ্গী রাহিল, ফৈয়াজ কাগজী এবং জৈনুদ্দীনকে চিহ্নিত করা হয়েছে । (মিড ডে, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

৪) নেপাল পুলিশ কাঠমান্ডু থেকে চারজন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করে । (রেডিফ ডট কম, ১২ জুলাই ২০০৬)

৫) পুলিশ হায়দ্রাবাদ থেকে সিমির তিনজন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে । (এশিয়ান এজ, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

'দ্য হিন্দু' পত্রিকার ২৭ জুলাই ২০০৮ সালের সংখ্যায় লেখা হয়, "পুলিশ এই হত্যাকান্ডে সিমির 'স্লিপার সেল' এর হাত বলে মনে করে ।"

'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার পুনা'র ২৮ জুলাই ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশ পায়, "সিমির এক তথাকথিত সক্রিয় কর্মচারী আব্দুল হালিম, যার তল্লাসী ২০০২ সালের গোধরার কান্ডের পরে দাঙ্গার ব্যাপারে করা হচ্ছিল । সে দাঙ্গার পরে খোলামেলা ঘুরছিল ।"

যখন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখনও মুসলমানদেরকেই দায়ী করা হয় । যেমন,

১) নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি অথবা লস্কর এ তাইয়েবার মিলিত সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন' মিডিয়াকে বিস্ফোরণের সময় ই-মেইলের মাধ্যমে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে । (সান্ডে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

২) গুজরাট পুলিশের একজন অধিকারী বলেন যে সিমির কর্মচারী কিয়ামুদ্দীন, যাকে আহমদাবাদ সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণের জন্য খোঁজা হচ্ছে সে দিল্লীর বিস্ফোরণের জন্য দায়ী

হতে পারে এবং তার সঙ্গে আব্দুল সুভান ওরফে তৌকিরও যুক্ত আছে । (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, সকাল, পুনা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৩) সুভান, যে মুম্বাইয়ের একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কাজ করত সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত ভাবে সিমির সঙ্গে যুক্ত হয় । গুজরাট পুলিশের কথা অনুযায়ী সে বোমা বানানো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখত । (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, সকাল, পুনা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

উত্তর প্রদেশের আদালতে যখন বোমা বিস্ফোরণ হয় তখনও মুসলমান সংগঠনকে দায়ী করা হয় । যেমন,

১) ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সন্দেহ যে হুজি (HUJI) বা হরকাতুল জিহাদের কর্মচারী গুরু (আফজল গুরু) এই বিস্ফোরণের চক্রান্ত করে যে LET বা লস্কর এ তাইয়েবার স্লিপার সেলস আল কায়দা ফিল হিন্দ (ভারতের আল কায়দা) নামে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । যেরকম গুরুর ই-মেইল আইডি থেকে বিস্ফোরণ হবার কিছু আগে এই ব্যাপারে হুমকি সংবাদপত্রকে দেওয়া হয় । (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)

২) ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কথা অনুযায়ী গুরুর নাম সর্বপ্রথম হুজির (HUJI/ Harkat ul jihad e Islami) ভারতের প্রধান বাবু ভাইয়ের ইন্টোগেশনে সামনে আসে, যাকে উত্তর প্রদেশ পুলিশের এস টি এফ আগের বছর জুন মাসে গ্রেফতার করেছিল । বাবু ভাই সেই সময় বলেছিলেন সে গুরুকে ২০ কিলোগ্রাম আর ডি এক্স আগস্ট - সেপ্টম্বর মাসে দিয়েছিল । (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)

জয়পুরে যখন ১৩ মে ২০০৮ সালে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখনও মুসলমান সংগঠনকে দায়ী করা হয় । যেমন,

১) নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী এতে বিদেশীদের হাত থাকার কথা অনুমান করা হচ্ছে । (সকাল, পুনা, ১৪ মে ২০০৮)

২) সুত্র অনুযায়ী আর ডি এক্স হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষাহীন অঞ্চল থেকে আবা হয়েছে । (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১৫ মে ২০০৮)

তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরন হওয়া পরেই মুসলামানদেরকে দায়ী করা হচ্ছে কিন্তু এখন এটা প্রমান হয়ে গেছে যে মুম্বাইয়ে ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ, দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ, উত্তর প্রদেশের আদালতে বোমা বিস্ফোরণ, জয়পুরে বোমা বিস্ফোরণ, নানদেড়ে বোমা বিস্ফোরণ, হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণে মুসলমানদের কোন হাত ছিল না । পরে প্রমান

হয় যে এই বিস্ফোরণ হিন্দুত্ববাদীরাই করেছিল এবং অনেক বিস্ফোরণে সাহায্য করেছিল ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা আই বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো । কিন্তু আমাদের দেশের ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া আর তা প্রকাশ করেনি । যদিও কেউ প্রকাশ করেছিল তা ক্ষুদ্রায়তনে যা অনেকেই পড়েনি । কেননা মেইন পেইজে হেডলাইনে প্রকাশ করলে হিন্দুত্ত্বদাবীদের সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে । আর মিডিয়া চায় না হিন্দুত্ববাদীদের রহস্য ফাঁস হোক কেননা মিডিয়া হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা পরিচালিত ।

এই কিশোরের মৃত্যুর জন্য দায়ী মিডিয়া

খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর মিডিয়া যখন ইসলাম ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো শুরু করে তখন মাদ্রাসার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু লোক মাদ্রাসার ১৬ বছরের কিশোর আমিরুদ্দীন খানকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে । এই আমিরুদ্দীনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের দেলদা থানার শাবড়া গ্রামে । সন্ধার সময় আমিরুদ্দীন মাদ্রাসার পাশে পুকুর থেকে নামায পড়ার জন্য ওজু করে ওঠার সময় তাকে চারজন লোক ধরে মাদ্রাসার জানালার সাথে বেঁধে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় । তার চিৎকারে সঙ্গী সাথীরা এসে দেখে আমিরুদ্দীনের শরীরের ৬০ শতাংস পুড়ে গেছে । আমিরদ্দীনের মৃত্যুর খবর পেয়ে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ও আরো কয়েকজন হাসপাতালে যান ।

মিডিয়া তিলকে তাল বানিয়ে দেয় কিন্তু একটি কিশোরকে মাদ্রাসার মানে অপপ্রচারের পর আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হল অথচ তার খবর কোন সংবাদমাধ্যম বা স্যাটালাইট চ্যানেলের মিডিয়াগুলো একটিবারের জন্যও প্রচার করল না । কারণ তারা জানে এই আমিরুদ্দীনের মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ী । এই ব্রাম্ভন্যবাদী শয়তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল মিডিয়া যদি মিথ্যা ভাবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালাতো তাহলে চারজন লোক বিভ্রান্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে আগুন লাগাতো না । সুতরং আমিরুদ্দীনের মৃত্যুর জন্য মিডিয়া দায়ী । তাই এই ২৪ ঘন্টা, এবিপি আনন্দ ও অন্যান্য মিডিয়াগুলোকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হোক ।

ভারতে আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস

আই. বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হল ভারতের একটি অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা যা সম্পূর্ণ ব্রাম্ভন্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । শুরু থেকেই ব্রাম্ভন্যবাদীরা আই. বি এর গুরুত্বপূর্ন স্থায়ী পদে নিয়োজিত আছেন । সেই সঙ্গে আর. এস. এস এর মতো ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যের নওজোয়ান ব্রাম্ভন আই. পি. এস অফিসারদেরকে ডেপুটেশনে আই. বি. তে যাবার জন্য উৎসাহিত করা শুরু হয় । মারাঠী পত্রিকা ‘বহুজন সংঘর্ষ’ (৩০ এপ্রিল ২০০৭) এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে,

“এই রকম আই. বি’র বিশিষ্ট পদে আর. এস. এস এর হিতাকাঙ্খীদের আসীন হবার পর তারা এই নীতি গ্রহণ করে যে তারা স্বয়ং রাজ্যের এমন ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করত যারা

তাদের দৃষ্টিতে আই. বির জন্য উচিৎ মনে হত এবং তাদেরকেই আই. বিতে নিযুক্ত করা হতে লাগল । যার ফলাফল এটাই হল যে আর. এস. এস এর বিচারধারায় প্রভাবিত যুবকদেরকে আই. পি. এস অফিসাররা নিজেদের সময়কালে শুরুতেই আই. বিতে নিযুক্ত হতে লাগলেন এবং ১৫, ২০ বছর পর্যন্ত আই. বিতেই রইলেন । কিছু ব্যাক্তি তো সারা জীবন আই. বিতেই রয়ে গেলেন । উদাহারণস্বরুপ মহারাষ্ট্র ক্যাডারের অফিসার বি. জি বৈদ্য কর্মজীবন শেষ করা পর্যন্ত আই. বিতেই ছিলেন । মজার কথা হল যখন তিনি আই. বির ডাইরেক্টর ছিলেন তখন তাঁর ভাই এম. জি বৈদ্য মহারাষ্ট্রের আর. এস. এস এর প্রধান ছিলেন । উদাহারণস্বরুপ মহারাষ্ট্র ক্যাডারের অফিসার বি. জি বৈদ্য কর্মজীবন শেষ করা পর্যন্ত আই. বিতেই ছিলেন । মজার কথা হল যখন তিনি আই. বির ডাইরেক্টর ছিলেন তখন তাঁর ভাই এম. জি বৈদ্য মহারাষ্ট্রের আর. এস. এস এর প্রধান ছিলেন । যদি আই. বির এমন তালিকা উপর দৃষ্টিপাত করা হয় যা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডেপুটেশনে আই. বিতে নেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই আর. এস. এস এর হিতাকাঙ্খী ছিলেন অথবা আর. এস. এস এর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল এবং তারা হয় আর. এস. এস এর ইশারাই আই. বি অথবা 'র' (RAW/Research & Analysis Wing) তে গিয়েছেন অথবা তাদেরকে এই সংগঠনে মওজুদ আর. এস. এস এর এজেন্ডা পূর্ণকারী অফিসাররা নিযুক্ত করেছেন । রেকর্ড দেখাবার জন্য এমন অফিসারও আই. বি তে নিযুক্ত করা হয়েছে যাদের সম্পর্ক আর. এস. এস এর সঙ্গে নেই কিন্তু স্থায়ীভাবে গুরুত্বহীন কাজের দায়ীত্বভার দেওয়া হয়েছে ।"

তাহলে দেখুন যে আই. বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আর. এস. এস এর সঙ্গে এমন আঁতাত সম্পর্ক তারা কিভাবে মুসলমানদের সঙ্গে ভাল ব্যাবহার করতে পারে ? আর. এস. এস এর মূল লক্ষই হল ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা । তাতে আই. বি সহযোগিতা করবে না এটা কি করে সম্ভব । আরো বলা হয়েছে যে গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি আর. এস. এস এর থেকেও কট্টর ব্রাম্ভন্যবাদী । একটা উদাহারণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, দিল্লী ইউনিভার্সিটির প্রফেসার আব্দুর রহমান গিলানীকে সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য গ্রেফতার করা হয় এবং হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট উভয় আদালত তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষনা করেন । তেহেলকা পত্রিকার ২২ নভেম্বর ২০০৮ সালের সংখ্যায় লিখেছেন, "আমি এই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি । তাদের সঙ্গে বসে আমার কখনো মনে হয়নি যে আমি কোন গণতন্ত্র দেশের কোন অফিসে বসে আছি । বরং সবসময় আমার মনে হয়েছে যে আমি আর. এস. এস এর কোন অফিসে বসে আছি ।"

দিল্লী ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসারের সঙ্গে যদি ব্রাম্ভন্যবাদী আই. বি এত জঘন্য ব্যাবহার করে তাহলে সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে তারা কিরকম ব্যাবহার করবে তা পরিস্কার অনুমেয় । আর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যে একটি সাম্প্রদায়িক গোয়েন্দা সংস্থা এর পরিস্কার বোঝা যায় যে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এতে কোন মুসলমান অফিসার ছিলেন না । (কমিউনিজম কমব্যাট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, দ্য টেলিগ্রাফ, কোলকাতা ১৮ মার্চ ১৯৯৩ এবং দ্য সান্ডে ২৭ মার্চ - ২

এপ্রিল ১৯৯৪) ৯৯৩ সালে কিছু মুসলমানকে আই. বিতে নিযুক্ত করা হলেও তাদেরকে ভরষা করা হতো না ।

ভারতে যতবার সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে প্রত্যেক বারই আই. বি তার তদন্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছে । প্রাথমিক তদন্তে যখন হিন্দুত্ববাদীরা কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডে ফেঁসে গেছেন তখনই আই. বি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । যেমন, ১১ অক্টোবর ২০০৭ সালে আজমির শরীফে বোমা বিস্ফোরণের পর আই. বি রিপোর্ট প্রকাশ করে যে এই হামলা লস্কর এ তাইয়েবা অথবা জৈশ এ মুহাম্মাদ অথবা হুজি একত্রিত হয়ে এই কাজ করেছে । কিন্তু পরে পরে যখন মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখন প্রমাণ হয় যে আজমির শরীফে এবং মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ করে হিন্দুত্ববাদীরা । নার্কো টেস্টে লেফটেনেন্ট কর্নল প্রসাদ পুরোহিত স্বীকার করে যে সে মহন্ত দয়ানন্দ পান্ডের কথায় আজমির এবং মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য সাপ্লাই করে । (সকাল, পুনা ১৫ নভেম্বর ২০০৮) অভিনব ভারতের স্বাধী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং অজয় রাহিকর পুলিশের কাছে বায়ানে বলে যে ২০০৭ সালের বিস্ফোরণের সে মাস্টারমাইন্ড ছিল । (হিন্দুস্তান টাইমস, দিল্লী, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯)

যখন হিন্দুত্ববাদীরা এই বোমা বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে ফেঁসে যান তখন আর. এস. এস এর পোষ্যপুত্র আই. বি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায় । এবং কিছু কিছু জায়গায় আই. বি নিজে বোমা বিস্ফোরণ করে মুসলমান যুবকদের ধড়পাকড় শুরু করে । এমনকি ২৬/১১ এর সময় সি এস টি কামা রঙ্গভবন লেনে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় তখন গুড়গাঁও চৌপাটীতে সন্ত্রাসবাদীদেরকে যাবার জন্য স্কোডা কারের বিশেষ ব্যাবস্থা আই. বির ষ্টক থেকেই করা হয়েছিল । এমনকি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি স্বয়ং এ টি এস চীফ হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করতে সাহায্য করে । যেহেতু কারকারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদেরকে হাতেনাতে ধরেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ময়নাতদন্ত শুরু করেন । সেইজন্য আই. বি গুরুতরভাবে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কায় কারকারেকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে কেননা আই. বি জানত হিন্দুত্ববাদীরা আদালতের কাঠগড়ায় গেলে আই. বির গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হবে যেহেতু তারাই হিন্দুত্ববাদীদেরকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করতে সাহায্য করেছে ।

২৬/১১ এর হামলার ব্যাপারে আই. বি সবকিছুই জানত তবুও আগে থেকে তারা মুম্বাই পুলিশ এবং ওয়াস্টার্ন নেভি কামান্ডকে কোন তথ্য দেয়নি এবং 'র' যে আই. বি কে গৃহ মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে ৩৫টি মোবাইল নম্বর দিয়েছেল যে নম্বরগুলি লস্কর এ তাইয়েবার সন্ত্রাসীরা মুম্বাই হামলার ৫ দিন আগে ব্যাবহার করেছিল কিন্তু সেই নম্বরগুলি আই. বি ততক্ষন নযরে রাখেনি যতক্ষন না রঙ্গভবন লেনে সন্ত্রাসী হামলা না হয়েছিল যদিও তারা সেই ৩৫টি নম্বর নযরে রেখেছিল তারা নিজের অসৎ উদ্দেশ্যেই তা ব্যাবহার করেছি । কারণ ২৬/১১ এর সময় রঙ্গভবন লেনে যে হামলা হয়েছিল তার পিছনে আই. বিরই অদৃশ্য হাত ছিল । যদি তারা সেই ৩৫ টি নম্বরের উপর নযর রাখত তাহলে আই. বির অসৎ উদ্দেশ্য কখনো সফল হতো না এবং হেমন্ত কারকারেকেও তারা হত্যা করতে পারত না ।

রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার তথ্য নিয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রচুর হেরফের করে এবং জেনেশুনে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করেনি । ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জানত যে ১৯৩৪ সালের পর থেকে ৫ বার হত্যা করার প্রয়াস করা হয় এবং নাথুরাম গডসে আগেও গান্ধীজীকে হত্যা করার প্রয়াস করে । এমনকি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে যে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং দিল্লী পুলিশের একটি বিশেষ শাখা দুইজন মুসলিম যুবক মুহাম্মাদ মাআরিফ কমর এবং ইরশাদ আলীর উপর আর. ডি. এক্স রাখার অভিযোগ উত্থাপিত করার কথা ছিল এবং সন্ত্রাসবাদী ঘোষনা করার কথা ছিল । এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টর নিজে কোন আইনের শাস্তি না দিয়ে একজন যুবককে হত্যা করেন ।

'হু কিল্ড কারকারে ?' (Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India) নামক বইয়ে লেখা আছে, "…..সহজেই একথা বোঝা যায় যে সুরাটে সক্রিয় বোমা পাওয়া এবং আহমদাবাদে বিস্ফোরণ, এই সবই আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), আর. এস. এস. এবং আমেরিকার এজেন্সি (কেন হেভিড যার এজেন্ট ছিল) প্রভৃতিদের কাজ ।"

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো দুই বার সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ কান্ডে তদন্ত করতে আসে । প্রথমবার হরিয়ানা পুলিশ পুরো তদন্তের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল তখন এবং দ্বিতীয়বার হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের এ টি এস পুরো তদন্ত করে নিয়েছিল । এই দুই বারই আই. বি নিজেদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য এই তদন্তে বাধা দান করে এবং ব্রাম্ভন্যবাদীদেরকে যারা এই সন্ত্রাসবাদী কর্মে লিপ্ত ছিল তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করে । এবং লেফটেনেন্ট কর্নল প্রসাদ পুরোহিত যে সেনাবিভাগ থেকে অধিক পরিমানে আর. ডি. এক্স চুরি করে পালিয়েছিল এবং মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের মূল অপরাধী ছিল এবং আই. বি কর্নল প্রসাদ পুরোহিতের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড সম্পর্কে জানত যে তার সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অভিনব ভারতের সঙ্গে আছে কেননা সে কয়েকবার তাদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিল । (হিন্দুস্তান টাইমস, মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারী ২০০৯) তা সত্ত্বেও অতিথি অধ্যাপক হিসাবে "মহারাষ্ট্রের এ টি এস (ATS/Anti Terrorist Squad) অফিসার দ্বারা বিস্ফোরক দ্রব্য কিভাবে চেনা যায়" বিষয়ে সম্বোধন করার জন্য আমন্ত্রন করে । তখন আই. বি এই ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি । বরং আই. বি স্বয়ং জঙ্গী কর্নল প্রসাদ পুরোহিতকে প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য আমন্ত্রন করে ।

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের নিকট এত পরিমাণ অস্ত্রের ভান্ডার মওজুদ রয়েছে এবং বিভিন্ন আশ্রমে যে সাধু সন্তদের নিকট এত পরিমান গোলা বারুদের গুদামঘর রয়েছে এবং আর. এস. এস ও বজরঙ্গ দলের সারা ভারত জুড়ে এত সংখ্যক জঙ্গি প্রশিক্ষন কেন্দ্র রয়েছে এবং তার ব্যাপারে আই. বির কোন মাথাব্যাথা নেই । আই. বির কাছে তার দেশদ্রোহী নয় । কারণ আই. বির মস্তিষ্কই হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন । আর আই. বি যদি আর. এস. এস এর মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদীদেরকে সমর্থন না করত তাহলে কোনদিন আর. এস. এস মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না এবং আর. এস. এস কবে খতম হয়ে যেত কিন্তু আই. বি চায় না আর. এস. এস

খতম হোক এবং ভারতে সন্ত্রাসবাদ খতম হোক কারণ আই. বি আর. এস. এস এর চেয়েও বেশি ব্রম্ভন্যবাদী । আই. এটাই চাই যে ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হোক এবং মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হোক । কারণ আই. বি হল ভারতের সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের মুখোশ পরে সরকার সহ ভারতের ১২০ কোটি জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করছে । আমরা জানি আই. বির চক্রান্ত কোনদিনই সফল হবে না এবং কোনদিনই ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হবে না এবং তারা কোনদিনই মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না কেননা ইংরেজদের যুগে এই আই. বির পূর্বসূরী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সরাই সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারীকে বলেছিল এই খদ্দর পরিধানকারী মৌলবী যে সারা ভারত জুড়ে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছে তারা কিছুদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর রহমত যে ভারতে ব্রিটিশদের ইন্টেলিজেন্স বিতাড়িত হয়েছে এবং আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর রুহানী সন্তান উলামায়ে কেরামরা ভারতের প্রত্যেক গলিতে মওজুদ রয়েছেন । অনুরুপভাবে ভারত থেকে মুসলমানদেরকে তাড়া তো সম্ভব হবেই না বরং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোই ভারত থেকে একদিন খতম হয়ে যাবে যদি তারা নিজেদের সন্ত্রাসী চিন্তাধারা পরিবর্তন না করে ।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হল পৃথিবীর সবথেকে মারাত্মক সন্ত্রাস । এই সন্ত্রাসের মূল কারণ হলেন স্বার্থভোগী কিছু রাজনৈতিক নেতা যাঁরা রাজনীতির জন্য মানবতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করতেও পিছপা হন না । এরা রাজনীতি জন্য নিজের নাবাবালিকা কন্যাকেও বর্বর শত্রুর বিছানায় পাঠিয়ে দেন । এরা রাজনীতির জন্য দেশে দাঙ্গা বাধিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন । যেসব স্থানে দীর্ঘদীন ধরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সম্প্রীতি বাজায় ছিল সেখানে দেখা যায় এই রাজনৈতিক নেতাদের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শ্মশান হয়ে যায় ।

বর্তমানে যে কোন রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির জন্য দায়ী কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস । রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রভাবেই ব্যাক্তি সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায় । রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যদি না থাকে তাহলে ব্যাক্তি সন্ত্রাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । কেননা রাষ্ট্রের মানবতা বিরোধী গতিবিধী ব্যাক্তি সন্ত্রাসের প্রবনতা বৃদ্ধি পায় ।

ইরাকের দিকে তাকালেই বোঝা যায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কিভাবে আজ সেখানে ব্যাক্তি সন্ত্রাস রাজত্ব করছে । ইরাক আগে ছিল শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশ । মানুষজন অফিসে যেত, কাজকর্ম করত, ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যেত, মসজিদে আযান দিত এবং সেখানকার ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মশগুল থাকতেন । এই সময় হঠাৎ মারনাস্ত্রের মিথ্যা অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন হানাদাররা সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে দেশটিকে শ্মশান বানিয়ে দিল । একটি দেশের নির্বাচিত সরকার ও শাসককে উচ্ছেদ করে মার্কিনা হায়েনারা সদ্দামকে অমানবিকভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল । যার ফলে ইরাক আজ তিনটি টুকরোয় বিভক্ত ।

সাদ্দাম হোসেন যখন এই দেশের শাসক ছিলেন না তখন থেকেও শিয়া-সুন্নীর লড়াই চলছিল এবং তা মারাত্মক রুপ ধারণ করেছিল । ফলে দেশের মাটিতে গোষ্ঠী দ্বন্দে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় । এই গৃহ যুদ্ধকেও মার্কিন প্রশাসন ইস্যু বানাবার চেষ্টা করে । তবে তৎকালীন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচীব কোফি আন্নান ২০০৬ ডিসেম্বর মাসে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, "ইরাকে আমেরিকার অভিযানের পর থেকে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বে সব দেশে গৃহযুদ্ধে মৃত মানুষের সংখ্যার থেকেও বেশি । সাদ্দামের আমলে কখনো এতো মানুষের মৃত্যু হয়নি । ভয়ঙ্কর, নির্মম ঘটনা ঘটেছে ইরাকে ।" এই কথা বলে কোফি আন্নান ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকেই বুঝিয়েছেন । অথচ এই দেশে শিয়া-সুন্নী মিলেমিশে থাকত এবং সাদ্দামের শাসনকালে এমন দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ হয়নি । অনেকে এই গৃহযুদ্ধ ও দাঙ্গা না হওয়ার কারণ হিসাবে মনে করেন যে সাদ্দামের ভয়েই তা হয়নি । তাহলে তো এটা ভালো কথা । কোন দেশের শাসকের ভয়ে যদি দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ না হয় তাহলে শাসকের এই প্রতাপশালী গুনের প্রশংসা করতে হবে । কোনও দেশের শাসকের ভয়ে দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ নিষ্কৃতি পাওয়া তো রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর ।

এই ইরাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রভাবেই উৎপত্তি হয়েছে ব্যাক্তি সন্ত্রাসের । আমেরিকা যদি অবৈধ আগ্রাসন ইরাকে না চালাতো তাহলে বিশ্ব অনেক সন্ত্রাসবাদী হামলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত । আর আজকের যুগের তথাকথিত সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আই. এস. আই. এস (ISIS/Islamic State Iraq and Al Sham) এরও উৎপত্তি হত না এবং আবু বকর আল বাগদাদিরও উত্থান হত না । বাগদাদির উত্থানের পিছনে মার্কিন হায়েনারাই দায়ী । মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাদ্দামের পতন ঘটিয়ে শিয়াদের নিয়ে পুতুল সরকার বসিয়েছিল । আর বাগদাদির আগমনে সেই পুতুল সরকারকে উচ্ছেদ করে আবার সুন্নী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বিগ্ন । এবং তারা এই কাজ করতে গিয়ে যে বিচারক সাদ্দামের জন্য ফাঁসির রায় ঘোষনা করেছিল তাকেও এই বাগদাদীর সংগঠন মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেয় । এই যে আবু বকর আল বাগদাদীর উত্থান এর পিছনে মুল কারণ হল আমেরিকা । কেননা, আমেরিকা যদি অবৈধ আগ্রাসন ইরাকে না চালাতো এবং হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা না করত তাহলে বাগদাদীর মধ্যে এতো প্রতিষোধ প্রবনতা বৃদ্ধি পেত না ।

অপরদিকে গুজরাট দাঙ্গাও একধরণের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার । গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর আঙ্গুলি হেলনে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় যা এর আগে 'গুজরাটে হিন্দুত্ববাদীদের ভয়াবহ সন্ত্রাস' শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে । তার আরও আগে রাষ্ট্রীর সন্ত্রাসে বাবরী মসজিদ ধুলিস্যাত হয়েছে । ফলে ভারতের মাটিতেও সন্ত্রাসবাদের গোড়াপত্তন হয়েছে । এবং ১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে দাউদ ইব্রাহিম, আবু সালেম, সঞ্জয় দত্ত প্রভৃতিরা সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার প্রতিষোধ নেবার চেষ্টা করেছেন । এর পরে সন্ত্রাবাদের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়ে তথাকথিত 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনে'র উত্থান হয় । সিমির (SIMI/Student Islamic Movement of India) তৎপরতা বাড়ে । রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে যদি বাবরী মসজিদ ধ্বংস না হত এবং গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর 'জঙ্গি' বাহিনী যদি মুসলমানদেরকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা না করত তাহলে ভারতে সন্ত্রাসবাদের প্রবণতা বাড়ত না বলে অনেকে মনে করেন । তবে

আমার ধারণ হল, সত্যিই ভারতে কোন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কোন হামলা হয়েছে বলে মনে হয় না । আর ১৯৯৩ সালে বোম্বাইয়ে সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা । এতে সঞ্জয় দত্তের মতো হিন্দু চলচ্চিত্র অভিনেতাও ছিলেন । তিনি এখনও জেলে আছেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তালিবান কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়

তালিবানদের ব্যাপারে কিছু বলার আগে একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে তালিবান কোন গোষ্ঠী বা সংগঠনের নাম নয় । তালিবান একটি মতাদর্শের নাম । তালিবান তাঁরা যাঁরা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান, ধর্মের নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, যাঁরা মৌলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী বা শোধনবাদী তাঁদেরকে দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করেন, যাঁরা আল্লাহ রসুলের মর্যাদা রক্ষায় জান কোরবানী দিতে ভয় পায় না, স্বধর্ম ও স্বজাতিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যাঁরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে সদা উন্মুখ এমন সাচ্চা ইসলাম ধর্মাবলম্বীকেই বলা হয় তালিবান । (বেনজির ভুট্টো ও পাক রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৫২/মিহির কর্মকার)

সাংবাদিক মিহির কর্মকারের এই তালিবানের সংজ্ঞার পরিপ্রক্ষিতে বলা যায় শুধু আফগানিস্তানের আমিরুল মোমেনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদের দলই তালিবান নয়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেই তালিবান । তবে বর্তমানে বিজ্ঞ মহলে তালিবান বলতে মোল্লা ওমরের সংগঠনকেই বোঝায় ।

আমাদের দেশের ও মার্কিন মিডিয়া তালিবানদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে । যদিও তা সত্যের বিপরীত । তালিবানরা কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয় । এই তালিবানদের আন্দোলনে ১৯৮৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র শক্তির সমর্থনে আফগানিস্তানের সরজমিন থেকে কমিউনিষ্ট রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বাহিনী বিতাড়িত হয় । এরপর আফগানিস্তানে লাভের জন্য গৃহদ্বন্দ শুরু হয় । এরপার ১৯৯২ সালে কমিউনিষ্ট সরকারের পতন ঘটে । ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের সহযোগিতায় তালিবান আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং ১৯৯৬ সালে পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আফগানিস্তান দখল করেন এবং শরীয়াতি আইন চালু করে দিয়ে নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান । ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অপরাধে মূল আসামী হিসাবে আল কায়দার শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আমেরিকা তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে ।

এই যুদ্ধ ঘোষনা করার আগে আমেরিকা মোল্লা ওমরকে এই চরমপত্র দিয়েছিল যে ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে । তুলে দিলে আফগানিস্তানে অভিযান চালানো হবে না । জবাবে মোল্লা ওমর বলেছিলেন, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে টুইনটাওয়ার

ওসামা বিন লাদেন ধ্বংস করেছে তা প্রমান দিলে তবে লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবেন। তাছাড়া বিনাদোষে তিনি আশ্রয় প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দিবেন না।

জাপানের দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাতকার চলাকালী মোল্লা ওমর বলেন, "ওসামাবিন লাদেন আফগানিস্তানের একজন মেহমান। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া তিনি কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না করার অঙ্গিকারে আবদ্ধ। যখন ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে তখন ইসলামি ইমারতের উচ্চ আদালত তাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছে এবং ঘোষনা দিয়েছে যে, যদি কারো কাছে ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মেনে নেওয়ার মতো কোন প্রমাণ থাকে, তাহলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থাপন করুক। কিন্তু কেউ কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তাই উচ্চ আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষনা করেছে। আদালতের এ সিদ্ধন্তের ফলে আমাদের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়েছে। আমরা ওসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করব না।"

কিন্তু সন্ত্রাবাদের জনক বুশ মোল্লা ওমরের কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করেননি। ফলে বুশ বাহিনী আফগানিস্তানের উপর আক্রমন চালায় এবং আফগানিস্তান ধ্বংসের তান্ডবলীলায় পর্যবসিত হয়। অথচ তালিবানদেরকে পর্যূদস্ত করতে পারেনি বরং তালিবানরা পূর্ণ দাপটে আফগানিস্তানের অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়ে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে। আমেরিকার জোট বাহিনীর কমান্ডর ম্যাক্রিস্টল ও ব্রিটেনের সেনা প্রধান রিচার্ডস বলেছেন, আফগানিস্তানে আরও সৈন্য না পাঠালে আমেরিকার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমনকি আমেরিকার বুদ্ধিজিবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামাও তালিবানদের সাথে আলোচনার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করছেন। ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন যে যুদ্ধ করে তালিবানদের পরাজিত করা সম্ভব নয় বরং তাদের সাথে আলোচনা করা একান্ত যুক্তি সংগত। এখন ভাবনার বিষয় তালিবানদের সঙ্গে এখন যে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে তা যদি আফগান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে করা হত তাহলে আফগানিস্তানে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না।

আমদের এখানে বক্তব্য হল, তালিবানরা আফগানিস্তানের মাটিতে যে শরিয়াতের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে তা কি অন্যায়? যেহেতু আফগানিস্তানে ৯৯ শতাংসই মুসলমান। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদী আরবসহ বহু ইসলামি রাষ্ট্রেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু আছে। তাহলে তালিবানরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রে কায়েম করলে অন্যায় কোথায়?

নিজের দেশ স্বাধীন করে আমরেরিকার প্রভুত্ব্য স্বীকার না করে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কয়েম করাই হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও মিডিয়ার কাছে সন্ত্রাসবাদ। অর্থাৎ ইসলামি শরীয়াতটাই তাদের কাছে চক্ষুশূল। আফগানিস্তানে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কয়েম হয়ে গেলে আর আমেরিকার দালালী সেখানে চলবে না বলে তারা আমিরুল মোমেনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে দুনিয়ার সম্মুখে হেয়

প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অজুহাতে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বুশ প্রশাসন এত বড় সন্ত্রাসী হামলা করল সেটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের চোখে সুজে না।

অভিযোগ করা হয় তালিবানরা বামিয়ানে প্রাচীন বৌদ্ধ মুর্তি ধ্বংস করে। তাই তালিবানরা নাকি উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং পরধর্ম বিদ্বেষী। এই বৌদ্ধমুর্তি ধ্বংস করার জন্য আমাদের দেশের তৎকালীন বিজেপি সরকার ও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবিরা তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের সঙ্গে হিন্দু রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন বজরং দল, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর. এস. এস. প্রভৃতিরা তুমুল শোরগোল শুরু করে দেয়। তাদের বক্তব্য অপরের সংস্কৃতি ধ্বংস করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ। আর দেখা যায় তারাই একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় হাজার হাজার লোকের সম্মুখে। তখন তাদের মনে ছিল না অপরের সংস্কৃতি ধ্বংস করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ। সেজন্যই দিল্লীর জামে মসজিদের ইমার সাইয়েদ আহমদ বুখারী বলেন, "বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবার বাবরী মসজিদ ভাঙার ভুল স্বীকার করুক তারপর তারা সমালোচনা করতে পারে তালিবানদের।" তিনি আরও বলেন, "বাবরী মসজিদ যথাস্থলে নির্মানের প্রতিশ্রুতি বিজেপি তথা ভারত সরকার দিক তাহলে তালিবানদের কাছ থেকে বৌদ্ধমূর্তি না ভাঙার প্রতিশ্রুতি আদায় করা যেতে পারে।"

ইমাম সাহেবের এই যুক্তির কোন উত্তর হিন্দুত্ববাদীরা দিতে তো পারেই নি বরং উল্টো তারা ইমাম সাহেবকে দেশদ্রোহী বলতে শুরু করে। হিন্দুত্ববাদীরা দাবী করে ইমাম বুখারীকে গ্রেফতার করা হোক অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক। এই হল হিন্দুত্ববাদীদের জঘন্য দর্শন।

আমরা ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাই, ভারত থেকে বৌদ্ধদেরকে হিন্দুরাই বিতাড়িত করে এবং অসংখ্য বৌদ্ধ নিধন করে। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন, "এটা ভাবা ভুল হবে যে, বৌদ্ধরা তাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক প্রচারের ফলেই এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের রীতিমত নির্যানতন ও নিধন করা হয়েছে। ফলে, তাদের সামনে কেবল দুটি বিকল্পই খোলা ছিল। যে সামাজিক অযোগ্যতা নিয়ে তারা বাস করছিল তার হাত থেকে বাঁচতে গেলে তাদের হয় অন্য দেশে পলায়ন করতে হত অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হত।" (কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা - ৭৩)

টমাস ওয়ার্টাস এর গ্রন্থে লেখা আছে, "বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তু। কোশলের হিন্দু রাজা বিরুধক এখানে ৯৯৯,০০,০০০ নিরীহ বৌদ্ধকে হত্যা করেন। এই বিভৎস হত্যাকান্ড সমাপনের পর তার নযর পড়ে ৫০০ সুন্দরী বৌদ্ধ যুবতীর দিকে। তাদেরকে তিনি নিয়ে যেতে চান তার মহলে। কিন্তু তার পরিকল্পনার তীব্র বিরুদ্ধাচারণ করেন খোদ বৌদ্ধ যুবতীরাই। অভিমানী কোশলরাজ বিরুধক তখন নির্মমভাবে হত্যা করেন এই ৫০০ বৌদ্ধ যুবতী রমণীকেও।" (তথ্যসূত্র ঃ স্বাধীনতার ফাঁকি, বিমলানন্দ শামসল)

হিন্দুত্ববাদীরা শুধু বৌদ্ধদের নয় জৈন ধর্মের অনুসারীদের উপরেও চরম নির্যাতিত করে। এম. এ. হাকিম লিখেছে, "বাংলার বৌদ্ধদের মতো দক্ষিন ভারতের জৈনরাও রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে ৮ হাজার জৈনকে হত্যা করার কথা তামিল পুরানে লিপিবদ্ধ আছে।" (আজকাল, কলকাতা, ৩০ মার্চ ২০০১)

বৌদ্ধদের হত্যা ও দেশ থেকে বিতাড়ন করেই হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা এতই সন্ত্রাসী হয়ে উঠে যে বৌদ্ধদের খতম করার পর তাদের স্মারকচিহ্নগুলোকেও একটির পর একটি করে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যাতে বৌদ্ধসভ্যতাসংস্কৃতির কোন চিহ্ন যাতে না থাকে। এভাবে সারা ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় বৌদ্ধবিহার, স্মৃতিসৌদ্ধ ও ধর্মস্থল সমূহ। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন, "দ্বিতীয় - তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দ্বিব্যাবদন' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী কানা যায় ব্রাম্ভন্যবাদী রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে স্তুপাতি ধ্বংস ও বিহারসমূহ ভস্মীভূত করেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করতে করতে শাকল অর্থাৎ অধুনিক শিয়ালকোট পর্যন্ত অভিযান করেন। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বন্ধুত্ব অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, এমনকি সেটিও কেটে ফেলেছিলেন গৌড় শৈব শাসক শশাঙ্ক।" (কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা - ৭৩)

ইতিহাসে আরও লেখা আছে, "কাশ্মীরের রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) বহু মন্দির তথা বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন। 'দেবোৎপাটন নায়ক' নামে হর্ষের একজন মন্ত্রী এই লুণ্ঠনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শত শত ধাতুনির্মিত বুদ্ধের ওপর কুষ্ঠরোগী লোকেদের প্রস্রাব করিয়ে অপবিত্র করেছিলেন এবং পরবর্তিতে তিনি আবার সেগুলিকে গলিয়ে টাঁকশালে রেখেছিলেন।" (The Culture and Civillization of India : V D Kosambi/Brahminical Conspiracy Behind Masjid Demolition : M Gopinath)

কোল্লামের ইতিহাসের অধ্যাপক এম. এস. জয়প্রকাশ লিখেছেন, "তালিবান কর্তৃক বৌদ্ধমূর্তির নির্বিচার ধ্বংস সমালোচানার তীব্র ঢেউ তোলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। আশ্চর্যের বিষয়, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারও তামাম হিন্দুত্ববাহিনী সাথে নিয়ে তালিবানদের পদক্ষেপের নিন্দা করে। প্রচলিত ধারণা বিরোধী হলেও এটাই বাস্তব যে আজকের ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির পূর্ব - পুরুষরাই নির্মমভামে ভারতে শুধু বৌদ্ধমূর্তিই ধ্বংস করেনি বরং তারা হত্যা করেছে বৌদ্ধদেরও। সুতরাং ইতিহাসের যেকোনো নিরপেক্ষ ছাত্র দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলবে যে এইসব হিন্দুত্ববাদী শক্তির তালিবানদের সমালোচনা করার কোন নৈতিক অধিকার নেই।"

তিনি আরও লিখেছেন, "৮৩০ ও ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে শত শত বুদ্ধমূর্তি, স্তুপ ও বিহার ধ্বংস করা হয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নামে। ভারতের বাইরে ও ভিতরের শিক্ষাগত ও পুরাতাত্ত্বিক উভয় সূত্রই গোঁড়া হিন্দু কর্তৃক বৌদ্ধদের প্রতি বর্বরতার জলজান্ত সাক্ষ্য। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানোর জন্য শঙ্করাচার্যের মত আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ এবং বহু হিন্দু রাজন্যবর্গ বৌদ্ধমূর্তি ভেঙে গৌরভ বোধ করতেন। আজ তাদের উত্তরপুরুষেরা ববরী মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং ভবিষ্যতে যেসব মসজিদ ধ্বংসের টারগেট তাদের রয়েছে

সেসবের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই ঔদ্ধত্যের পাপ ঘাড়ে নিয়ে তারা বর্তমান তালিবানদের নিন্দা করে।”

তিনি আরও লিখেছেন, “সম্রাট অশোকের নির্মিত ৮৪,০০০ বৌদ্ধস্তুপ ধ্বংস করেন হিন্দু রাজা পুষ্যমিত্র শূঙ্গ। এরপরেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মগধের বৌদ্ধ কেন্দ্রসমূহ। মির্মমভাবের হত্যা করা হয় হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্যাসীকে। রাজা জালালুকা তার অধীনস্ত এলাকায় বুদ্ধ বিহারসমূহ ধ্বংস করে দেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ তার ঘুমের ক্ষতি করে। কাশ্মীরের রাজা কিন্নারা ব্রাম্ভনদের খুশী করতে ধ্বংস করেন হাজার হাজার বিহার এবং দখল করেন বৌদ্ধ গ্রামসমূহ। বিশাল সংখ্যক বৌদ্ধবিহার দখল করে ব্রাম্ভণরা এবং সেগুলোকে রুপান্তরিত করে হিন্দু মন্দিরে। পরে এইসব মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মস্থানসমূহ হিন্দু মন্দির হিসাবে নিয়মিতকরণ করা হয় পুরান লিখে। তিরুপাথী, আইহোল, আন্দাভাল্লি, ইলোরা, বাংলা, পুরী, বদ্রীনাথ, মথুরা অযোধ্যা, শ্রীঙ্গেরী, বৌদ্ধগয়া, সারনাথ, দিল্লী, নালন্দা, গুডিমাল্লাম, নগরজুনাকোন্ডা, শ্রীসৈলাম ও সবরীমালা হল কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধকেন্দ্র যেসব ব্রাম্ভন্যবাদী জবরদখলের অত্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।”

শুধু প্রাচীন যুগেই নয়। আধুনিক যুগেও মুর্তি ভাঙার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন পতন হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে লেনিনের বিশাল দৈত্যাকার মুর্তিকে হাজার হাজার মানুষের সামনে বৃহৎ বৃহৎ ক্রেনের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হয়। চেকোশ্লাভাকিয়ার চুসেস্কু এবং যুগোশ্লাভিয়ার নেতা যোসেফ টিটোর মুর্তিকে ভেঙে ফেলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিটি স্মৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। বার্লিনের প্রাচীরকে খন্ড খন্ড করে সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করা হয়। এই ধ্বংকান্ডকে সকলেই স্বাভাবিক কার্যকলাপ বলে মেনে নিয়েছিলেন। অথচ লেনিনও ছিলেন নাস্তিক এবং ভারতীয় দর্শনে গৌতম বুদ্ধও ছিলেন নাস্তিক। লেনিনের বিরাট দৈত্যাকার মুর্তি ধ্বংস করাতে কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি অথচ বামিয়ানে গৌতম বুদ্ধের মুর্তি ধ্বংসে বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছেন। তাঁরা এতই প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেন যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রক্তন মহাসচিব কোফি আন্নানাফগানিস্তানের সীমান্ত দেশ পাকিস্তান পর্যন্ত চলে যান। এবং আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে তালিবানদেরকে হুমকিও দেওয়া হয় যে যদি তারা বৌদ্ধমুর্তি ভেঙে ফেলে তাহলে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক। অথচ এই মানবতার দালাল আমেরিকা ও ইহুদীদের জারজ সন্তান রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের চক্ষুর সম্মুখে যখন ভারতের হিন্দু গৈরিক সন্ত্রাসবাদীরা প্রাচীন নিদর্শন বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল তখন তাঁরা লেজ গুটিয়ে ইঁদুরের মতো বসে ছিলেন। কোফি আন্নান একবারের জন্যও ভারত সফরে এসে কোন প্রতিবাদ করলেন না। ভারতসরকারকে তিনি একবাররের জন্যও বলেননি যে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক। এটা কি তাদের দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়? আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, “যদি তারা বৌদ্ধমুর্তি ভেঙে ফেলে তাহলে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক।” কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস দেখুন, বামিয়ানে তালিবানরা বৌদ্ধমুর্তি ধ্বংস করে দিল। আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘ কিছুই করতে পারলো না। তবে ওসামা বিন লাদেনকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তালিবানদের ক্ষতিসাধন করলো বটে। তবে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবও আজ তাঁর পদে নেই জর্জ

বুশও তাঁর পদে নেই । আমেরিকা আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু কুরবান হয়ে যায় মোল্লা ওমরের প্রতি তিনি তাঁর পদেই সিংহশাবকের মতো অধিষ্ঠিত আছেন । আমেরিকা তাঁর চুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারেনি । আমেরিকা দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর মোল্লা ওমর বীরের মতো বেঁচে আছেন । মোল্লা ওমর মুসলমান জাতির জন্য গৌরব । তিনি এমন এক পবিত্র খুসবুদার মর্দে মুজাহিদ যে পৃথিবীর সকলে আমরিকাকে বাঘের মতো ভয় করলেও চিরকাল তিনি মুষিকশাবকের মতোই জ্ঞান করেছেন । যার ফলাফল হল, ২০০২ সালে আমেরিকা তার সৈন্যদের আফগানকে ধ্বংস করার জন্য কাতারে কাতারে নামিয়েছিল আর ২০১২ সালে আমেরিকা তার সৈন্যদের লাশ কাতারে কাতারে বহন করে নিয়ে যায় । কেননা, কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ‘‘কুল জা’আল কাক্ক্ ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।’’ অর্থাৎ সত্যের যখন আগমন হয় তখন বাতিল পলায়ন করে । নিশ্চয় বাতিল পলায়নকারী । আজ আমরিকা আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করেছে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ।

তালিবানদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশেসমূহ সন্ত্রাসবাদী বলেছে নিজেদের অসৎ দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য । অথচ পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী দেশ হল আমেরিকা আর পৃথিবীর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী হল জর্জ ডব্লু বুশ । কিছুদিন আগে আমেরিকার শিকাগোতে একটা সার্ভে করা হয়েছিল । আর সেই জরিপে টেররিস্ট হিসেবে ১. ওসামা বিন লাদেন, ২. সাদ্দাম হোসেন, ৩. জর্জ বুশ এই তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী বেছে নেওয়ার জন্য । তাতে ৭৮% লোক বলেছে জর্জ বুশ এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী । সুতরাং তালিবান নেতা মোল্লা ওমর মুজাহিদ সন্ত্রাসবাদী নয়, সন্ত্রাবাদী হল জর্জ বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা । কিছুদিন আগে ইউহান রেডলীকে গিয়েছিলেন তালিবানদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য । সেখানে ধরা পড়ে তিনি সাত দিন বন্দি ছিলেন । যখন তিনি স্বদেশে ফিরলেন তখন তিনি তালিবানদের ব্যবহারে রীতিমতো মুগ্ধ । তিনি কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তালিবানরা তাঁর সঙ্গে

কেমন ব্যবহার করেছিল ? তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, তারা মেহমানদের মতোই আপ্যায়ন করেছে, তারা যথেষ্ট সম্মান করেছে, ভদ্র ব্যবহার করেছে ।

সুতরাং তালিবানরা যদি সন্ত্রাসবাদী হত তাহলে তারা ইউহান রেডলীকে হত্যা করে দিতে পারত যাতে তাদের উপর কেউ গোয়েন্দাগিরি না করতে পারে । তারা তা করেনি । এর দ্বারাই বোঝা যায় তালিবানরা সন্ত্রাসবাদী নয় । তারা শান্তিকামী ।

আফগান মুজাহিদীনদের কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ

আফগানিস্তানে যখন সোভয়েত বাহিনী দখল করে নিয়েছিল তখন আফগান মুজাহিদীনরা প্রাণপন সংগ্রাম করেছিলে নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য । সেই সময় আফগার মুজাহিদদের দ্বারা আল্লাহপাক অলৌকিক নিদর্শন দেখান যার কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হল,

১) মিশরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম তাঁর 'আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান' নামক বইয়ে লিখেছেন,

"আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত কারামাতসমুহ আমি নিজ কানে শুনে নিজ হাতে লিখেছি । এ সমস্ত কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন ।" তিনি বলেছেন,

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রজমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কামান্ডার উমর হানিফ ইসলামী বিপ্লবের মোর্চার নেতা মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুরের বাড়িতে বসে আমাকে বলেছেন ঃ এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে । কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি । যদিও কুকুরেরা কমিউনিষ্টদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে ।

যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরানো বারোটি কবর আমি নিজে খুঁড়েছি, কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি । একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে ।

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ আব্দুল মজিদ মুহাম্মাদের লাশ তিন মাস পরে আমরা দেখতে পাই । লাশ যেমন ছিল তেমনই; আর মিশকে আম্বরের খোশবু রয়েছে তাতে । আব্দুল মাজিদ হাজি আমাকে বলেছেন ঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ সাত মাস পরে আমরা দেখতে পাই । মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন ।

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি ।

আব্দুল জাব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেন ঃ তিন - চার মাস পর আমি চার জন শহীদের লাশ পেয়েছি । এদের তি জনের তো চুল - দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে । অন্য একজনের চেহরার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত । আমার ভাই আব্দুস সালামের লাশ দু সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন ছিল তেমনই আছে ।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেন ঃ আমাদের সাথী, একজন তালেব ইলম মুজাহিদ, আব্দুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ অন্ধকারের ভিতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই । ফাতহুল্লাহ বলে উঠে ঃ শহীদ খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র খুশবু পেয়েছি । এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ পেলাম । ঘ্রান অনুসরণ করে আমরা যখন শহীদ আব্দুস সামাদের কাছে পৌছলাম, দেখি তার শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকতক করে জ্বলছে । আলো হয়ে জ্বলছে শহীদের লহু ।

২) মাওলানা আরসালান বলেন ঃ শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশ জন মুজাহিদ ছিলাম । দুই হাজার রুশ সৈন্য আমাদের উপর চড়াও হলে চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে । এতে ৭০/৮০ জন কমিউনিষ্ট নিহত হয় আর বন্দী হয় ২৬ জন । আমরা বন্দীদের জিজ্ঞেস করলাম যে কেন তোমরা হেরে গেলে ? তারা বললো ঃ চারদিক থেকে অসংখ্য কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা আমাদের কাবু করে ফেলে । মাওলানা আরসালান বলেন ঃ আমাদের কাছে কামান - মেশিনগান কিছুই ছিল না । দেশি কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা পঁচিশ জন একদিক থেকে গুলি ছুঁড়েছিলাম ।

তিনি আরও বলেন ঃ প্রায় একশো বিশটি ট্যাংক ও বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া গাড়ি আমাদের উপর আক্রমণ করে । এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে । অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে আসছে । বন্দীত্বের ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত প্রায় । আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম আমরা । একটু পরে চারিদিক থেকে শুরু হলো গোলাবৃষ্টি - রকেট আর বুলেটের ছুটাছুটি । কমিউনিষ্টরা পরাজিত হলো । চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই । মাওলানা আরসালানের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফেরেস্তাদের কাজ ।

৩) মাওলানা আরসালান বলেন ঃ উরগুন ৩২ নামক স্থানে আমরা কমিউনিষ্টদের উপর হামলা করলাম । পাঁচশোকে হত্যা এবং তিরাশি জন বন্দী হলো । বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম ঃ তোমরা কেন পরাজিত হলে ? - আর আমাবের একজন মুজাহিদকে তোমরা শহীদ করেছ মাত্র । বন্দীরা বললো ঃ তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছ । গুলি ছুঁড়লেও ঘোড়ার পায়ে লাগত না । আমি বললাম ঃ এগুলো বদরের ফেরেস্তা । যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ “বালা ইন তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু ----------বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাওইমীন” (১২৫ আল ইমরান) এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ যে সৈন্যরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের কাছে ফেরেস্তারা আগমন করবেন এবং সহযোদ্ধা হবেন । কারণ, আল্লাহ তাআলা (বদরে অবতীর্ণ পাঁচ হাজার) ফেরেস্তাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যই মুজাহিদ বানিয়েছেন ।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেস্তা মুসলমানদের জন্য প্রতিরক্ষাস্বরুপ । (১৯৪ - ৪)

মুহাম্মাদ ইয়াসির বলেছেন ঃ কমিউনিষ্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা "ইখওয়ান আল - মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । লোকেরা তখন অবাক হতো । কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি । এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিষ্টরা ফেরেস্তাদের কথাই বলছে ।

৪) উমর হানিফ বলেছেন ঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে । দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি । (আফগান পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিউএত কমিউনিষ্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করেনা, বরং পাহারা দেয় । এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলেছে সাপ ও কমিউনিষ্টদের লড়াই । বিষধর পাহাড়ি সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতোই না আত্মীয়, পুরানো বন্ধু ।)

৫) মাওলানা জালালুদ্দী হাক্কানী বলেছেন ঃ আমাদের ত্রিশ জন মুজাহিদের উপর বোমারু বিমান হামলা চালায় । বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে । একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি । প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম ।

আব্দুল মান্নান বলেছেন ঃ আমরা ত্রিশ হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম । সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি । পরে আমরা এই তিনশত বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি ।

৬) মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী বলেছেন ঃ আমার সাথীদের মাঝে অনেক যুদ্ধ ফেরত মুজাহিদকে দেখেছি, যাদের জামা - কাপড় বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু তাদের গায়ে একটি বুলেটও ঢুকেনি ।

শায়খ আহমদ শরীফ বলেছেন ঃ আমার ছেলে যুদ্ধ হতে ফিরে এলো । তার পোষাক ছেঁড়া, অথচ গায়ে তার কোন আঘাত নেই ।

নাসরুল্লাহ মানসুরের সচিব বলেছেন ঃ আজ ১-৪-৮২ একজন মুজাহিদ এসে পৌছেছে যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরোটি গুলি লেগেছে, অথচ সে জীবিত রয়েছে ।

মাওলানা পীর মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমরা ২০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০ টি বিমানের এক বহর সমতল ভুমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম তখন আমাদের গায়ের জামা কাপড় তেনা তেনা হয়ে গেছে। আশ্চর্য! আমরা কেউ আহত হইনি। কমিউনিষ্ট মেরেছি ১৬০ জন। আর বিমান নামিয়েছি তিনটি। আমাদের দুইজন শাহাদাত লাভ করেছেন।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানীর বুকে যে বুলেটের মালা থাকে, তার নীচে একটা গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি। এটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী বলেছেন ঃ আমি একটি বোমার উপর দিয়ে যেতে বোমাটি আমার পায়ের তলায় বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু আমি এতে মোটেই আহত হইনি।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী বলেছেন ঃ দুইবার আমার পায়ে রকেট পতিত হয়, কিন্তু আমি কোন কষ্টই পাইনি।

৭) পশ্চিম কান্দাহারের হিলমুন্ড এলাকার নেতা মুজাহিদ আব্দুল মান্নান বলেছেন ঃ আমরা ছিলাম ৬০০ মুজাহিদ আ দুশমনরা ছিল ছয় হাজার। এরা সবাই রুশ সৈন্যবাহিনীর সদস্য এদের সাথে ছয়শ' ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটি বিমান। ওরা হামলা করলে দীর্ঘ আঠারো দিন যুদ্ধ চললো। ফলাফল ঃ মুজাহিদ ৩৩ জন শহীদ হয়। দুশমনের ক্ষয় - ক্ষতি ঃ সোভিয়েত সৈন্য ৪৫০ জন নিহত। বন্দী ৩৬ জন। ৩০ টি ট্যাংক আমরা চুরমার করে দেই এবং বিমান ভূপাতিত করি ২ টি। যুদ্ধের আঠারোটা দিন শহীদরা এমননিই পড়ে থাকে। মওসুম ছিল গরমের কিন্তু একটি লাশও পরিবর্তন হয়নি, দুর্গন্ধও না। শহীদানের মধ্যে আব্দুল গফুর বিন দীন মুহাম্মাদ একজন। প্রতিরাতেই তার দেহ থেকে একটা আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতো এবং তা বেশ কমিনিট ধরেই থাকতো, যা সমস্ত মুজাহিদই দেখেছেন।

উমর হানিফ বলেছেন ঃ ১৯৮২ -এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতি রাতেই আকাশ হতে নুর এসে মুজাহিদদের বাসস্থানের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাপাদাপি করতো। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে যেতো।

৮) এক আফগান শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছিল তিন মাসেরও বেশী। নাসরুল্লাহ মনসুর বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেন ঃ আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্ন দেখলেন। আমার ভাই মাকে বললো ঃ আম্মা, আমার সব যখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো হয়নি। স্বপ্নে দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুঁড়ে দেখবেন তিনি। ভাইয়ের কবর খুঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছে অন্য আর একটি কবর উদোম হয়ে গেলে আমরা দেখতে পেলাম, কবরটির ভিতরে মৃতের উপর একটি অজগর। দেখে মা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার ছেলে শহীদ।

তার কবরে সাপ থাকতেই পারে না । অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা এলো । নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম । ভাইয়ের মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম । আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি ছুঁয়ে দেখলেন, তাঁর আঙ্গুলটি সুবাসিত হয়ে যায় । দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে খুশবু রয়ে গেছে । আঙ্গুলটি এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর ।

মুহাম্মাদ শিরীন বলেন ঃ আমাদের সঙ্গী চারজন মুজাহিদ শহীদ হয় । তাঁদের শরীর হতে ছড়ানো মিশ্‌কের মতো সুবাস আমরা চার মাস পরেও পেয়েছি ।

৯) লৌগরের শহীদ মীর আগা রিভালবার ছাড়তে চায়নি । যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের এক সঙ্গী মীর আগা শাহাদাত বরণ করে । তার হাতে ছিল একটি রিভালবার । যখন মুজাহিদরা রিভালবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলেন, তখন মীর আগা সেটি ছাড়েনি । পরে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে খবর নিলাম । তার পিতা (কাজী মীর সুলতান) এসে বললেন ঃ বাবা এ রিভালবার তো তোমার নয়, এটি মুজাহিদীনের - তৎক্ষনাৎ সে রিভালবারটি ছেড়ে দিল ।

লৌগরের শহীদ সুলতান মুহাম্মাদ ক্লাসিনকোভ দিতে চায়নি । যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের সাথী সুলতান মুহাম্মাদ ১৯৮৩ সালের মার্চে শহীদ হয় । শাহাদাতের পর সে তার ক্লাসিনকোভটি কোলে চেপে রাখে । রুশ সৈন্য এসে অস্ত্রটি হাত করার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু শহীদ দুশমনদের হাতে সেটি দিতে চায়নি । শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত লাল সেনারা তার হাত কেটে ক্লাসিনকোভটা নিয়ে গেলো ।

মুহাম্মাদ শিরীন বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইসমাইল এবং গোলাম হযরত শাহাদাতের পরও অস্ত্র দিতে রাজি হয়নি ।

১০) মাওলানা আরসালান বলেছেন যে, বিমানের গোলার আঘাতে শহীদ হলো নেককার তালেবে ইলম আব্দুল জলীল । আসরের সময় জানাজার পর তাকে তার বাড়িতে পাঠানো হলে মুজাহিদরা সকাল পর্যন্ত তার লাশের সাথে ছিলেন । আব্দুল জলীল চোখ মেলে চেয়ে হাসছিলো । এমন অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আরসালানের কাছে এসে বলছিলেন ঃ আব্দুল জলীল মারা যায়নি । আরসালান বললেন ঃ অবশ্যই সে শহীদ হয়ে গেছে । মুজাহিদরা বললেন ঃ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে দাফন করা জায়েয হবে না । প্রয়োজনে পুনরায় তার জানাযা পড়তে হবে । আরসালান বললেন ঃ সে গতকালই শহীদ হয়েছে । আর এটা তার কারামত ।

১১) মৌলবী আব্দুল করীম বলেছেন ঃ প্রায় বারো'শ শহীদ আমি দেখেছি । এদের একজনের লাশেও কোন পরিবর্তন হয়নি বা কারো লাশকেই কুকুরেরা স্পর্শ করেনি । যদিও আফগানিস্তানের পাহাড়ী কুত্তাগুলি কমিউনিষ্টদের লাশ খায় ।

ফতহুল্লাহ বলেছেন ঃ হাকিম খান নামক আমার নেতৃত্বাধীন একজন মুজাহিদ আমাকে বললো ঃ তামিজ খান নামের একজন মুজাহিদকে আমরা সাত মাস পর কবর থেকে উঠালাম। লাশে কোনরূপ পরিবর্তন নেই; আর প্রবাহমান রক্ত সুবাস ছড়াচ্ছে।

জাদরান পাকতিয়ার জালালুদ্দিন বলেছেন ঃ কোন শহীদকেই আমি কুকুরে খেতে দেখিনি। গোলাপ নামের এক শহীদকে আমি দেখেছি। পঁচিশ দিন তার লাশ ময়দানে পড়েছিল। আশেপাশে বহু কমিউনিষ্টের মড়া লাশ কুকুরে খেলেও তারা শহীদের লাশে মুখ লাগায়নি।

১২) বুড়ো বাবা মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জিহাদে শরীক হয়েছিল। সোভিয়ত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে এই তরুনটি শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে খবর দিলেন। আসতে যেতে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বুড়ো থুত্তুরে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বৃদ্ধের দাবী হলো, তিনি তাঁর ছেলেকে দেখবেন। এছাড়া ছেলেটি তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা পেল কিনা তা জানবেন। জয়ীফ বুড়োর আহাজারী আর করুণ আকুতির প্রেক্ষিতে কমান্ডার মাওলানা হাক্কানী শহীদের কবর খোঁড়ার অনুমতি দিলেন। দাফনের পাঁচদিন পর যখন কবর খোঁড়া হলো, জান্নাতি সুবাসের এক স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় তখন আশেপাশের মুজাহিদরা বিমোহিত হয়ে পড়লেন। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই বুড়ো তাঁর নয়নমণির লাশ দেখে পাগলপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠলো; বাবা তুই কি শহীদী মওত পেয়েছিস ? আমি আর তোর মা কি এখন শহীদের বাবা - মা ? নড়ে উঠলো শহীদের লাশ, মুখে উচ্চারিত হলো সালাম ঃ হ্যাঁ বাবা, আপনাদের ছেলে একজন শহীদ। কথাটি বলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুসাফাহা করলেন শহীদ তাঁর দুঃখী পিতার সাথে। দীর্ঘ পনের মিনিট এভাবেই করমর্দনরত ছিলেন শহীদ পুত্র আর তাঁর পিতা। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বহুসংখ্যক মুজাহিদ। শহীদের পুত্রের কবর পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে শান্ত মনে ফোরলেন বুড়ো। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর তৃপ্তির প্রবাহ। হৃদয় জুড়ে স্বর্গীয় প্রশান্তির কোমল পরশ।

সুতরাং আফগানিস্তানের জিহাদে স্বয়ং আল্লাহ পাক মদদ করেছেন এবং তালিবানদের জিহাদও ইসলাম সমর্থিত সেজন্য আফগান জিহাদ আল্লাহর একটি রহমত তাই তালিবানদেরকে কোনদিনই সন্ত্রাসবাদী বলা যায় না। তারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ইসলামের বীর সন্তান। সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসূরী।

পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুলে তালিবান হামলা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত ?

পাকিস্তানের পেশোয়ারে তেহরিকে তালিবান দ্বারা হামলায় ১৩২ জন ছাত্র মারা গেছে ফলে মিডিয়ার সহযোগিতায় সারা বিশ্ব তোলপাড় হয়ে উঠেছে। সবাই তেহরিকে তালিবানদের উপর ক্ষুব্ধ। এখন দেখা যাক এই ক্ষুদ্ধ হওয়াটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ? এখানে একটি কথা

বলব এই হামলা তালিবানরা করেনি করেছে পাকিস্তানের তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠী । তালিবান আলাদা ও তেহরিকে তালিবান আলাদা । আফগান তালিবান হল মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের গোষ্ঠী আর তেহরিকে তালিবান হল বাইতুল্লাহ মেহমুদের সংগঠন ।

কিছুদিন আগে শুধুমাত্র 'জঙ্গি' সন্দেহে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আমেরিকা পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতায় গ্রেফতার করে । ধর্ষনের পর ধর্ষন করে তাঁর গর্ভপাত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ৮৬ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে । অপরদিকে নাইজেরিয় সেনারা বোকো হারামের উপর হামলা করে ১১৮ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে । অথচ মিডিয়ার কোন প্রতিবাদ নেই এবং এই নিয়ে বিশ্বে কোন তোলপাড় নেই ।

২০০৬ সালে বাজাউর মাদ্রাসায় পাক সেনাদের অভিযানে ৮৬ জন শিশু ছাত্র মারা যায় এবং ২০০৭ সালে হাফসা মাদ্রাসায় পাক সেনাদের অভিযানে ১১৮ জন শিশু ছাত্রী মারা যায় । প্রত্যের ছাত্র - ছাত্রীই ছিল তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠীর । মার্কিন সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় আলাওয়াকী (রহঃ) শহীদ হন । তাঁর ছেলেকেও এই ভূয়া যুক্তি খাড়া করে হত্যা করা হয় যে "সাপের ছেলে সাপই হয় ।" এই যুক্তি যদি মান্য করা হয় তাহলে বলুন পাকিস্তানের পেশোয়ারের সেনা স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্ররা কি সেনা হত না ? আর সেই ছাত্রদেরকে তো সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার জন্যই তো প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছিলো ।

মিশরের ইসলামিক চিন্তাবিদ আইমান আল জাওয়াহিরী মার্কিন সন্ত্রাসবাদীদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড (Most Wanted) সন্ত্রাসী । কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছিল ? কেন তাঁদেরকে হত্যা করা হল ? তখন এই মিডিয়া ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা কেন মার্কিন সন্ত্রাবাদীদের বিরুদ্ধে তোলপাড় করেনি । তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা দালাল বলে ? তখন এই ভুঁইফোড় বুদ্ধিজীবিদের উপচে পড়া মানবতা আমেরিকার কোন ফাইভ ষ্টার হোটেলে চরতে গিয়েছিল ?

কিছুদিন আগেকার কথা । এই পাক সেনারাই তালিবান বিরোধী অভিযানে ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করে । তাদের মধ্যে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ । গত কয়েক বছরে পাক সেনারা অন্তত ৪০ হাজার শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা করেছে । তালিবান মুজাহিদদের ১/২ বছরের সন্তান এমনকি গর্ভজাত সন্তানও 'জঙ্গি' আর পাক সেনাদের ২০/২৫ বছরের সন্তানরাও 'শিশু' ।

১৫ জুন ২০১৪ সাল পর্যন্ত তালিবান বিরোধী অভিযানে ১২৭০ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন । এদের জন্য একটা মিছিলও বের হল না । একদিনের জন্য প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হল না । শুধুমাত্র আমেরিকার কাছে 'অধুনিক' হওয়ার জন্য পেশোয়ারের স্কুলশিশু (অধিকাংশই ১৮ বছরের অধিক) দের জন্য মিছিল বার করা হল আর তালিবানদের মাদ্রাসায় (১১৮ জন শিশু ছাত্র + ৮৬ শিশুকন্যা = ১৯৬) জন শিশুর হত্যার জন্য, ড. আইমান আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী ও সন্তানের খুনের জন্য, ড. আফিয়া সিদ্দিকীর জন্য, আলাওয়াকীর সন্তানের জন্য কোনরকম কোন মিছিল বার করা হল না, কোন প্রতিবাদ সভার

আয়োজনও করা হল না । তাহলে কেন এই মুনাফিকী ? সেনা স্কুলের ছাত্রদের জন্য তাঁদের মানবতা আছে আর মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য তাদের মনে মানবতার কোন স্থান নেই ? এ কেমন মানবতা ? তাঁদের মানবতা কেবল মার্কিন সন্ত্রাসবাদী ও নৃশংস পাক সেনাদের জন্য আর মুসলমানদের জন্য তাঁদের অন্তরে কোন স্থান নেই ?

মিডিয়ার জালিয়াতী আর কি বলা যাবে ? তেহরিকে তালিবানদের প্রকাশ করা হামলাকারী ৬ জনের ছবি তারা দেখিয়েছে অথচ তাদের শেষ বিবৃতিটা প্রচার করছে না । ‘স্কুল এন্ড কখেড়’ ছিল সেটি । অথচ সেটি স্কুলের কথাই বলা হয়েছে । কলেজ শব্দটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে বাদ দেওয়া হয়েছে অপপ্রচারে জোর দেবার জন্য । হামলায় কয়েক ডজন সামরিক অফিসার, গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার, ১ জন কর্নেল ও ২৪/২৫ বছর বয়সী ছাত্রদের । যারা প্রাণ হারিয়েছে তারা সকলেই খুনি পাক সেনাদের সন্তান । সেই হামলায় মারা গেছে মোট ২০০ জন কিন্তু মিডিয়া তেহরিকে তালিবানদের বদনাম করার জন্য শুধু ১৩২ জনের নামই বলেছে । বাকিদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে ।

তবে এই হামলার জন্য তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠীও নিন্দা করেছে । তাদের দাবী যে তারা স্কুল - কলেজের ছাত্রদের হত্যা করতে যায়নি । তারা গিয়েছিল সেনা অফিসারদের হত্যা করার জন্য । ভুলবশত ছাত্ররা মারা গেছে । তারা বলেছে যদি শুধু শিশুদেরকেই হত্যা করার পরিকল্পনা তাদের থাকত তাহলে তারা বোমা মেরে পুরো স্কুল এন্ড কলেজটাকেই উড়িয়ে দিত । এই হামলার জন্য আফগান তালিবানরা নিন্দা করেছে । তবে এটা অবশ্যই যে স্কুল ছাত্রদের হত্যা করা মানবতা বিরোধী এটা যেমন সত্য ঠিক তেমনি আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী সন্তানকে, হত্যা করেছে, আলাওয়াকীর সন্তানকে যারা হত্যা করেছে, ১৯৬ জন মাদ্রাসার ছাত্র - ছাত্রীকে যারা হত্যা করেছে সেটাও মানবতা বিরোধী ছিল । এইকথা যতদিন না এই মানবতার ধ্বজাধারীরা না বলবে ততদিন তালিবানদের উপর সমালোচনা তাদের কোন অধিকার নেই । আমার বক্তব্য হল, এইক্ষেত্রে তেহরিকে তালিবানরা যদি অপরাধী হয় তার থেকে শতগুন অপরাধী পাক সেনাহিনীরা ।

পরিশেষে আমি একটা কথাই বলব যে তেহরিকে তালিবানদের যে পরিমাণ শিশু হত্যা করা হয়েছে ও তাদের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে । যদি আপনার আমার এই অবস্থা হত তাহলে কি হত ? নিজেকে তালিবানদের স্থানে রেখে সমালোচনা করুন তাহলে আপনিই আসল রহস্য বুঝতে পারবেন ? কারণ আপনিই আপনার বিচারের জন্য যথেষ্ট । তালিবানদের স্থানে থাকলে পৃথিবীর যেকোন মানুষের অবস্থা এই রকমই হত । যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার সভ্যতার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন । তানাহয় তালিবানদের মতো নিজের অবস্থা করে দেখুন ।

সারা বিশ্ব পেশোয়ারে তেহরিকে তালিবানদের হামলার ব্যাপারে নিন্দা করেছেন তবে এই হামলা সম্পর্কে তেহরিকে তালিবানের অফিসিয়াল মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানী বলেছেন,

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

গতকাল সকালে তেহররিকে তালিবান পাকিস্তানের (TTP) ছয়জন ইস্তেহাদী সদস্য (ফিদায়ী) পাকিস্তানে পেশোয়ারে সামরিক বাহিনীর তত্বাবধানে পরিচালিত, কঠোর সিকিউরিটি জোনে অবস্থিত একটি স্কুল এন্ড কলেজে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। (সেখানে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা হয়। তারা সেখানে উপস্থিত আর্মি অফিসার এবং তাদের যুবক ছেলেদের হত্যা করেন। এই যুবক ছেলেরাই ভবিষ্যতে তাদের পিতার পদে আসীন হয়ে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অসহায় গোত্র (FATA এলাকার) এবং সারা দেশজুড়ে পরিচালিত সেনা অভিযানে অংশ নিতো। এজন্যই তাদেরকে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

ছবির ক্যাপসন ঃ আর্মি অফিসারদের আঠার এবং পঁচিশ বছরের সন্তানরা ‘মাসুম শিশু’.....!! কিন্তু সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তানের মাসুম বাচ্চারা তবে সন্ত্রাসী কেন...??

এই ইস্তিহাদী হামলা (ফিদায়ী অপারেশন) পরিচালিত হয়েছে মুহতারাম খলীফা ওমর মনসুর হাফিযাহুল্লাহর অধীনে। তিনি তেহরিকে তালিবান পাকিস্তানের সামরিক শাখার দায়িত্বশীল এবং ‘হালকায়ে পেশোয়ার দাওরায় আদম খাইলে’র জিম্মাদার।

অভিযান চলাকালীন পুরো সময়টাই তিনি (খলীফা ওমর মনসুর) মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। অনবরত দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছে ছয়জন ‘ফিদায়ী’। এরা সবাই ছিলো এম. এস. জি. এর সদস্য। এটা তেহরিকে তালিবানের বিশেষ শাখা। এই শাখার সদস্যরা বিশেষ অপারেশনেই শুধু ব্যবহৃত হয়। একজন কর্নেল, গোয়েন্দা সংস্থার কয়েক ডজন অফিসার, দুইশরও বেশি সামরিক অফিসার এবং তাদের যুবক ছেলেরা নিহত হয়েছে।

ছবির ক্যাপসন ঃ এম. এস. জি. গ্রুপের জানবাজ বীরগণ, ইসলামের বীর সেনানী, তেহরিকে তালিবানের সামরিক শাখা এবং ‘হালকায়ে পেশোয়ার দাওরায় আদম খাইল’ পেশোয়ারের দায়িত্বশীল মুহতারাম খলীফা ওমর মনসুর (হাফিযাহুল্লাহ) ও তাদের সাথে আছেন।

পাকিস্তানের নাপাক সৈন্যরা বিগত ছয় বছর ধরে, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলির উপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কত নিরপরাধ অসহায় গরীব মুসলমান শহীদ করেছে তার হিসাব কি কেউ রেখেছে ?

‘রাহে রাস্ত’, ‘রাহে নাজাত’, ‘শের দিন’, ‘খরবে আযান’ ও ‘খয়বর’-সহ আরো বিভিন্ন নামে যে অসংখ্য অভিযান চালানো হয়েছে, কত হাজার মুসলিমকে শহীদ এবং কত লাখ মুসলমানকে ঘরছাড়া করা হয়েছে তার হিসাব কি কেউ রেখেছে ?

ছবির ক্যাপসন ঃ হে নাপাক সৈন্যরা ! বলতো এই মাসুম শিশুদের কি অপরাধ ছিলো ? (প্রথম সারি) । এরা মাসুম হিসেবে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয় ? মিডিয়া কেন তাদের ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠে না ? (দ্বিতীয় সারি)

ছবির ক্যাপসন ঃ তেরো বছর ধরে চলে আসা পাক সেনাদের এই বর্বরতার পরেও কোনও মুসলমানের কি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা জায়েয হবে ? পাকিস্তানি সেনারা মুজাহিদদের বাপ - ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে শহীদ করে দেয় । এ অহরহই ঘটছে । তাদের মেরে ফেলার পর লাশগুলোও ফেরত দেয় না । অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দেয় । চলতি বছরেই শুধু ছয়শরও বেশি নিরপরাধ মানুষকে গুপ্তভাবে শহীদ করেছে । গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এই নারকীয়তার কেউ প্রতিরোধ করে না ।

ছবির ক্যাপসন ঃ শুধু এই বছরেই ছয়শরও বেশি নিরপরাধ মানুষ শহীদ হয়েছে । এসব ঘটেছে গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় । এই মাযলুম শহীদদের অপরাধ কি ছিলো তা কি কেউ কোনও দিন জানার চেষ্টা করেছিলো ?

ছবির ক্যাপসন ঃ বেলুচিস্তান থেকে কাবায়ের পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের চেয়েও বেশি নিখোঁজ মানুষের স্বজনেরা আর কতদিন আহাজারি করে বেড়াবে ? এই স্বজনহারা মানুষদের ব্যাথা পাক জেনারেলরা তখনই বুঝবে, যখন তারাও স্বজনদেরকে হারাবে ।

তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান বারবার পাক সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে, এই ধরনের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ না চালাতে বলে এসেছে । সরকারকে নিখোঁজদের লাশ হস্তান্তর করতে বলেছে, কিন্তু কোনও পক্ষই এসব আবেদনে কান দেয়নি ।

সরকার এবং সেনাদের দ্বারা পরিচালিত পাশবিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান চুড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে । আমরা সামরিক বাহিনী পরিচালিত স্কুল এন্ড কলেজকে টার্গেট করেছি । আমার শুধু প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপরই হামলা করেছি ।

তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান এই অভিযানের মাধ্যমে, পাকিস্তান সরকার এবং সেনা কতৃপক্ষকে এই পয়গাম দিচ্ছে যে ঃ

(১) তালিবানদের বিরুদ্ধে অপারেশনের নাম দিয়ে FATA এলাকার মুসলিমদের সন্তান হত্যা করা এই মুহুর্তে বন্ধ করতে হবে ।

(২) গোপন এজেন্সিগুলোর হাতে বন্দী মুজাহিদদের নিপরাধ নিকট আত্মীয় - স্বজনদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে তাদেরকে হত্যা করার প্রক্রিয়া এই মুহুর্তে বন্ধ করতে হবে ।

(৩) মুজাহিদদের পরিবারভূক্ত নারীরা যাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনী বন্দী করে রেখেছে তাদেরকে এই মুহুর্তে ছেড়ে দিতে হবে । তা নাহলে তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান পুরো দেশে আর্মি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর (পুলিশ) সাথে জড়িত প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য বানাতে বাধ্য হবে ।

আমরা সাধারণ মুসলিম জনগণকেও এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা যদি আর্মি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠান থেকে অতি শীঘ্রই পৃথক হয়ে যান, নয়ত কোন ক্ষতি হলে এর জন্য আমরা দায়ী থাকব না ।

মুহাম্মাদ খুরসানী
অফিসিয়াল মুখপাত্র,
তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান (TTP)

তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতি সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । পাকিস্তানের এই সেনা হায়েনারা কি পরিমান তেহরিকে তালিবানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে । তাদের স্ত্রী, পুত্র, পিতা প্রভৃতিদের নৃশংসভাবে ও নারকীয়ভাবে গুপ্ত ভাবে হত্যা করেছে এমনকি তাদের আত্মীয়দেরকে হত্যা করার পর অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দিয়েছে যাতে তেহরিকে তালিবান পন্থীরা তাঁদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের অন্তিম লাশের মুখ পর্যনন্ত না দেখতে পায় । আর এই হত্যাকান্ড পাকিস্তানি সেনার দুই একটি করেনি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন তারা ছিনিয়ে নিয়েছে । আর এই হত্যাকান্ড পাকিস্তানি সেনার দুই একটি করেনি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন তারা ছিনিয়ে নিয়েছে । তাই এই চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তেহরিকে তালিবানরা পেশোয়ারে সেনাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হত্যা করে জানিয়ে দিয়েছে যে আত্মীয় স্বজনের বিরহের ব্যাথা কিরকম হয় ? তেহরিকে তালিবানরা শুধু সেনাদের সন্তানদেরকেই হত্যা করেনি তারা সেই সঙ্গে কয়েক ডজন সেনা অফিসার, গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদেরকেও হত্যা করেছে । কিন্তু মিডিয়া শুধু মাত্র শিশুদের চিত্র দেখিয়ে সারা বিশ্বকে তেহরিকে তালিবানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে । আর এই বেইমান মিডিয়া ফিলিস্তিনে ইজরাইলের ইহুদীরা যে মুসলমান শিশুদের হত্যা করেছে তার চিত্র এমনভাবে দেখিয়েছে যেন এই শিশুদেরকে তেহরিকে তালিবানরাই মেরেছে । অথচ তেহরিকে তালিবানদের পেশোয়ারে হামলা করার আগেও এই একই চিত্র মিডিয়া আগেও দেখিয়েছে যে এই শিশুদেরকে ইজারাইলের ইহুদীরা নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে । আর মৃত শিশুদের যে জুতোর চিত্র দেখিয়ে মিডিয়া বলছে যে এই জুতোগুলি পেশোয়ারে তালিবানদের হামলায় সেনা অফিসারদের মৃত শিশুদের জুতো অথচ এই বেইমান মিডিয়া আগেও এই জুতোর চিত্র দেখিয়ে বলেছে যে ইহুদীরা যে মুসলমানদের শিশুদের হত্যা করেছে সেই শিশুদের জুতো । তাহলে মিডিয়ার কথাই কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে ?

পরিশেষে আমি নিজে কোন রকম সিদ্ধান্ত পেশ না করে একটি কথাই বলব, তেহরিকে তালিবানদের সমালোচনা করার আগে একবার নিজেদেরকে তাদের স্থানে রেখে চিন্তা করুন যে আপনারা যদি তালিবানদের স্থানে হতেন তাহলে আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া হত ? মুখে আপনারা যাই বলুন নিঃসন্দেহে তেহরিকে তালিবানরা যা করেছে আপনারাও তাই করতেন ।

Victim of USA drone attack in Pakistan.

ওসামা বিন লাদেন ও সন্ত্রাসবাদ

ওসামা বিন লাদেন বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হিসাবে খ্যাত । অথচ আমরা দেখতে পাই যখন এই ওসামা বিন লাদেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর ছিলেন তখন সারা বিশ্বের কির্তীমান হিরো হিসাবে পরিগনিত হতেন । যখন তিনি আফগানিস্তানের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন তখন তিনি আমেরিকার প্রিয়পাত্র ছিলেন । আর যখনই তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপকর্মের কথা সারা বিশ্বে তুলে ধরলেন এবং বন্দুকের নল আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিলেন তখনই তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার পোষ্যপুত্র মদতপুষ্ট আমাদের দেশের মিডিয়ার কাছে এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী হয়ে গেলেন । অর্থাৎ বোঝা গেল আমেরিকা ও তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের কাছে সন্ত্রাসবাদী কোন গোষ্ঠী নয় । যারাই আমরিকার অবৈধ কার্যকলাপ মানবে না তারাই সন্ত্রাসবাদী ও যারা আমরিকার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে লেজ নাড়বে সে শান্তিবাদী যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ইজারাইলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেনাফেম বেগেন যিনি ১৯৪৬ সালে ২২ জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৮ জন বৃটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পরও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন । আর ওসামা বিন লাদেন মানবতার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি মুক্ত হস্তে দান করার পরও আমেরিকার কাছে এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী ।

এই ওসামা বিন লাদেনের জন্ম হয়েছিল জানুয়ারী মাসের ১৯৫৭ সালের সৌদী আরবের রিয়াদে । পিতার নাম মুহাম্মাদ বিন লাদেন । দৈহিক উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি । তাঁর মা হামিদা ছিলেন পিতার দশম পত্নী এবং ফিলিস্তিনের রমণী । তিনি অতীব সুন্দরী রমণী ছিলেন । হামিদার ডাকনাম ছিল 'আল-আবেদা' সেজন্য ওসামা বিন লাদেনকে 'ইবনে আল আবেদা' (আবেদার পুত্র) বলে ডাকা হত । তিনি মায়ের একমাত্র সন্তান । যখন সোভিয়াত ইউনিয়ান ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান দখল করে পুরো আফগানিস্তানকে কমিউনিষ্ট অর্থাৎ নাস্তিক বানাবার চেষ্টা করে এবং যখন সোভিয়ত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের অধিবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এই মনবদরদী ওসামা বিন লাদেন । আফগানিস্তানে মানবতা ভুলণ্ঠিত হচ্ছে শুনে ওসামা বিন লাদেনের মন ছটপট করতে থাকে । তাঁর মনে একটাই চিন্তা কিভাবে কিছু একটা করা যায় । কিছু একটা করার জন্য তিনি মরীয়া । সৌদী আরব থেকে সোজা বিমানে চেপে ইসলামাবাদে উপস্থিত হলেন, তারপর সেখান থেকে গাড়িতে সীমান্ত প্রদেশের আফগান শরণার্থী ক্যাম্পে । তিনি শরণার্থীদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রীও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এসেছেন আরবের সুমিষ্ট খেজুর, আখরোট । তখন এই ওসামা বিন লাদেন শরণার্থী ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দেখেন, আফগান যুবকদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে মাটিতে বসে খাবারও খান । এইভাবে কদিন কাটাবার পর ওসামা বিন লাদেন বললেন - "রিলিফ ক্যাম্পে বিনে পয়সার খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই । আপনারা ভাবুন কীভাবে নিজের দেশে, নিজের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে - মাটিতে সম্মানের সঙ্গে ফিরে যাবেন । দেশে ফিরে যেতে চাইলে, দেশকে আগে সোভিয়েত সেনা মুক্ত করতে হবে । সোভিয়েত ইউনিয়ন আপনাদের পবিত্র দেশকে দখল করে নিয়েছে । আপনাদের পবিত্র দেশকে অপবিত্র করেছে । আপনারা জাগুন, উঠুন, বদলা নেবার জন্য তৈরী হন ।"

ওসামা বিন লাদেনের এই ভাষনে শরণার্থী ক্যাম্পের আফগান যুবকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয় । কিন্তু সকলের মনে একটাই প্রশ্ন - "সোভিয়ত সেনাবাহিনী সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সমৃদ্ধ একটি সংগঠিত বাহিনী; তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র চাই, ট্রেনিং চাই, আমরা তা কোথায় পাব ? কে আমাদের তা দেবে ?"

তখন ওসামা বিন লাদেন বললেন, "আমি দেব । আল্লাহর অপরিসীম করুনাময় আমার ধন দৌলতের অভাব নেই । তিনি আমাকে প্রচুর অর্থের মালিক করেছেন । সেই অর্থ আমি আপনাদের দেশকে শত্রু মুক্ত করার পবিত্র জেহাদে ব্যয় করতে চাই ।"

শরণার্থী প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে ?"

ওসামা বিন লাদেন বললেন, "আমি আল্লাহর বান্দা । সৌদি আরবের রিয়াধে আমার বাস । আমার নাম ওসামা বিন মহম্মদ বিন লাদেন । আমি আপনাদের বন্ধু, আপনাদের সেবক । আমার ধন দৌলত যদি আপনাদের কোনও কাজে লাগে, তাহলে আমি খুব খুশি হব । আপনারা যদি আপনাদের পবিত্র দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্য অস্ত্র গোলাবারুদ ক্রয় করে আপনাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেব । আমি

আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে শত্রুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । আপনারা স্মরণ করুন মুসলমানদের সেই গৌরবময় যুদ্ধ জয়ের ইতিহাসকে । একদিন তামাম দুনিয়া মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করেছিল । আল্লাহ্ রসুলের নামে আপনারাও জেগে উঠুন, আপনারাও সফল হবেন । মনে রাখবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ - পাক আপনাদের সঙ্গে আছেন ।”

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ-র (CIA/Central Investigation Agency) একজন প্রতিনিধি ওসামা বিন লাদেনের এই ভাষন শুনে মুগ্ধ হন । সি. আই. এ-এর এই প্রতিনিধি বুঝতে পারেন, আফগান মুজাহিদিনদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে এই সৌদী আরবের বাসিন্দা ওসামা বিন লাদেনের সাহায্য ওয়াশিংটনের দরকার । সি. আই. এ-র প্রতিনিধি জানতে চান কে এই সৌদী যুবক ? কেন তিনি সুদুর জেদ্দা থেকে পাকিস্থানের সীমান্তে উড়ে এসেছেন আফগান শরণার্থীদের সাহায্য করতে ? তাঁর কি উদ্দেশ্য বা কি স্বার্থ ? জানতে পারলেন, এই সৌদী যুবক মহম্মদ আওয়াদ বিন লাদেনের পুত্র ওসামা বিন মহম্মদ বিন লাদেন ।

ওসামা বিন লাদেনের পুর্বপুরুষ ইয়ামেনের বাসিন্দা ছিলেন । তাঁর পিতামহ ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে সৌদী আরবের রাজধানী জেদ্দা শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । তেলের খনি ও কন্সট্রাকশন ব্যবসায় লাদেন পরিবার বিশান ধনসম্পদের মালিক হন । পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি নির্মানের কাজ করে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে যান । ওসামা বিন লাদেনের পিতার সম্পত্তি ছিল প্রায় ২-৩ বিলিয়ন ডলার । ১৯৬৭ সালে ওসামার পিতা মুহাম্মাদ বিন লাদেন বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় । তখন ওসামার বয়স ছিল ১৬ বছর । এবং ওসামা বিন লাদেনের একার সম্পত্তি ছিল ৩০০ মিলিয়ন ডলার ।

ওসামা বিন লাদেন ছোটবেলা থেকেই ছিলে ধার্মিক প্রকৃতির । আল্লার ও প্রিয় নবী (সাঃ) এর প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা । পড়াশুনায় মেধাবী ওসামা জেদ্দার রাজা আব্দুল আজীজ ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েট করেন । পরে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ভর্তী হন যদিও তিনি সেই কোর্স পরিপূর্ন করেননি । ওসামা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করলেও তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস । তিনি বিশ্বের নানা ঐতিহাসিকের লেখা ইসলামের ইতিহাস তথা মুসলমানদের উত্থান পতনের ঘটনাবলী খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মীয় শাস্ত্র ও আরব ইতিহাসেও প্রবল পান্ডিত্য অর্জন করেন । এই ইতিহাস পড়েই তিনি লক্ষ্য করলেন, মুসলমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য নেই । ইসলামী রাষ্ট্রগুলিকে আল্লাহ পেট্রোলিয়ামের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেছেন । এই সম্পদগুলি কাজে লাগিয়ে অমুলিম রাষ্ট্রগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু এই দেশগুলিতে দারিদ্র নিত্যসঙ্গি ।

তিনি বিশ্বাস করতেন আরব দুনিয়াকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে সপ্তম শতকের সাচ্চা ইসলাম । ফিলিস্তিন হল ওসামা বিন লাদেনের মায়ের জন্মভুমি । তাই ওসামার ধমনীতে ফিলিস্তিনীয় খুন প্রবাহিত হয়ে চলেছে । ছোটবালা থেকে তিনি ফিলিস্তিনের মুসলমাদের উপর ইজরাইলের অভিশপ্ত ইহুদীদের বর্বর অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী শুনে দুঃখে বেদনায় ভরাক্রান্ত হয়ে পড়তেন । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আমেরিকা ইসরাইলের ইহুদীদের পক্ষ অবলম্বন না করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো । ভেবে ভেবে কাতর হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেননি । তিনি বুঝতে পারেন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারনে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান সম্ভব । কিন্তু মুসলমানদের এই ঐক্যবদ্ধ করবে কে ? একমাত্র সৌদী বাদশাহ তথা রাজারাই পারেন মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে । কিন্তু হায় আফসোস ! সৌদী বাদশারাই আমেরিকার দালাল । ওয়াশিংটন তোষন নীতিতে বিশ্বাসী । মুসলিম জাতি নিয়ে তাঁদের কোন মাথা ব্যাথা নেই । বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিধর দেশ আমেরিকা সৌদী আরবের উৎপাদিত তেলের বৃহত্তম ক্রেতা । তাই এত বড় ক্রেতাকে সৌদী সরকার চটাতে চান না । লাদেন বুঝতে পারলেন সৌদী সরকার কোনদিনই মুসলমান জাতির ঐক্যবদ্ধতার কথা ভাববেন না । তাই ওসামা ভিন্ন উপাই ভাদতে লাগলেন ।

এর পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন উপর সেনাবাহিনীর অভিযান চালায় আফগানিস্তান দখল করার জন্য । ধর্মপ্রাণ মুসলমাদেকের মেশিনগানের ভয় দেখিয়ে কমিউনিষ্ট বানাবার চেষ্টা করলে মানবদরদী ওসামা বিন লাদেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন । ওসামার এই সোভিয়েত বিরোধী ভুমিকাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্য ওয়াশিংটন প্রবল উৎসাহী হয়ে উঠে । তাঁরা লাদেনের সঙ্গে 'ন্যাচারেল ফ্রেন্ডশিপ' গড়ার চেষ্টা করেন । ওয়াশিংটন ছিল সোভিয়াতের তীব্র বিরোধী ও শত্রু । রাজনীতি ও যুদ্ধনীতিতের শত্রুর শত্রু বন্ধু বলে বিবেচিত হয় । তাই সোভিয়াতের শত্রু আমেরিকার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে বিন্দু মাত্র বিলম্ব করেননি ।

এরপর শুরু হয় বালুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় আফগান মুজাহিদীনদের গেরিলা যুদ্ধ ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষন । আফাগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন আফগান মুজাহিদীনগণ যুদ্ধ করেছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ একজন সেনা প্রধান হিসাবে মুজাহিদীন বাহিনীকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ করেতে হয় । যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমেরিকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে মুজাহিদীন বাহিনীকে সাহায্য করে । এই যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা অফিসাররাও শরিক হন । মুজাহিদীন গেরিলাগণ আফগানিস্তানের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন সোভিয়েত কামিউনিষ্ট বাহিনীদেরকে খতম করার জন্য । ছোট ছোট গ্রুপে তাঁরা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যান । চলতে থাকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা । মুজাহিদীন গেরিলাদের ছোঁড়া গ্রেনেডে ধ্বংস হতে থাকে অপ্রস্তুত সোভিয়েত সেনাদের ক্যাম্প, কনভয় । আফগান মুজাহিদদের আত্মঘাতী বাহিনী আচমকা সোভিয়েত সেনাদের ঘাঁটিতে ঝাপিয়ে পড়েন । একজন আফগান গেরিলা নিজেদের তলপেটে টাইম বোমা বেঁধে সোভিয়েত বাহিনীর কনভয়ের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাতাধিক রুশ সেনাকে মৃত্যুর ওপারে পাঠিয়ে দেন । এই গেরিলা আক্রমনের

ফলে রুশ সেনাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে । আর আফগান মুজাহিদীনদের গ্রামের পর গ্রাম দখলে চলে আসে ।

এই আফগান মুজাহিদদের খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি বিনা পয়সায় আমেরিকা দুহাত উজাড় করে দেয় । এই সময় পাকিস্তান সামরিক প্রশিক্ষন, আশ্রয় ও শরণার্থীদের সমর্থন দিয়ে সাহায্য করে ।

এই সময় ওসামা বিন লাদেন আফগান মুজাহীদ ও পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন, আফগান মুজাহিদদের উৎসাহিত করেন এবং কাবুল থেকে শেষ রুশ কমিউনিষ্ট সৈন্যটিকে তাড়াবার জন্য যা কিছু করতে হয় তা করেন । এই যুদ্ধ যখন চলতে থাকে তখন প্রতিদিন ডজন ডজন রুশ সেনা প্রান হারান এবং নিহত হন সোভিয়েত সমর্থনকারী আফগানরাও । চারিদিকে সোভিয়েত বাহিনী ও সোভিয়েত সমর্থনকারী আফগানীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় । সোভিয়েত কেন্দ্রস্থল মস্কো থেকে মুজাহিদগণকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে আখ্যা দেয় । ফলে মস্কো থেকে নির্দেশ আসে যেকোন প্রকারে আফগান মুজাহিদদেরকে খতম করতে হবে । এরপর আফগান মুজাহিদদের উপর ব্যাপকভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন শুরু হয় । আফগানিস্তানের সাধারণ মুসলমানদের উপর সোভিয়েত বাহিনী উৎপীড়ন শুরু করে ফলে আফগানীদের মধ্যে সর্বত্র রুশ বিরোধী গণচেতনা শুরু হয় । যেসব আফগানী বুদ্ধিজীবিরা কমিউনিষ্ট সোভিয়েতদের পক্ষপাতি ছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরাও ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত মুজাহিদীনদের পক্ষপাতি হয়ে যান ।

মুজাহিদদের দিনের বেলায় আশ্রয় দিতেন সাধারণ গৃহস্থ মানুষ । সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়তেন আফগান গেরিলাগণ । চোরাগোপ্তা আক্রমনে সোভিয়েত সেনাদের মনোবল ক্রমাগত ভাঙতে থাকে । তাঁরা আফগান থেকে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন । সোভিয়েত বাহিনীর এই মনোবলের কথা মস্কোর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছায় । তাঁরা বুঝতে পারেন গায়ের জোরে কোনও দেশকে কমিউনিষ্ট বানাবার চেষ্টা সঠিক পদ্ধতি নয় । অবশেষে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যায় । এবং সেই বছরই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে লেনিনের বিশাল দৈত্যাকার মুর্তিকে হাজার হাজার মানুষের সামনে বৃহৎ বৃহৎ ক্রেনের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হয় ।

এই আফাগানিস্তানকে সোভিয়েত কমিউনিষ্টদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য ওসামা বিন লাদেনের অবদান অপরিসীম । আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত পলায়ন করার পর ওসামা বিন লাদেন নামটি মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্ব জানতে পারে । তখন ওসামা আমেরিকার এক নম্বর বন্ধু । সেই সময় আফগান মুজাহিদ ও পাক সেনাবাহিনী ওসামা বিন লাদেনের এই স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও মুসলমানদের প্রতি মমতত্ববোধের পরিচয় লাভ করে মুগ্ধ হন ।

আফগানিস্তানের মাটিতে আমেরিকা যে মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড করেছে তা আই. পি. এস. অফিসার ড. নজরুল ইসলামের গ্রন্থ থেকে এই তথ্য তুলে দিচ্ছি,

“১৯৬৫ সালে আফগানিস্তানের স্থাপিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী রাজনৈতিক দল পিডিপিএ । মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে দল দু'ভাগ হয় । ১৯৭৩ সালে কমিউনিষ্টরা ক্যু - দেতা ঘটিয়ে রাজাকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসায় তার ভাই দাউদকে । শত চেষ্টা করেও দাউদ মার্কসবাদী দলগুলিকে বাগে আনতে পারলেন না । ১৯৭৮ সালে তিনি নিজেই গদিচ্যুত হলেন । সরকার গঠিত হল; তরাকি-র নেতৃত্বে । পরের বছর তরাকির স্থলাভিষিক্ত হন আমিন । কিন্তু ওই একই বছরে আমিনকে সরিয়ে গদিতে বসলেন কারমাল । খুবই টালমাটাল পরিস্থিতি । কেননা বেশির ভাগ আফগান কমিউনিষ্ট - সরকার চাইছিলেন না । বদলে তাঁরা চাইছিলেন একটি ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপিত হোক । এই লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁরা বেশ কয়েকটি মুজাহিদিন গোষ্ঠী (পবিত্র যোদ্ধা) গড়ে তোলেন । ইরানের শাহ-র মতো, ক্ষমতাচ্যুত হবার আশংকা করে কারমাল সোভিয়ত ইউনিয়নের সাহায্য চাইলেন । ১৯৭৯ সালে সোভিয়ত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করল ।

১৯৭৯ সালে মার্কিনপন্থী ইরানের শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন । ওই একই বছরে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী । আমেরিকা স্পষ্টই বুঝতে পারল, ওই অঞ্চলে তার প্রতিপত্তি দিনকে দিন কমে আসছে । সে ঠিক করল, আফগানিস্তানের জনগণকে সোভিয়ত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত করবে । এই কাজে সে নামল, অ-ধর্মীয় কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামকে রক্ষা করার জিগির তুলে । তদনুযায়ী বিভিন্ন মুজাহিদিন গোষ্ঠী সংগঠিত ও পুনঃসংগঠিত হতে লাগল । এই উদ্দেশ্যে ১৯৮০-র দশকে যুক্তরাজ্যের এমআই ৬ এবং পাকিস্তানের আইএসআই-এর যোগসাজেশে কেসি-র নেতৃত্বাধীন সিআইএ গোপনে কতকগুলি কাজ সারতে লাগল :

১. আইএসআই এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম উগ্রপন্থীদের নিয়োগ করা,

২. মার্কিন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হাতে আমেরিকান স্ট্রিংগার বিমান - বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তুলে দেওয়া, যাতে তারা সোভিয়ত বিমানগুলিকে গুলি করে নামাতে পারে,

৩. সোভিয়ত সেনাবাহিনী যেখান থেকে তাদের অস্ত্র - সরবরাহ পাচ্ছে সেই তাজিকিস্তান উজবেকিস্তানে গেরিলা আক্রমণ হানা ।

মার্কিন উপদেষ্টা ও আমেরিকান স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে কেসি মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে নিলেন ।

হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৮২ থেকে ১৯৯২, এই সময়কালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের ৪৩ টি ইসলামিক দেশের প্রায় ৩৫,০০০ মুসলিম

উগ্রপন্থীকে মুজাহিদিনরা তালিম দিয়েছে । হাজার হাজার বিদেশি মুসলিম উগ্রপন্থী পড়তে এসেছে নতুন নতুন গজিয়ে - উঠা শত শত মাদ্রাসাতে - পাকিস্তানে এবং আফগান সীমান্ত বরাবর এই ভুঁইফোড় মাদ্রাসাগুলির খরচা জুগিয়েছে জিয়া উল হক - এর সামরিক সরকার । শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক মুসলিম উগ্রপন্থী পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা এবং জিহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় ।

সিআইএ এবং এমআই ৬ - এর প্ররোচনায় আইএসআই - এর মাধ্যমে হাজার হাজার রংরুটের একজন হলেন ওসামা বিন লাদেন । তাঁর পরিবার বড়ো নির্মাণ ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল । সেই সূত্রে সৌদী রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল । ১৯৮০ সালে তিনি পেশোয়ারে আসেন । টাকাপয়সা নিয়ে বহুবার যাতায়াতের পর ১৯৮২ সালে সেখানে থিতু হন । ইসলামিক রাষ্ট্র - প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মুজাহিদিনদের সাহায্য করেন । ‘মুজাহিদিনদের জন্য পথঘাট ও ডিপো তৈরী করে দেবার জন্য তিনি তাঁর কোম্পানীর ইনজিনিয়ার এবং ভারী নির্মাণকাজের উপযোগী সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসেন । ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানি সীমান্তের লাগোয়া পর্বতের আড়ালে খোস্ট টানেল কমপ্লেক্স তৈরীর কাজে লাদেন সাহায্য করেছিলেন । এটা তৈরী করার খরচা জুগিয়েছিল সিআইএ । এই কমপ্লেক্সটাই ছিল মুজাহিদিনদের প্রধান অস্ত্রমজুদ ভান্ডার এখানে ছিল প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা এবং চিকিৎসাকেন্দ্র ।

এই খোস্ট - এই তিনি তাঁর প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির গড়লেন আরব আফগানদের জন্য যারা ক্রমেই লম্বা কৃশ, ধনী, আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই সৌদিকে নিজেদের নেতা রুপে গণ্য করতে লাগল । ১৯৯০ সালে মুজাহিদিনদের অন্তর্কলহে নিতান্ত হতাশ হয়ে তিনি সৌদি আরব ফিরে যান এবং পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দেন । সাদ্দাম হোসেনের আমলে ইরাক যখন কুয়েত আক্রমণ করে, তিনি দেশবাসীকে সংগঠিত করার আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং মার্কিন বাহিনী ডেকে আনার তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন । রাজা যখন আমেরিকার কাছে সৈন্য - সাহায্য চাইল এবং মার্কিন সেনা সৌদি আরবে পদার্পণ করল, তখন লাদেন উলামাদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন শাসক রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন । কুয়েত মুক্ত হবার পরেও মার্কিন সেনা সৌদি আরবে মোতায়েন রইল । ১৯৯২ সালে সৌদি আরব ত্যাগ করে লাদেন সুদান চলে গেলেন । সেখানে তিনি আফগানিস্তান - ফেরৎ মুজাহিদিনদের সংগঠিত করলেন । তা দেখে সৌদি এবং মার্কিন নেতারা সুদানি কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল । এরপর ১৯৯৬ সালে লাদেন আবার আফগানিস্তান আসেন । প্রথমে তিনি ছিলেন জালালাবাদ শরা’র আশ্রয়ে । পরে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে কাবুল যখন তালিবানদের দখলে চলে যায় তখন তিনিও চলে যান তাদের আশ্রয়ে । সেখান থেকেই তিনি আহ্বান জানান : সৌদি রাজ খতম কর, মার্কিন স্বার্থ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার উপর আঘাত হানো, কেননা ওরা ইসলামের শত্রু । তিনি কাজ করছিলেন মুজাহিদিনের সঙ্গে ।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যতদিন আফগানিস্তানে ছিল, ততদিন মুজাহিদিনরা ছিল পবিত্র যোদ্ধা । এদের নিয়োগ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, অর্থ যোগানো এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদে সুসজ্জিত করার ভার নিয়েছিল আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তি ব্রিটেন, সৌদি আরব ও

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ । কিন্তু ২৫.০২.১৯৮৯ তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন প্রশাসনের মতিগতি, গলার সুর বদলে গেল । মুজাহিদিনদের অর্থের যোগান বন্ধ করল এবং তাদের গায়ে সেঁটে দিল সন্ত্রাসবাদী তক্‌মা ।

মুজাহিদিনরা লড়ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই । সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহৃত হবার পর কাবুলে যখন প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লার সোভিয়েতপন্থী সরকার থেকে গেল, মুজাহিদিনরা তখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল । ১৯৯২ সালের ১৬ ই এপ্রিল নাজিবুল্লা গদিচ্যুত হলেন । ইসলামিক বিদ্রোহীরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হল । প্রেসিডেন্ট হলেন রব্বানী । গোষ্ঠীদ্বন্দ ও অরাজকতা চলতেই থাকল । তালিবানরা - দেওবান্দীপন্থী, ইসলামিক ছাত্ররা কাবুলের দখল করে নিল ১৯৯৬ সালের সেপ্টম্বরে । তাদের এই ক্ষমতা দখলে মদদ যোগালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও পাকিস্তান । রক্ষণশীল ছাত্ররা যতদিন কাবুলে একটি স্থায়ী সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধাচারণ করবে না, ততদিন তাদের নিয়ে আমেরিকার কোন সমস্যা নেই । সৌদি আরবের শাসক পরিবারের কাছে দেওবান্দীপন্থী ছাত্ররা শিয়াদের তুলনায় মন্দের ভালো । কেননা শিয়ারা ইরানপন্থী, এবং আফগানিস্তানের হিজ্‌ব - ই - ইসলামি এবং পাকিস্তানের জামাত - ই - ইসলামির সমর্থক - যারা উভয়েই ইরাকের সাদ্দাম হুসেন - এর প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে ।

অতএব, ওসামা বিন লাদেন এবং তালিবান, উভয়ই যে মার্কিন নেতাদের সৃষ্টি এবং তাদের একদা - মিত্র, এ নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই । কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের মনে সন্দেহ জাগল, ওরা ১১.০৯.২০০১-এর আক্রমণ হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল আফগানিস্তান, বোমাবৃষ্টি করে সদৃচ্ছ হতাহত করল দেশের সাধারণ মানুষকে । এই অপকর্মে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমেররিকা নানা দিকে বন্ধুত্ব পাতাতে তৎপর হল । সৌদি আরবের রাজা ফাহাদ, ওমান - এর সুলতান কাবোস, মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ - এঁদের সকলের সঙ্গে দেখা করলেন ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড । সাড়া মিলল মন্দ না । ফাহ্‌দ যথারীতি সাহায্য করলেন, ওমান ঘাঁটি দিতে রাজি হল, উজবেক প্রেসিডেন্ট বিমানঘাঁটি ব্যবহারে সম্মতি দিলেন ।

মানুষ কি বুশ ও ব্লেয়ারের মতো নেতাদের নামে জয়ধ্বনি তুলে তাদের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করবে ?

তারা দেশ আক্রমণ করছে স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের নামে । আর এখন তাদের সেনারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে । 'আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনী কাজ করছে আইন বহির্ভূত পথে, মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে গ্রেফতার করছে, বন্দিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে এবং কোনোরকম, আইনি সুরক্ষার তোয়াক্কা না করে অনির্দিষ্টকাল তাদের 'আইনি অন্ধকূপে' আটকে রাখছে । মার্কিন সেনারা আফগানদের হত্যা করলে আফগানরা তাদের তোয়াজ করবে ?'' (ইসলাম ৯/১১ ও বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদ, পৃষ্ঠা ৯৪ - ৯৭)

আমেরিকার ইজরাইলের ইহুদীদের পক্ষপাতিত্ব ও সৌদী বাদশাহর আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব ওসামা বিন লাদেন একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। কারণ ইজারাইলের ইহুদীরা ফিলিস্তিনের মুসলমাদের উপর চালাচ্ছে ভয়াবহ অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। তখন ওসামা আমেরিকা ও সৌদী বাদশাহর প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন। এমনকি সৌদী বাদশাহকে লাদেন 'আমেরিকার দালাল' বলেও গালমন্দ শুরু করেন। ফলে তিনি সৌদী আরব থেকে বিতাড়িত হন। এরপর তিনি সুদানে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে জেহাদী কার্যকলাপে আমেরিকার স্বার্থে ঘা লাগে ফলে তিনি আমরিকার বিরাগভাজন হন। আমেরিকা সুদান সরকারকে সতর্ক করে ফলে সেখান থেকেও ওসামা বিন লাদেন বিতাড়িত হন। জন্মভূমি সৌদী আরব, আশ্রয়ভূমি সুদান ত্যাগ করে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। লাদেন বুঝতে পারেন আমেরিকা চাপ সৃষ্টি করলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে বন্দি করতে পারে। এরপর পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মুশারফ ওসামা বিন লাদেনের আশ্রয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। মোল্লা ওমরের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনযীর ভুট্টো কথা বললেন। অনুরোধ করলেন লাদেনের থাকার ব্যাবস্থা করে দিতে। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর জানতেন যে আফগানিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য ওসামা বিন লাদেনের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি সর্বপ্রথম আফগানীদেকে জেহাদী চেতানায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সুদুর জেদ্দা থেকে ছুটে মুসলমান জাতিকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মোল্লা ওমরর এও জানতেন তিনি কাবুলের গদি দখল করেছেন পাক সেনাবাহিনীর মদতেই। তিনি রাজি হয়ে গেলেন ওসামা বিন লাদেনকে প্রশ্রয় দিতে।

তাহলে বোঝা গেল যখন ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার মদত করছিলেন এবং তাদের হয়ে আফগানীদের সাহায্য করছিলেন তখন তিনি ছিলেন আমেরিকার বন্ধু। আর যখনই তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে চলে গেলেন তখন তিনি হয়ে গেলে পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী। সুতরাং যারাই আমেরকার বন্ধু তারা শান্তিকামী আর যারা আমেরিকার বিরোধী তারা সন্ত্রাসবাদী। আর তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের আস্ত্রসস্ত্র দিয়ে হামলা করতে সাহায্য করে কারা? আমেরিকা।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে সেখানকার মুসলমানদেকে কমিউনিষ্ট বানাবার জঘন্য প্রয়াস চালাচ্ছিল তখন আমেরিকা সাহায্য করেছিল আফগান মুজাহিদীনদেরকে ও শায়খ ওসামা বিন লাদেনকে। গেরিলা আক্রমনের ফলে সোভিয়েত বাহিনীর মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে এবং তারা আফগানিস্তান ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এরপর ৯/১১ এর ভূয়া মামলায় ওসামা বিন লাদেনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগে যুদ্ধ ঘোষনা করে। এরপর দেখা যায় সোভিয়ে ইউনিয়ন যেমন আফগানিস্তানের ভুমিতে সৈন্যবাহিনী দিয়ে দখল করে রেখেছিল ঠিক সেই রকম আমেরিকাও সেখানে সৈন্যবাহিনী দিয়ে দখল করার চেষ্টা করে। এর দ্বারাই বোঝা যায় আমেরিকা যে ওসামা বিন লাদেন ও আফগান মুজাহিদীনদেরকে সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়ন করতে সাহায্য করেছিল তা মূলত তারা আফগানিস্তানকে দখল

করার জন্যই এটা করেছিল । আর সামান্য হলেও তারা এতে সফলতাও পেয়েছে । তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে আফগান মুজাহিদীনদের গেরিলা আক্রমনে যেরকম সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয় । এবং মস্কো থেকে বুঝতে পারে যে জোর জবরদস্তি করে কখনও দেশকে কমিউনিষ্ট বানানো যায় না । তারা ১৯৮৯ সালে আফাগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয় । এটাকে বুশ প্রশাসন বুঝতে পারে নি যে জোর করে আফগানিস্তান দখল করা যাবে না । বুশের এটা দুরদর্শীতার অভাব । ফলে আজ দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত বাহিনীর মতো মার্কিন সেনাও আফগানিস্তানে মারা যাচ্ছে । এমনকি খবরে এমন রিপোর্টও প্রকাশ পেয়েছে যে দীর্ঘ দশ বছরে আফগানিস্তানে তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যত সেনা তালিবানদের হাতে মারা গেছে তার থেকে বেশি আমেরিকান সেনা আত্মহত্যা করেছে । ২০১২ সালে ২১ জন সেনা আত্মহত্যা করে । আমেরিকা থেকে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা সমর্থন না পেয়ে এবং তালিবানদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠতে না পেরে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে । এমনকি অনেক সেনা মানসিক রোগেও ভুগতে আরম্ভ করেছে । তারা সকলেই চিকিৎসাধীন । গত তিন বছরে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত বহু ব্রিটিশ সেনার মধ্যেও মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছে । এটা আমেরিকার উপর আল্লাহর মার নয়তো আর কি ? আমেরিকার জোট বাহিনীর কমান্ডর ম্যাক্রিস্টল ও ব্রিটেনের সেনা প্রধান রিচার্ডস বলেছেন, আফগানিস্তানে আরও সৈন্য না পাঠালে আমেরিকার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । এমনকি আমেরিকার বুদ্ধিজিবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামাও তালিবানদের সাথে আলোচনার ব্যপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করছেন । ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন যে যুদ্ধ করে তালিবানদের পরাজিত করা সম্ভব নয় বরং তাদের সাথে আলোচনা করা একান্ত যুক্তি সংগত । এখন ভাবনার বিষয় তালিবানদের সঙ্গে এখন যে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে তা যদি আফগান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে করা হত তাহলে আফগানিস্তানে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না ।

৯/১১ এর ভুয়া মামলায় ওসামা বিন লাদেনকে ফাঁসানো হয়েছিল কারণ আমেরিকা জনত আমেরিকা জানত ওসামাকে আর তাদের প্রয়োজন নেই । ওসামাকে দিয়ে তাদের যে কাজ করার ছিল সেই কাজ তারা করিয়ে নিয়েছে । তাই তাকে এবার সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিতেই হবে । এরপর ছলে বলে কৌশলে আমেরিকা ইহুদীদের সঙ্গে সংযোগ করে নিজেরাই তাদের ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করে ওসামা বিন লাদেনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল । এবং সেই থেকে ওসামা বিন লাদেন হয়ে গেলেন দুনিয়ার সব থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী । অথচ আমেরুল মোমেনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদ যখন আমেরিকার কাছে প্রমাণ চাইলেন যে ওসামা বিন লাদেনই এই ধ্বংসকান্ডের মূল আসামী তখন আমেরিকা কিন্তু কোন প্রমাণ পেশ করতে পরেনি । বিবিসির একটি সাক্ষাতকারে আমিরুল মোমেনীন হযরত মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ বলেন, “সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা যদি আমাদের মুকাবিলায় আসে তবুও দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে শায়খ ওসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে অর্পন করার জন্য বাধ্য করতে পারবে না । ওসামা আমাদের মেহমান (অতিথি), তাকে আমরা কোন চাপে অথবা কোন লোভে পড়ে কারো হাতে সমর্পন করতে পারিনা । কোন আত্মসম্মানি মুসমান কোন মুসলমানকে কাফেরের হাতে তুলে দিতে পারেনা । আমরা ওসামার সুরক্ষা শেষ নিঃশাস পর্যন্ত

করে যাব এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তার সুরক্ষা নিজের রক্তবিন্দু দিয়েও করে যাব । আমেরিকার সি. আই. এ অপদার্থ এবং বেকার হয়ে গেছে সেজন্য তারা তাদের ব্যার্থ তদন্তকে লুকোবান জন্য প্রত্যেক বিস্ফোরণের দায় ওসামার ঘাড়ে চাপাচ্ছে । ওসামার কাছে এতো পরিমাণ অস্ত্র নেই যে সে এতো দুরে গিয়ে (অর্থাৎ আমেরিকায়) বোমা বিস্ফোরণ করাবে ।"

বিবিসির এই সাক্ষাতকারের পরে আমেরিকা অপমানিত হয়ে নিজের লজ্জা লুকোবার জন্য কিছুদিন পরেই আফগানিস্থানে রাতের অন্ধকারে হামলা করে দিল । শক্তিশালী মিশাইল হামলার ফলে আফগানিস্তানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল বটে তবুও সেই ফরদে কলন্দর আমিরুল মোমেনীনের (মোল্লাম মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ) একটাই কথা যা তিনি আগে বলেছিলেন । এর পর বিবিসি আমেরুল মোমেনীনের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতকার নিল তখন তিনি বললেন,

"পুরো আফাগানিস্থান যদি উলট-পাল ও ধ্বংস হয়ে যায় তবুও শায়খ ওসামাকে কারো হাতে সমর্পন করব না । আমার আত্মভিমান এটা সহ্য করবে না যে কোন মুসলমানকে কাফেরের হাতে তুলে দিই । আমার সম্প্রদায় ইসলামী আত্মভিমানে পরিপুর্ণ এবং আমরা সব সম্প্রদায়ের ভয়াবহ হামলাকে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছি । আমেরিকা যা করতে চাইছে করুক, আর আমরাও যা করতে পারি করে নেব ।"

এর পরেও মোল্লা ওমর মুজাহিদ নিজের কথার উপর কায়েম রইলেন এবং শায়খ ওসামাবিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে অর্পন করলেন না । পরে যখন আফগানিস্থানের শাসনভার মোল্লা ওমরের হাত থেকে চলে গেল তখনও তিনি নিজের কথা ভুলেননি । একবার তিনি সৌদী যুবরাজ ফায়সালকে বলেন,

"যতক্ষন পর্যন্ত আমার শরীরে রক্তের একটি বিন্দুও বাকি থাকবে আমি ওসামার সুরক্ষা করে যাব । যদি আফগানিস্থানের সমস্ত ঘর ধ্বংসও হয়ে যায় এবং আফগানিস্থানের সমস্ত পাহাড় চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় এবং লোহা গলে পানিও হয়ে যায় তবুও ওসামাকে কারো হাতে অর্পন করব না ।"

যখন আমেরিকা শায়খ ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ধ্বংসের জন্য কোন প্রমাণ পেশ করতে পারল না তখন আফগানিস্তানের উচ্চতম আদালত 'ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান' ঘোষনা করে ওসামা বিন লাদেন নির্দোষ । ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আমেরিকা প্রমাণ করতে পারবে না ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসবাদী । আর দুনিয়ার সকল মানুষই জানেন যে আমেরিকা পৃথিবীতে কত সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে । জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

৯/১১ এর হামলা জন্য কি ওসামা বিন লাদেন দায়ী ?

২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের জন্য শায়খ ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করা হয় । বলা হয় পেন্টাগনের এই ধ্বংসকান্ড ওসামা বিন লাদেন ঘটিয়েছেন । কিন্তু আজ পর্যন্ত আমেরিকা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে নি যে ওসামা বিন লাদেনই এই ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়েছেন । তবে আমেরকার ৭৫ জন অধ্যাপক বলেছেন যে ৯/১১ এর ঘটনা আমেরিকা নিজেই ঘটিয়েছে । 'দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া' (The Times of India) পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন অধ্যাপক মন্তব্য করেন এই বিস্ফোরণটা ভিতরের কারও কাজ এবং হোয়াইট হাউসের কিছু রাজনীতিবিদদের পরিকল্পনাতেই টুইন - টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে । আর তাঁদের মতে, এর প্রধান কারণ হল যুদ্ধ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা । এটা একটা ওপেন সিক্রেট । তাদের মধ্যে জোন নামে একজন অধ্যাপক বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করিনা ১৯ জন ছিনতাইকারী আর আফগানিস্তানের কিছু গুহাবাসী এমন একটা পেশাদার কাজ করে বসবে । কোনওভাবে এটা হতে পারে না, তাই আমরা কথা দিচ্ছি আসল সত্যটা অবশ্যই বের করব এবং সকলকে তা জানাব । আমরা সরকারের বানানো কথা বিশ্বাস করিনা ।

তিনি আরও বলেন, আমরা অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী হিসেবে বলছি । আমরা জানি যে লোহার টুইন - টাওয়ারের লোহার বিমগুলি খুব মজবুত ছিল । বিমান বিস্ফোরণের সময় যে তাপের সৃষ্টি হয় সেই তাপে ওই মজবুত বিমগুলি গলে যাওয়ার কথা নয় । এখানে সবকিছু পরিকল্পিতভাবে হয়েছে, সেজন্য পুরো পরিকাঠামো ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে । এই কথা বলার অধ্যাপক স্টিভ জোনসকে অসুস্থাতার জন্য ছুটিতে পাঠানো হয় ।

যাঁরা এই বিমান হামলা হতে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, বিমান দুটি যাত্রিবাহী বিমান হতেই পারে না অথচ আমেরিকার দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, যে বিমান দুটি ছিনতাই করা হয়েছিল । প্রত্যক্ষকারীদের মতে এই বিমান যাত্রিবাহী নয় বরং বিমান দুটি ছিল সামরিক বিমান । এরপর বিমানটি যখন টাওয়ারের কাছাকাছি এল বিমানের ডানা থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল । যাত্রিবাহী বিমানে তো ডানা থাকে গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয় । সুতরাং আমেরিকা যে তথ্যে বলেছে, বিমান দুটি যাত্রিবাহী ছিল সেটা তাদের মিথ্যা কথা । এরপর যাঁরা এই টুইন - টাওয়ার বানিয়েছিলেন তাঁরা বলেছেন, এটা একেবারেই অসম্ভব, কারণ টুইন - টাওয়ারটা এমনভাবে বানানো যে, টর্নেডো ঝড়েও তা কিছু হবে না । তাহলে সামান্য বিমান আঘাতে কিভাবে সেটা ধ্বংস হতে পারে ? বলা হয়েছে, এই বিস্ফোরণের সময় টুইন - টাইয়ারের তাপমাত্রা ছিল ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস । কিন্তু এই তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রি হলেও কিছু হওয়ার কথা ছিল না । এই কথা বলার জন্য একজন অধ্যাপকের চাকরি চলে গিয়েছিল । যাঁরা নিজে মত পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন তাঁদের চাকরি যায়নি ।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, নিউইয়ার্কের চল্লিশ, ষাট, সত্তরতলা এমন অনেক ভবনে আগুন ধরেছে, কিন্তু কোনওটাই এভাবে ভেঙে লুটিয়ে পড়েনি । আমেরিকার ইতিহাসে টুইন - টাওয়ারই প্রথম ভবন যেটা এভাবে একেবারে ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে । ছবিতে আমরা দেখেছি,

ভবন ভাঙতে গেলে বোমা দিয়ে যেভাবে ভাঙা হয় এটা ঠিক সেভাবেই ভেঙে পড়েছে। সেখানে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ফায়ারম্যান যারা ছিল তারা বলেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল ওপর থেকে বোমার সুইচ টিপছে আর বোমা ফাটছে একের পর এক। তাহলে টুইন - টাওয়ার যেভাবে ভেঙেছে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে সরকারের সব প্রমাণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। বলা হয়েছে বিমাচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ জন ছিনতাইকারী এই কাজটি করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন বিমান যেভাবে বাঁক নিয়েছে সেটা ছিল খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাঁরা দীর্ঘদিন আকাশপথে বিমান চালায় তাঁরা বলেছেন, এভাবে বাঁক নেওয়া অসম্ভব। তাহলে চিন্তা করুন কতদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা লোক এভাবে বিমান চালাতে পারে ? বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটা অবশ্যই সামরিক বিমান। সরকা আরও তথ্য দিয়েছে যে, তখন একটা ফোন এসেছিল যে বিমানটা ছিনতাই করা হয়েছে আর যাত্রীরা সবাই সেখানে বন্দি। সেসময় একটা ফোন করেছিল একজন ফ্লাইট অফিসার। সে বলছে, "বিল্ডিং, পানি, ওহ্ ঈশ্বর !" যে সারা বছর বিমানে উড়ে বেড়ায় সে কি নিউইয়ার্কে কখনও বিল্ডিং দেখেনি ? আর একজন লোক বলছিল, "মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম বলছি। মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ? আমাদের ছিনতাই করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস করো।"

এখানে আমার প্রশ্ন, কেউ যদি তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাহলে কেউ নিজের পুরো নাম বলে না বরং নিজে নাম সংক্ষেপে বলে। কারণ, চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ নিজের পুরো নাম বলে না কেননা মা তাঁর ছেলে কণ্ঠস্বর চেনেন। যেমন, আমি যদি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমি এরকম বলি না, "আম্মাজান আমি মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম বলছি।" বরং আমি আমি নিজের সংক্ষিপ্ত নাম বলি যে নামটা আমার মা ভালভাবেই চেনেন। কিন্তু সে ব্যাক্তি বলেছিল মা, আমি আমি মার্ক বিংহ্যাম। যদি মার্ক তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে এভাবে বলবে কেন ? আর ফোনে নির্দিষ্ট দুরত্বের মধ্যে কথা বলা সম্ভব। সমীক্ষা করা হয়েছিল ৩২০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করে কিনা ? ৪০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করার সম্ভাবনা ০.৪ শতাংস। আর ৮০০০ ফুট উপরে সম্ভাবনা হবে ০.১ শতাংস আর ৩২০০০ হাজার ফুট উপরে এই সম্ভাবনা ০.০০৬ শতাংস। অর্থাৎ মোবাইল কাজ করার সম্ভাবনা নেই।

এই প্রামাণ্য চিত্র বলছে আমেরিকার ফোন কোম্পানীগুলি এত উচ্চতায় সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করছে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক বিমানের দুটি ব্ল্যাকবক্স থাকে, যেটা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও কিছু হয় না। অথচ ১০০০ থেকে ২০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রাই সেই বক্সের সব শেষ।

এ সব কিছুই এখন প্রমাণ। এমনকি ওসামা বিন লাদেন স্বয়ং এই হামলাকে নিন্দাজনক বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিরীহ মানুষ, নিরীহ নারী ও শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ ইসলাম তার তীব্র নিন্দা করে।

এবার দ্বিতীয় আক্রমনের কথা বলা যাক, পেন্টাগনের দেওয়ালে একটা গর্ত । টিভিতে দেখানো হয়েছে গর্তটা বিমানের বডির সমান । কিন্তু বিমানের ডানাটা কোথায় গেল ? ডানার আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই পেন্টাগনে । যদি বিমানটা পেন্টাগনে ঢুকে যায় আর ডানা বাইরে থাকে, তাহলে ডানাটা হয় বাইরে থেকে যাবে অথবা দেওয়ালের গায়ে গর্ত হবে । কিন্তু ভবনটিতে কিছুই হয়নি । সব কিছুই যেন সাজানো । এছাড়া লোক বলছে বিমানটা ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেছে । বিজ্ঞান বলে বোয়িং বিমান ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেলে একটা গাড়িও ছিটকে যাবে । একজন প্রাক্তন সেনাকর্তা বলেছেন, এটা শব্দ ছিল একটা মিশাইলের মতো । বিমানের কিছুই সেখানে পাওয়া যায়নি । শুধু একটা যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন পাওয়া গেছে । এমনকি অন্য জায়গায় মাটিতে শুধু একটা গর্ত হয়েছে । এর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে ।

আরও বলা হয়েছে যে World Trade Center ধ্বংসের পর সেখানে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল । ভাবলে অবাক লাগে যে দুই হাজা ডিগ্রি তাপমাত্রায় সব পুড়ে শেষ হয়ে গেল সেখানে শুধু পাসপোর্ট রয়ে গেল । সেজন্য কোন একজন কৌতুক করে বলেছিল, এখন থেকে আমেরিকার সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানানো হবে সেই পাসপোর্ট দিয়ে ।

এছাড়াও প্রখ্যাত ফরাসী লেখক Thierry Meyssan তাঁর L' Effroyable Imposture যার ইংরেজী অর্থ The Horrible Fraud (বীভৎস জালিয়াতি) নামক বইতে তিনি বলেছেন, বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করেছে স্বয়ং মার্কিনিরাই মধ্য এশিয়ায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য । এর ছক কষা হয় হোয়াইট হাউসে এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরে । তিনি বলেন, মার্কিন এয়ারলাইন্স ফ্লাইট - ৭৭ অথবা অন্য কোন মনুষ্যচালিত বিমান বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রে ১১ সেপ্টেম্বর ধাক্কা মারেনি । বিস্ফোরণ ঘটানো হয় মাটি থেকেই । তিনি এ ধারণাও প্রত্যাখ্যান করেন যে আল কায়দা জঙ্গী কর্তৃক চালিত বিমান ট্রেড সেন্টারে ধাক্কা মারে ।

প্রকৃতপক্ষে এই ধাক্কা মারা বিমান দুটি ছিল রিমোট কন্ট্রোল পরিচালিত পাইলটহীন বিমান । ২৭ মে ২০০২ আন্তর্জাতিক পত্রিকা Time H Meyssan কে উদ্ধৃতি করে বলা হয়, বিমানহামলা পরিচালিত হয় মার্কিন অফিসিয়ালদের দ্বারা আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করার অজুহাত হিসাবে ।

সারা বিশ্বে এ কথা প্রচার করা হয় যে ১১ সেপ্টেম্বর একটি বিমান মার্কিন প্রতিরক্ষা পেন্টাগনেও ধাক্কা মারে । প্রকৃতপক্ষে এটা আপাদমস্তক মিথ্যা ও মনগড়া কথা । এই জাহাজের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি । ওই জাহাজে সফরকারীদের কোন লাশ, ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পুড়ে যাওয়া শরীরের অংশবিশেষ পাওয়া যায়নি । সরকারী ভাষ্যানুযায়ী, জাহাজে ৫৮ জন যাত্রী ছিল । অথচ কোন যাত্রীর কোনোরকম মালপত্র, ব্যাগ, অ্যাটাচি কিংবা এ সবের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি । সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা ব্ল্যাকবক্সও পাওয়া যায়নি । কিন্তু এটা সকলেরই জানা যে ব্ল্যাকবক্স ধ্বংস হয়না কোনো অবস্থাতেই ।

মার্কিন ভাষ্যানুযায়ী প্রথম জাহাজ বিশ্ব বানিজ্যিক কেন্দ্রে ধাক্কা মারা সকাল ৮-৪৮ মিনিটে। দ্বিতীয় জাহাজ ৯ টা নাগাদ বিশ্ব বানিজ্যিক কেন্দ্রের দ্বিতীয় টাওয়ারে ধাক্কা মারে। ৯ টার পরেই এও জানা যায় আরও একটি জাহাজ তার রুট থেকে বিপথে চালিত হয়ে ওয়াশিংটন অভিমুখে চলেছে। ৯-৪৫ নাগাদোই জাহাজ পেন্টাগনে ধাক্কা মারে। এত সময়ের ব্যবধান। অথচ আমেরিকার মতো উন্নত প্রযুক্তির দেশে কিছু করা যায়নি, এটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ! যে দেশে প্রতি সেকেন্ডে নযর রাখা হয় প্রতিটি বিষয়ের উপর। পশ্চাৎপদ দেশেও তো এমন ঘটনা কষ্টকল্পনা। আমেরিকার রাজধানীতে নিরাপত্তা এতটাই কম এ কথা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়।

আরব দেশে বহুল প্রচারিত একটি আরবী সাপ্তাহিক 'লজতেমা'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথমে সংবাদসংস্থা খবর দেয় যে পেন্টাগনের সামনে বিস্ফোরক পদার্থ ভরা একটি ট্রাক বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই বুশ প্রশাসন এই সংবাদ অস্বীকার করে। অথচ টিভি চ্যানেলে যে দৃশ্য দেখানো হয় তাতে পেন্টাগনে কোনো জাহাজ ধাক্কা মারছে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। প্রতিরক্ষা বিভাগ যে সব ছবি মিডিয়াকে দেয় তাতেও কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ছবি দেখানো হয়নি। ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে প্রথমেই যেসব সাংবাদিকরা যান তারাও ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের কাছে অনুসন্ধান করে কোনো জাহাজের টুকরো দেখতে পাননি।

সুতরাং ওসামা বিন লাদেন পেন্টাগনে হামলা করেননি। হামলা করেছে আমেরিকা স্বয়ং এবং এর জন্য ওসামা বিন লাদেনকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। কারণ আমেরিকা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিকে দখল করতে চেয়েছিল। আর এই আমেরিকার উপর সন্ত্রাসবাদী হামলাকে ইস্যু বানিয়ে আফগানিস্তানের উপর হামলা চালিয়েছে, তারপর ইরাকের উপর হামলা চালিয়েছে। আমেরিকার এই মুসলিম দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর উদ্দেশ্য কি ? উত্তর একটাই টাকা ও ক্ষমতা দখলের জন্য। যখনই রাজনীতি বিদরা দেখে তারা ভোট হারাচ্ছে তখনই মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে যে, 'হয় আমাকে ক্ষমতায় বসাও নয়তো মুসলমানরা ক্ষমতায় বসবে, শাসন করবে।' তাই আমরিকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা বুশ নিজেই করেছে ক্ষমতা দখলের জন্য এবং এই হামলাকে ইস্যু বানিয়ে মুসলমান দেশগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। আমরিকায় ৯/১১ এর হামলায় যা লোক মারা গেছে ও যা ক্ষয়ক্ষিত হয়েছে তার থেকে মুসলিম দেশে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বুশের হামলায় এবং বেশি লোক মারা গেছে বুশের সন্ত্রাসবাদী হামলায়। বুশের কারণে ইরাকে কেবলমাত্র ৫০,০০০ শিশুরাই মারা গেছে। তাই ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসবাদী নয়, দুনিয়ার সব থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী হল জর্জ বুশ। সুতরাং গান্ধী ঘাতক নাথুরাম গডসের যেরকম ফাঁসী হয়েছে তাহলে ইরাকে, ও আফগানিস্তানের শত শত মানুষের খুনের জন্য বুশের ফাঁসি হবে না কেন ? তাহলে আসুন এই মানবতার চরম শত্রু জর্জ বুশ যে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি।

এছাড়াও আমেরিকা বহু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত। এই আমেরিকা চিলিতে সালভেদোর অ্যালেন্দেকে খুন করেছে, সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচারী পিনোচেতকে মদত জুগিয়েছে। কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বাকে সন্ত্রাসবাদী কায়দায় খুন করেছে, ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরাচারী শাসক

সুহার্তোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন করে লক্ষ লক্ষ কমিউনিষ্টকে নিধন করেছে, সন্ত্রাসবাদী খুনি শাসক জাইরের মাবতুকে উৎসাহ জুগিয়েছে, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোকে, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাতকে, লিবিয়ার গাদ্দাফিকে হত্যা করার জন্য ভাড়াটে ঘাতক লাগিয়েছে। আর এইসব কাজ করেছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ। বরাবরই আমররিকাই সন্ত্রাসবাদীদের মদত যুগিয়েছে বিভিন্নভাবে। আমেরিকাই 'Project X' প্রকল্প তৈরী করেছিল বিভিন্ন দেশে পেশাদার খুনি ও ব্ল্যাকমেলাদের তৈরী করার জন্য। আমেরিকাই 'School of America' নামে রয়েছে সন্ত্রাসবাদী তৈরীর কারখানা। এল. সালভেদরের ডেথ স্কোয়াডের নেতা জেনারের রবার্টো এই 'School of America' এর ছাত্র। পানামার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এক সময় আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ-র (CIA/Central Investigation Agency) এজেন্ট ছিলেন কিন্তু এখন আমেরিকার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার জন্য তিনি এখন আমেরিকার জেলে বন্দি। আমেরিকার বন্ধু হল, আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদী শাসক পি. ডব্লু বোথা, সন্ত্রাসবাদী জেনারেল ম্যানুয়েল নরিয়েগা, নিকারাগোয়ার সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচারী ডিক্টেটর মোসাজা, ফিজির শাসক রাবুকা, ফিলিপিন্স এর মার্কোস, নাইজেরিয়ার সন্ত্রাসবাদী শাসক জেনারেল ডো, গুয়েতামালার সেরেজা। এইসব সন্ত্রাসবাদীরা আমেরিকার স্নেহধন্য। আমেরিকাই ভিয়েতনামে নাপাম বোমা ফেলে হাজার হাজার ঘর জ্বালিয়েছে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। কোরিয়াতে জীবানু আক্রমণ চালিয়েছে। জাপানের হিরোসিমা - নাগাসিকিতে বোমা ফেলে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। এখনও জাপানে পঙ্গু সন্তান জন্ম হয় সেই বোমার প্রতিক্রিয়ায়। আমেরিকাই নিকারাগুয়ায় কন্ট্রাদের মদত দিয়ে সেখানকার গণতন্ত্রপ্রেমীদের হত্যা করেছে। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ-র (CIA/Central Investigation Agency) ১৮৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ৮ বার ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। সাদ্দামকে দমন করার নামে জর্জ বুশের বাবা সিনিয়ার জর্জ বুশ ইরাকে হজার হাজার নিরপরাধ নারী শিশুকে হত্যা করেছে। নিরপরাধ তালিবানদের দমন করার নামে আফগানিস্তানে যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করছে সেগুলোর জবাব দেবে কে ? তাহলে আসুন মানব জাতির চরম শত্রু আমেরিকা ও তার গোয়েন্দা সংস্থা যে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি।

আজমল আমীর কাসাব কি ২৬/১১ হামলার জন্য দায়ী ?

আজমল আমীর কাসাবকে ভারতীয় এজেন্সি দ্বারা ২০০৬ সালের আগে নেপাকের কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের একটি রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে, সি. এম ফারুকী নামক উকিল দাবী করেছিলেন যে মুম্বাই হামলার একমাত্র জীবিত অভিযুক্ত আজমল আমীর কাসাবকে নেপালী ফোর্সের সাহায্যে ভারতীয় এজেন্সি দ্বারা ২০০৬ সালে কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, রাওয়ালপিন্ডি থেকে দ্য নিউজ রিপোর্টে দেওয়া খবর।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘‘সি. এম ফারুকী নামক উকিল’’ বলেছে যে নেপালী ফোর্স ২০০৬ সালের আগে আজমল আমীর কাসাব সহ প্রায় ২০০ জন লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং এই ব্যাপারে তার আবেদন নেপালের সুপ্রিম কোর্টে তার আবেদন পেন্ডিং পড়ে আছে।’’

উকিল এও দাবী করে যে সে পাকিস্তান এবং ভারত সরকারকে চিঠি লেখে এবং এই ব্যাপারে সে নেপালে প্রেস কনফারেন্সও করে।

দ্য নিউজ রিপোর্টে আরও লেখা হয়েছে যে, ‘‘নেপাল থেকে গ্রেফতার করা লোকেরা ব্যাবসার জন্য আইনি ভিসা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল কিন্তু ভারতীয় এজেন্সিদের এটা অভ্যাস যে নেপাল থেকে পাকিস্তানিদেরকে গ্রেফতার করে এবং তার পর পাকিস্তানকে বদনাম করার জন্য মুম্বাইয়ের মতো ঘটনায় তাদেরকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়।’’

এরপর এই ব্যাপারে একটি সংবাদ এজেন্সি কথা বলার জন্য নেপালের গৃহ মন্ত্রালয়ের প্রবক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলে যে তাদের কাছে এমন কোন গ্রেফতারের সংবাদ নেই যে তাদেরকে ভারতীয় এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছিল। ২১ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের সকাল পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, নেপালী বিদেশ মন্ত্রালয় এটা স্পষ্ট করেছে যে আজমল কাসাবের গ্রেফতারীর খবর মিথ্যা এবং এই খবর নেপালের চিত্র নষ্ট করার জন্য পাকিস্তানি মিডিয়া দ্বারা প্রয়াস করা হয়েছে। নেপালের বিদেশ মন্ত্রালয় এর পরে বলেছে যে, কাসাবকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তানি উকিলের আবেদনকে খারিজ করা হয়েছে। আবেদনকে আইনী ব্যাবস্থার অসঙ্গতি থাকার জন্য খারিজ করা হয়।

এখানে নেপালের বিদেশ মন্ত্রালয়ের রিপোর্টকে সামনে রাখে বলা যায় যে আজমল আমীর কাসাবের নেপালে গ্রেফতার হবার কথা একেবারে অস্বীকার করেনি। তারা এটাই বলেছে যে এই ব্যাপারে তাদের কাছে কোন সংবাদ নেই। এখানে নেপালের বিদেশ মন্ত্রালয়ের রিপোর্ট পরস্পর বিরোধী। কেননা একজায়গায় তারা বলছে যে কাসাবকে গ্রেফতারের কোন সংবাদ তাদের কাছে নেই, আবার অন্য যায়গায় তারা বলছে যে কাসাবের মুক্ত হবার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার যদি না করা হয় তাহলে মুক্ত হবার আবেদন খারিজ করার প্রসঙ্গ আসছে কেন? উত্তর একটাই যে তৎকালীন নেপালের নরেশ এবং ভারতের ব্রাম্ভন্যবাদীদের সঙ্গে এক সৌহাদ্রপুর্ন সম্পর্ক ছিল। আলাদাভাবে এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে ব্রাম্ভন্যবাদী শক্তি ভারতীয় সংবিধানকে নষ্ট করার জন্য এবং ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিল যেমন হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে এ. টি. এত দ্বরা তদন্তে সামনে আসে। এটাই তথ্য যে নেপালী ফোর্স আজমল আমীর কাসাবকে গ্রেফতার করে এবং তাকে ব্রাম্ভন্যবাদী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সির হাতে তুলে দেয়।

এবং বাস্তব যে পাকিস্তান থেকে যেসব সন্ত্রাসীরা মুম্বাইয়ের হামলার জন্য বোটে চড়ে এসেছিল এবং বধবার পার্কে এসেছি তাদের দলে ছিল না। অর্থাৎ সে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেনি। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যিনি সন্ত্রাসবাদীদের বোটে করে নামতে দেখেছিলেন এবং

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেই অনিতা রাজেন্দ্র উড্ডাইয়া ছয়জন লোককে এয়ার বোর্ট থেকে নামতে দেখেছিলেন এবং পরে তিনি জেজে হাসপাতালালে সেই ছয়জন ব্যাক্তির লাশকে চিহ্নিত করার জন্য এসেছিলেন তিনি বলেছেন, তিনি আজমল আমীর কাসাবের জন্য বলেছিলেন যে সে সেই বোর্টে ছিল না ।

অর্থাৎ আজমল আমীর কাসাব ২৬/১১ এর জন্য কোনক্রমেই দায়ী নয় । যেহেতু সি. এস. টি কামা রঙ্গভবন লেনে ভারতীয় ব্রাম্ভন্যবাদী সন্ত্রাসবাদীরা হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল এবং পাকিস্তান থেকে ১০ জন সন্ত্রাসবাদী আসেনি ৮ জন এসেছিল । সেজন্য দুইজনকে গোঁজা দিয়ে পুরণ করার জন্য আজমল আমীর কাসাবকে বলীর পাঁঠা বানানো হয়েছে । আর কাসাবকে নিরপরাধ জেনেও ফাঁসি দেওয়া হয়েছে । যেহেতু ভারতীয় এজেন্সি কাসাবকে ২০০৬ সালে নেপাল থেকে গ্রেফতার করে মুম্বাই হামলায় কাসাবকে ফাঁসানো হয়েছে বিচারক জানেন যে ভারতীয় এজেন্সিকে মিথ্যা প্রমান করে দিলে সারা বিশ্বে ভারতের মুখে চুনকালী পড়ে যাবে যে ভারতীয় গোয়েন্দারা কিরকম একজন নিরপরাধ ব্যাক্তিকে বলীর পাঁঠা বানিয়েছে ।

আর আজমল আমীর কাসাবের যে বহুলপ্রচারিত চিত্র দেখানো হয় তাও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বির (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) বানানো । আই. বি মুম্বাই হামলার পরে স্টেশনে কাসাবকে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফার দিয়ে চিত্রটি বানিয়ে প্রচার করেছে । মুম্বাই মিরর পত্রিকার ফটোগ্রাফার সেবাস্টিয়ন ডিসোজার দাবী অনুযায়ী সি. এস. টির উপনগরীয় অংশে এই ছবি তোলা হয় এবং মুম্বাই মিরর পত্রিকার ২৭ নভেম্বর ২০০৮ সালে তা ছাপা হয় অর্থাৎ ঘটনার পরের দিন ছবি তোলা হয় এবং এই ছবি প্রায় সব পত্রিকায় ছাপা হয় । এবং সেই ছবিটার জন্য দাবী করা হয় যে সেটা ঘটনাস্থলে সি. সি. টি. ভি দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে । ক্যামেরাম্যান সেবাস্টিয়ন ডিসোজার তোলা কাসাবের ছবি আর সি. সি. টি. ভি দ্বারা উদ্ধার করা ছবি কিভাবে একই রকম হয়ে গেল ? এবং কিভাবে একই রকম এঙ্গেল, একই রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়ে গেল ? দৈনিক মারাঠী পত্রিকার, পুনার সংখ্যায় ২৮ নভেম্বর ২০০৮ সালে যখন কাসাবের এই চিত্র প্রকাশিত হয় তখন সি. সি. টি. ভির হাওয়ালা দেওয়া হয় । এছাড়াও চিত্রের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যান্ত্রিক বিশেষজ্ঞরা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । রাষ্ট্রিয় সাহারা, ৫ জানুয়ারী ২০০৯ সালের একটি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে কাসাবের এই চিত্র বানানো মনে হচ্ছে কেননা সি. এস. টি যেরকম ট্রেন স্টেশনের এঙ্গেল অনেক ছোট, অথচ এই এঙ্গেল বড় হওয়া উচিৎ ছিল এবং উঁচু জায়গা থেকে শুট করার কথা ছিল ।

২৮ নভেম্বর ২০০৮ সালের একটি সংখ্যায় ডি. এন. এ এর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, "স্টেশনে লাগানো সি. সি. টি. ভি ক্যামেরা দুইজন সন্ত্রাসবাদীর ছবি তুলেছে পরে বোঝা যায় যে সেই দুটি চিত্র আজমল আমীর কাসাব এবং আবু ডেরা ইসমাইল খান ।" এই কথাটা কি সত্যি ? যদি তাই হয় তাহলে ফুটেজ কোথায় ?

'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র পুনা সংখ্যার ২৯ নভেম্বর ২০০৮ সালের একটি সংখ্যায় আজমল আমীর কাসাবের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে ফোটোগ্রাফারের কোন নাম নেই । ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ছবিটি ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রি কোন হিসাবে নেওয়া হয়েছে । এটা কি করে সম্ভব যে সময় সন্ত্রাসবাদীরা পাগলের মতো চোখ বন্ধ করে গুলি চালাচ্ছে সেই সময় সেই ফোটোগ্রাফারকে জীবিত ছেড়ে দেবে তাতেও আবার যে এরকম এঙ্গেলে, জুম (Zoom) করে ছবি তুলছে ?

সামনে থেকে এবং উঁচু থেকে তোলা আর একটি কাসাবের চিত্র টাইমসের দৈনিক মারাঠী মাহারাষ্ট্র টাইমস এর ২৭ নভেম্বর ২০০৮ সালে অর্থাৎ ঘটনার ঠিক পরের দিন ছাপা হয় এবং বলা হয় যে এই চিত্র 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র ক্যামেরাম্যান শ্রীরাম বেরনেকে তুলেছেন । কিন্তু সেই দিনই সেই চিত্রটাই মারাঠী দৈনিক লোকমত, মুম্বাই থেকে ছাপা হয় । তাহলে প্রতিদ্বন্দির সময় একটাই চিত্র ক্যামারাম্যান কেন নিজের পত্রিকার সাথে অন্য পত্রিকাকেও তাঁর তোলা ছবি ছাপতে দিলেন ?

দ্বিতীয় সন্ত্রাসবাদী (ইসমাইল খান) এর চিত্র পুনে মিরর এর ৩ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু ফটোগ্রাফারের কোন নাম নেই ।

সুতরাং ২৬/১১ এর সময় আজমল আমীর কাসাবকে যেরকম বলীর পাঁঠা বানানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা বিভাগ হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করে নিদের দোষ ঝাড়ার জন্য কাসাবকে ফাঁসিয়েছে তার কাহিনী পুর্নাঙ্গ করার জন্য কাসাবের চিত্রও তারা বানিয়ে প্রচার করে অপরাধ মুক্ত হবার চেষ্টা করেছে ।

মুম্বাই হামলা ভারতের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়

নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ২৬/১১ এর মুম্বাই হামলা ভারতের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় । পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ও ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ আই. বি'র সহযোগিতায় ভারতীয় ব্রাম্ভন্যবাদী সন্ত্রাসীরা একসঙ্গে এই হামলা করে । তবে আই. বি' ও ব্রাম্ভন্যবাদীরা পাকিস্তান দ্বারা এই হামলার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যাতে সুবিধা বুঝে হামলার সময় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করতে পারে এবং এর দায় পাকিস্তানের উপর পড়ে । যেহেতু কারকারে ভারতের ব্রাম্ভন্যবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন । তদন্ত যাতে আর আগে যাতে এগোতে না পারে সেজন্য ব্রাম্ভন্যবাদীরা কারকারেকে হত্যা করে নিজেদের রাস্তা পরিস্কার করতে চেয়েছিল এবং এতে তারা অনেকটাই সফলও হয়েছে ।

এই হামলায় ১৪৮ জন্য ভারতীয় এবং ২৬ জন বিদেশী মারা যায় । যেসব বিদেশী মারা যায় তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হল,

নাম	দেশ
ব্রেট গিলবার্ট টেলর	অষ্ট্রেলিয়া
মাইকেল স্টুয়ার্ট মস	কানাডা
জুগরান হেডরিজ রোডলফ	জার্মান
স্টিফ ড্যাপেন	জার্মান
এলিযাবেথ রাসেল	কানাডা
আন্দাস ডুয়ান টেভেনা	ইউ. কে
টি. সুডা দে লাসী	জাপান
অ্যান্টিনো দে ল'রেন্জা	ইতালী
গিরাহা কানমানি অ্যলিয়াস জিনা	থাইলেন্ড
এলান মাইকেল সেয়ার	আমেরিকা
হেলেন কলোনী/নোয়ামিলিয়া স্কের	আমেরিকা
লোক্যু মাইকেল কুডেডান	সিঙ্গাপুর
সান্দিপ জয়সওয়াল	আমেরিকা
রাবাকা গুবিয়াম ভোল্টকি	ইসরাইল
রুবাই গ্র্যাবিয়াল ভোল্টাসী	ইসরাইল
বেন জিয়াম সিরোমান	ইসরাইল
ডগলাস জাস্টিন মার্কেল	অষ্ট্রেলিয়া
চেতিলাল মুনিষ	মরিসাস
জারা বারবারা	নেদারল্যান্ড
টিটাল বো অ্যারি	ইসরাইল
নোমি রুবি নিয়াম	ইউ. এস. এ
ইয়াকেভেদ মসো ওয়ার্পেজ	ইসরাইল
হেমা কাসি পিল্লাই	মালেশিয়ান
বুর্কিও রাল্পস	জার্মান
মুরাদ আমার্সে	ফ্রেন্চ
লুমিয়া আমার্সে	ফ্রেন্চ

যেসব স্থানে যাদের মৃত্যু হয় তাদের তালিকা,

স্থান	মৃতের সংখ্যা
ছত্রপতি শিবাজী রেলওয়া টার্মিনাস	৫৬
ক্যাফে লিওপোল্ড	১০
তাজ হোটেল	৩৬
ওবেরয় ট্রিডেন্ট হোটেল	৩২
নারিমান হাউস	৬
কামা হাসপাতাল	৮
ভিল্লি পার্লের ট্যাক্সি ব্লাষ্ট	২
উইডি বার্নারে ট্যাক্সি ব্লাষ্ট	৩

সি. এস. টিতে যেসব লোক মারা গেছিল তাদের ৪৬ জনের মধ্যে ২২ জন মুসলমান ছিল । এই মুসলমানদেরকে কে মেরেছিল ? আই. দ্বারা যে ২ জন সন্ত্রাসবাদী কারকারেকে হত্যা করতে গিয়েছিল সেই ২ জন ব্রাম্ভন্যবাদী সন্ত্রাসী ২২ জন মুসলমানকে হত্যা করেছিল । কাসাবের ব্যাপারে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৯ নভেম্বর ২০০৮ সালে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "তাকে চোখ বন্ধ করে বিদেশীদের হত্যা করতে বলা হয়েছে এবং মুসলমানদের বাঁচাতে বলা হয়েছে ।"

পত্রিকার সেই সংখ্যাতেই বলা হয়েছে যে আব্বাস আনসারী এবং তার স্ত্রী এবং তার পরিবারের অন্যান্য চারজনকে সি. এস. টিতে গুলি করে হত্যা করে, তারা ইদের জন্য বাড়ি ফিরছিল । এবং সি. এস. টিতে মৃতদের মধ্যে ৪০ শতাংস মুসলমান ছিল । দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার ৩ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের একটি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, "গত বুধবার টার্মিনাল স্টেশানে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বন্দুকধারীরা চোখ বন্ধ করে গোলাবারীতে ২২ জন নিরীহ মুসলমানকে মৃত্যুর ওপারে পাঠিয়ে দেয় । সন্ত্রাসবাদীরা যাত্রী এবং রেলওয়ে পুলিশ জোয়ান সহ মোট ৫৮ জনকে হত্যা করে ।"

পরে বোঝা যায় যে সি. এস. টিতে ৫৮ জন নয় ৫২ জন মারা গেছিল এবং তাদের মধ্যে ছয়জন পুলিশ ছিল অথবা অন্য কর্মচারী, সুতরাং সি. এস. টি ঘটনায় সাধারন মানুষ ছিল ৪৬ জন তাতে ২২ মুসলমান অর্থাৎ ৪৮ শতাংস মুসলমান ছিল । সেসব মুসলমানদেরকে দেখেই বোঝা যায় যে তারা মুসলমান কেননা, তাদের মুখে দাড়ি ছিল এবং মাথায় টুপি ছিল এবং মহিলারা বোরকা পরে ছিলেন । সুতরাং সি. এস. টি স্টেশনে সন্ত্রাসবাদীরা জেহাদী কোনক্রমেই হতে পরে না কেননা আগের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে জিহাদীদেরকে (কাসাব) হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে চোখ বন্ধ করে বিদেশীদেরকে গুলি মারতে এবং মুসলমানদেরকে বাঁচাতে ।

হাসপাতালে যেসব সন্ত্রাসবাদীরা প্রবেশ করেছিল তারা স্বচ্ছন্দে মারাঠী ভাষায় কথা বলছিল । যেমন, মহারাষ্ট্রে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র, ২৮ নভেম্বর ২০০৮ সালের একটি সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছে যে, "হাসপাতালে প্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদীরা সেখানকার দুইজন ওয়াচম্যানকে হত্যা করে এবং তারপর উর্দীবিহীন দাঁড়ানো তৃতীয় কর্মচারীকে স্বচ্ছন্দ মারাঠী ভাষায় প্রশ্ন করে যে, 'তুমি কি এখানে কাজ করো ?' কর্মচারীরা সন্ত্রাসবাদীদের পায়ে ধরে বলে যে, 'আমি এখানে কাজ করিনা, হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমার স্ত্রীকে এখানে ভর্তী করেছি ।' তারা ধমক দিয়ে বলে যে, 'তুমি সত্য কথা বলছো তো ?' সেই ব্যাক্তি জবাব দেয়, 'আমি সত্য কথা বলছি, মায়েক দিব্যি ।' তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় ।"

পত্রিকায় এর পরেই বলা হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদীরা অতিরিক্ত পুলিশ অশোক কামটে, এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে এবং বিজয় সালেস্করকে গুলি করে হত্যা করে ।

এখানে স্পষ্ট যে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা মারাঠী জানে না তাহলে হেমন্ত কারকারেকে হাসপাতানে যার গুলি করে হত্যা করল তারা মারাঠী ভাষায় কথা বলল কি করে ? পাকিস্তানের ভাষা হল উর্দূ এবং পাঞ্জাবী । তারা মারাঠী ভাষা জানে না । মারাঠী কেবল মহারাষ্ট্রের মানুষই বলতে পারে । সুতরাং হেমন্ত কারকারেকে যারা হত্যা করেছে তারা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা । পাকিস্তানের নয় । আগেই বলেছি যে যেহেতু কারকারে ব্রাম্ভন্যবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা বানচাল করার জন্যই তাকে ব্রাম্ভন্যবাদীরা হত্যা করে । এর আগেও বলেছি যে হেমন্ত কারকাকেকে ব্রাম্ভন্যবাদীরা ফোন করে হত্যার হুমকী দেয় যা তিনি কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংকে ফোন করে বলেন এবং দিগ্বিজয় সিং সংবাদ মাধ্যমকে তার প্রমানও দেন ।

মুম্বাই হামলার সময় সন্ত্রাসবাদীরা যে সিম কার্ড ব্যাবহার করেছিল তা মহারারাষ্ট্রের সাতারা জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল । ২৬ নভেম্বরে সি. এস. টি তে পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যখন মারামারি হয় তখন সন্ত্রাসবাদীমধ্য মধ্যে একজনের মোবাইল নিচে পড়ে যায় । যখন পুলিশ তা কব্জ করে নেই এবং তদন্ত করে তখন দেখা যায় যে সন্ত্রাসবাদীরা এই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং এর সিম কার্ড সাতারা জেলার একজন ব্যাক্তির নামে ছিল । সি. এস. টি তে পাওয়া BSNL এর আর একটি সিম কার্ডও সাতারা জেলার একজন মহিলার নামে ছিল ।

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে সি. এস. টি তে হামলাকারী সন্ত্রাসবাদীরা আজমল আমীর কাসাব ও ইসমাইল খান ছিলেন না বরং সাতারা জেলার সিমকার্ড ব্যাবাহারকারী ব্যাক্তিদের মধ্যে কোন একজন ছিলেন যারা সম্ভবত মহারাষ্ট্রের ছিলেন । অভিযোগ পত্রে দুটি মোবাইল ফোনকে যা পুলিশ কব্জায় করেছিল তা তোলা হয় নি কারণ এই হামলার মুল মাস্টারমাইন্ড আই. বি ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানত যে অভিযোগপত্রে এই দুটি মোবাইল অভিযোগ যদি তোলা যায় তাহলে তাদের মনগড়া কাহিনীর রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে ।

এবং এটাও বাস্তব যে সেই ২৮৪ ফোনের মধ্যে আজমল আমীর কাসাব ও ইসমাইল খানের কাছে একটাও ফোন আসেনি । সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, "৫৮ ঘন্টার ঘেরাবন্দীর সময়ে বন্দুকধারীদের কাছে মোট ২৮৪টি ফোন আসে । তার মধ্যে ৪১টি ফোন তাজ হোটেলের বন্দুকধারীদের কাছে আসে এবং পাকিস্তানের তাদের প্রভূদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে ।" (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১২ জানুয়ারী, ২০০৯, মুম্বাই অপরাধ শাখা ও আই. বি'র সূত্র অনুযায়ী)

সংবাদ পত্রে আরও বলা হয়েছে যে, "ওবেরয় এবং ট্রাইডেন্ট হোটেলের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ৬২টি ফোন আসে । অপরদিকে নরীমান হাউসসের বন্দুকধারীদের কাছে ১৮১টি ফোন আসে ।" (ঐ পত্রিকা)

অপরদিকে সি. এস. টি র উপর হামলাকারীদের কাছে অর্থাৎ হেমন্ত কারকারেরকে যারা হত্যা করেছে তাদের কাছে একটাও ফোন আসেনি । সুতরাং আজমল আমীর কাসাব ও

ইসমাইল খান পাকিস্তানের যেসব সন্ত্রাসীরা মচ্ছিমার কলোনী হয়ে বোটে করে সাউথ মুম্বাইয়ে পৌঁছেছিল তাদের দলের ছিল না । কারণ, কাসাবকে ২০০৬ সালে নেপালর কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার করে এনেছিল এবং যখন পাকিস্তানিদের দ্বারা মুম্বাই হামলা হলে সেই সুযোগে ব্রাম্ভন্যবাদীরা আই. বি ও মুম্বাই অপরাধ শাখার অফিসাররা চক্রান্ত করে হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করে হত্যাকারী হিসাবে গোঁজামিল দেওয়ার জন্য আজমল আমীর কাসাবকে বলীর পাঁঠা বানিয়েছে । অর্থাৎ উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে ব্রাম্ভন্যবাদীরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে । সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করে সত্য কথাই বলেছেন,

সত্য সেলুকস ! কি বিচিত্র এই দেশ !

মুম্বাই হামলার কয়েকটি দৃশ্য

এই সেই মাচ্ছিমার কলোনী যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা বোটে করে অবতরন করেছিল

Place of arrival- Machchimar Colony, South Mumbai

এই সেই সি. এস. টি রেলওয়ে স্টেশন যেখানে ব্রাম্ভন্যবাদী সন্ত্রাসীরা হেমন্ত আক্রমন করে হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য এবং ২২ জন মুসলমানকে হত্যা করে ।

CST after the attack

এটা হল গুড়গাঁও চৌপাটি যেখানে ইসমাইল খানকে পুলিশ এনকাউন্টার করে এবং তথাকথিত ভাবে আজমল আমীর কসাবকে গ্রেফতার করে মিথ্যা কেস সাজানোর জন্য ।

The police encounter at Girgaum Chowpatty- CCTV image

এটা হল ক্যাফে লিওপল্ড যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা ১০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ।

Café Leopold after the attack

এই হল তাজ হোটেল যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা ৩৬ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ।

Fire in the Taj hotel during the siege

The Taj Hotel during the siege

এই হল তাজ নারিমন হাউস যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা ৬ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ।

Nariman House during the encounter between NSG commandoes and the militants

এই হল ইন্ডিয়ান কমান্ডো যাঁরা হেলিকপ্টারে করে নেমে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রত্যেককে মৃত্যুর ওপারে পাঠিয়ে দেন ।

Indian Commandoes being dropped on the roof of Nariman House

এই সেই আজমল আমীর কাসাব যাকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ২০০৬ সালের আগে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার করে এবং তারা নিজেরা সি. এস. টি তে সন্ত্রাসবাদী হামলা করে কাসাবকে বলির পাঁঠা বানায় । অথচ ২৬/১১ এ কাসাবের কোন হাতই ছিল না ।

Azmal Ameer Kasab

২৬/১১ এ মৃত হামলাকারীদের নাম

২৬/১১ এর হামলায় যে ৮ জন হামলা করেছিল তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হল,

১) বাবর খান @ আবু আকাসা (২৫ বছর বয়স, মুলতান, পাকিস্তান)
২) নাসীর @ আবু ওমর (২৩ বছর, ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান)
৩) সোয়াইব @ আবু সাহাব (২১ বছর, শাক্কাগড়, নারোভাল, শিয়ালকোট, পাকিস্তান)
৪) নাযীর @ আবু ওমর (২৮ বছর, ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান)
৫) হাফিয আরশাদ @ আবু আব্দুর রহমান (২৩ বছর, মুলতান, পাকিস্তান)
৬) জাভেদ @ আবু আলী (২২ বছর, ওকারা, পাকিস্তান)
৭) ইসমাইল খান (২৫ বছর, ডেরা ইসমাইল খান, পাকিস্তান)

পশ্চিমবঙ্গে এন. আই. এ সন্ত্রাস

বর্ধমানের খগড়াগড়ের বিস্ফোরণ কান্ডের পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজার নামে নিজেরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অবতীর্ন হয়ে মুসলমানদেরকে হেনস্থা করছে । যেকোন মুসলমান যুবককে যেখানে সেখানে গ্রেফতার করে তদন্তের নামে প্রহসন শুরু করে দিয়েছে । এই ব্রাম্ভন্যবাদী NIA ভূয়া যুক্তি খাড়া করে যেকোন মাদ্রাসাকে তদন্তের নামে খানাতল্লাসী শুরু করেছে । তাদের যুক্তি যে এইসব মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্ররা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত সেজন্য মাদ্রাসায় খানাতল্লাসী শুরু করা হয়েছে । এটা সম্পূর্ণ ভূয়া যুক্তি কেননা আজ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসার ছাত্রকে NIA সন্ত্রাসবাদী প্রমান করতে পারেনি । আর ভবিষ্যতেও প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ । তবে আগে যেমন NIA এর জনক I.B

(Intelligence Burou) ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ যেরকম নিজেরা সি. এস. টি রেলওয়ে স্টেশনে সন্ত্রাসবাদী হামলা করিয়ে আজমল আমীর কাসাবকে বলীর পাঁঠা বানিয়ে অভিযোগ মুক্ত হয়েছে সেরকম NIA ভবিষ্যতে যদি কোন মাদ্রাসার ছাত্র বা মাদ্রাসার শিক্ষককে বলীর পাঁঠা বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার ।

NIA ইতিমধ্যে আমজাদ শেখ, মালদার ১৬ মাইল এলাকা থেকে জিয়াউল হক, গুয়াহাটি থেকে দাঁতের চিকিৎসক শাহনুর আলমের স্ত্রী সুজেনা বেগমকে, সাজিদ শেখ, সাজিদের স্ত্রী ফাতেমা, হায়দ্রাবাদ থেকে মায়ানমারের মুহাম্মাদ ওরফে খালিদ, কোলকাতা বিমানবন্দর থেকে রহমতুল্লাহকে, পূর্বাস্থলী থানার খড়দত্তপাড়ার হাসেম মোল্লা, আব্দুল হাকিম প্রভৃতিদেরকে গ্রেফতার করেছে কিন্তু কোনকিছু প্রমাণ করতে পারিনি ।

NIA এর এ যেন আজব তামাসা । তাঁরা যেন সারা বাংলা জুড়ে শুধু জঙ্গিসূত্র পাচ্ছেন কিন্তু কাউকে জঙ্গি বলে প্রমাণ করতে পারছেন না ।

বর্ধমানে খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর NIA বলেছিল যে এটা ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের হাত ধরে আল কায়দা করেছে । কিন্তু এখন তারা ভোল পালটে বলছে যে এই কাজ জামাআতুল মুজাহিদীনের । বাংলাদেশের জামাআতুল মুজাহিদীন গোষ্ঠী নাকি ভারতবর্ষকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার জন্য এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । কি আজব প্রহসন ! এই রকম ধরণের কোন তথ্য রাঁচীর পাগলাগরদেরও কেউ দেয় না । যা আমাদের দেশের NIA নামক পাগলা প্রতিষ্ঠান ও তাদের সমর্থক ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া গোষ্ঠী দিচ্ছে । যে বাংলাদেশের তথাকথিত মুজাহিদীনরা এখনো পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারলো না এবং সেখানে শরীয়াতি আইন প্রনয়ণ করতে পারলো না সেই বাংলাদেশের গরীব মুসলমানরা নাকি ভারতকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবে এবং এখানে নাকি শরীয়াতী আইন প্রনয়ণ করবে । এই কথা NIA এর পাগলা গারদে যারা বসে আছে তাদেরকে বোঝাবে কে ? কোন পরিক্ষায় পাশ করে তারা NIA এর মতো গোয়েন্দাবিভাগে যোগদান করেছেন একমাত্র আল্লাহই জানেন ।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যার সময় নবদিগন্ত শিল্পনগরীতে NIA অফিসের সামনে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয় । নবদিগন্তের এ. এন ব্লকের উলটোদিকে রয়েছে সি. আর. পি. এফের ৩ সিগন্যাল ব্যাটেলিয়ানের ক্যাম্পাস । তার ভিতরেই অস্থায়ী অফিস করেছে NIA তাহলে সেখানে আর কারা বোমা বিস্ফোরণ করতে যাবে ? সম্ভবত এই বিস্ফোরণ করেছে NIA অথবা সি. আর. পি এফের কোন ব্যাক্তি ।

আমাদের একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আছে এবং তারা ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার প্রয়াস চালাচ্ছে আর NIA তাদের এটা করতে সাহায্য করছে । আর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রবেশ করার চেষ্টা করছে সেজন্য প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনধরণের অপপ্রচার চালানো যাতে এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি বিনষ্ট হয় এবং তাতে বিজেপি যেন রাজনৈতিকভাবে মজবুত হয় । কারণ বিজেপির

রাজনৈতিক খেলা হল সাম্প্রদায়িকতার খেলা । তারাই গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে নরেন্দ্র মোদী সেখানে জিতেছে এখন তারা বাংলার মাটিকে গুজরাট বা ভাগলপুরের মতো কিছু একটা করে রাজনৈতিকভাবে মজবুত হতে চায়ছে । এবং বিজেপি এই খেলায় NIA কে কাঠপুতুলের মতো ব্যাবহার করছে আর NIA ও তাদের ক্রীড়ানক হয়ে আঙ্গুলের ইশারায় নাচছে ।

ব্রম্ভন্যবাদী শক্তিগুলো ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার জন্য উদ্বিগ্ন । আর এই কাজে পুর্ণরুপে সাহায্য করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA ও অন্যান্য গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো । কিন্তু তাদের চক্রান্ত কোনদিন সফল হবে না । একদিন না একদিন তাদের ষড়যন্ত্র মানুষের সামনে উলঙ্গে হবেই হবে এবং তারা নিজেদের মুখ লুকোবার জায়গা পাবে না । কারণ আল্লাহ বলেছেন, “কুল জাআল হাক্ক, ওয়া যাহাকাল বাতিল । ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।” অর্থাৎ যখন সত্যের আগমন হয় তখন বাতিল পলায়ন করে । নিশ্চয় বাতিল পলায়নকারী ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামদের অবদান

যে মাদ্রাসাকে উৎখাত করার জন্য আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট ভারতীয় মিডিয়া ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা উঠেপড়ে লেগেছে সেই মাদ্রাসার ছাত্ররা অর্থাৎ উলামায়ে কেরামরাই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সময় এই বুদ্ধিজীবিদের পুর্বপুরুষরা বৃটিশদের পদলেহন করছিলেন এবং উঁচু পদে চাকরি করার জন্য নিজেদের মা বোনকেও বৃটিশদের শয্যাগৃহে পাঠাচ্ছিলেন ।

ভারতকে স্বাধীন করার জন্য যে কুরবানী উলামায়ে কেরামরা দিয়েছেন অন্য কোন সম্প্রদায় তা দেয়নি । তাই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব বলেছেন, “১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মুসলমানদের অবদানই বেশী । দেশের জন্য তারা যে কুরবানী দিয়েছেন অন্য কোন জাতি সে কুরবানী দিতে পারেনি । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫২/৫৩ হাজার মাওলানাকে গুলি মেরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল । এই কথা আজ জোর গলায় বলছি । তার কারণ সেই সময় কিছু লোক ইংরেজের দালালী ও পক্ষপাতিত্ব করছিল । স্বাধীনতার পর তারা সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশ দরদী ও দেশ ভক্ত হয়ে যান ।” (কোলকাতা নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষন, তাং ১৬/১০/১৯৯৭)

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মূল নায়ক সম্পর্কে মিঃ হ্যারিংটন টমসন বলেছেন, “আমি আগেই বলেছি, ৫৭ বিদ্রোহের মূল নায়ক হিন্দু সম্প্রদায় নয়, মুসলিমদের ষড়যন্ত্রের ফলেই এই বিদ্রোহ হয়েছিল ।” (রাভিলিউশন ইন ইনডিয়া এবং কুটওয়্যার পলিশি, আমাদের পূর্বসুরী ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১২)

লর্ড ক্যানিং বলেছেন, “মহাবিদ্রোহ দমন করার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা অক্টোবর এলাহাবাদের মহাবিদ্রোহের তিন প্রধান সমরনায়ক মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), মাওলানা

রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) ও হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ) ব্যাতিত সমস্ত উদ্দেশ্যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষনা দেন ।" (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা-২৭)

সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক মিষ্টার টমসন বলেছে, "দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে খয়বার পর্যন্ত এরুপ কোন গাছ ছিল না, যার ডালে উলামায়ে কেরামের গর্দান ঝুলেনি ।" তিনি আরও বলেন, "আলেমদেরকে শূকরের চামড়ার ভিতরে ভরে জ্বলন্ত চুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল । লাহোরের রাবী নদীতে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ৮০ জন আলিমকে প্রতিদিন নিক্ষেপ করা হত । এবং তাদের অনেককে গুলি করা হত ।"

তিনি আরও বলেন, "চল্লিশ জন আলিমকে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উলঙ্গ করে জ্বালানো হচ্ছে । তারপর আরো ৪০ জন আলিমকে জ্বালানোর জন্য সেখানে আনা হল । সেখানে ইংরেজরা তাদের সম্বোধন করে বলেছিল ঃ মৌলবীর দল উক্ত ৪০ জন আলিমকে যে রুপ জ্বলিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকেও অনুরুপ জ্বালানো হবে । তোমরা যদি এখন বলো যে, আমরা আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহন করিনি তাহলে তোমাদের ছেড়ে দিব । আমার সৃষ্টি কর্তার কসম, আমি দেখলাম যে, তাঁদের কোন একজন আলিমও ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করেননি । বরং পূর্বের ৪০ জনের ন্যায় পরবর্তী ৪০ জনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে জ্বলে শাহাদাত বরণ করলেন । তাঁদের কেউই ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করতে রাজী হলেন না ।" (উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-৭৯)

স্যার জেমস শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর জন্য বলেছেন, "এই লোকটিকে যদি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় তাহলে উক্ত ছাই এর একটি কণাও ঐ পথ বা গলি দিয়ে উড়বে না যেখানে একজনও ইংরেজ অবস্থান করবে ।"

"এই লোকটিকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকটি খন্ডই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে ।" (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা-৩০)

আমরা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ পুরুষ বলেই চিনি । এই সুভাষ চন্দ্র বসুকে পুর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন আমাদের উলামায়ে কেরামরাই । ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "নেতাজীকে যিনি পূর্ন স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন উবাইদুল্লাহ সিন্ধী । তিনিই নেতাজীর নাম দিয়েছিলেন মাওলানা জিয়াউদ্দিন । তিনিই ছদ্মবেশে প্রথমে কাবুলে তারপর বিভিন্ন দেশে পাঠান ।" (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা-২৮)

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন, “ওই সকল উলামা যারা দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পুর্বে ও পরে ওই সকল উলামাগণ স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যান । তাঁরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন ।” (দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রদত্ত ভাষন, দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা-৭২)

নেতাজীর সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাইপো শিশির কুমার বসু বলেছেন, “আমি দিল্লীতে দেখেছি কিছু সংকীর্নতাবাদী লোক কাজের সুবিধা পেয়েছে । তারা নিজেদের পছন্দমত দেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে । দুই শত বৎসরের জাতীয়স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও সংগঠনের স্মরনীয় ইতিহাস রচনা করার জন্য ‘ফ্রীডম মেমোরিয়াল’ নামে একটি জাতীয় সংঘ স্থাপন করা হয়েছে । এই সংস্থার মাধ্যমে যে ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাতে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের নাম নেই । নেতাজীর সুভাষ চন্দ্র বসু ও ন্যাশনাল আর্মিরও নাম নেই । অথচ আপনাদের পূর্বসুরিরাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংগ্রাম শুরু করেছিলেন । জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের পরও কংগ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেনি । কিন্তু জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের দশ বৎসর পূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য বলে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারায় কংগ্রেস নীতি নির্ধারণ করতে না পারলেও জমিয়ত তা করতে পেরেছিল ।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের পর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেরসের আঁতাত হল না । কংগ্রেসের নেতৃত্বের দোষে মুসলিম লীগের জন্ম হয় । এভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বিষ বৃক্ষে পরিণত হল । ইংরেজ সরকার অসন্তুষ্ট হবে মনে করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশই আগষ্ট আন্দোলন করেননি । এমনকি জওহরলাল নেহরুর মতো নেতা আন্দোলন বানচাল করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন । গান্ধীজী দৃঢ় হওয়ায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন সফল হয়েছিল; আর তা হয়েছিল নেতাজীর প্রভাবেই । মনে রাখা দরকার জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ কিন্তু তার আগেই ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ এর ডাক দিয়েছিলেন । যুদ্ধের সময় জমিয়তের বহু নেতা ও কর্মী কারা বরণ করেছিলেন ।”

“নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর গোপনে ইউরোপ যাত্রা সম্পর্কে আমি অনেক তথ্য জানি । আমি গোপনে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম । সেই গোপন যাত্রা কালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি জমিয়ত উলামার পূর্বসূরীদের নির্দেশ অনুযায়ী যাচ্ছি । আপনারা জেনে রাখুন, নেতাজীর সুভাষ চন্দ্র বসু এঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন ।”

“দেশ ভাগের ব্যাপারে আমি একজন হিন্দু হয়েও পরিস্কার বলে দিতে চাই যে, ভারত ভাগের জন্য মুসলমান দায়ী নয় । এমনকি ভারত ভাগে জিন্না সাহেবকে ঠেলে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসই দায়ি । ক্যাবিনেট মিশন নিয়ে নেহরু যা কান্ডকারখানা করেছিলেন তাতে জিন্না সাহেব দেশ ভাগে অনড় হয়ে বসলেন । ভারত ভাগের প্রস্তাব প্রথম এসেছিল হিন্দু মহাসভা থেকে । কিছুদিন পর কংগ্রেস তা গ্রহণ করে । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব ভাগে

সিদ্ধান্ত নিলে আমার বাবা শরৎ বসু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেন এর অর্থই হচ্ছে ভারত ভাগ। তিনি বাংলায় হিন্দু মুসলিম মিলে সংহতি ভিত্তিক বাংলার ঐক্য প্রতিষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি গান্ধীজী ও জিন্নার সঙ্গে মত বিনিময় করেছিলেন। বাংলা বিভক্ত হবে না বলে গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ আলি জিন্না বলেছিলেন যে, যদি আপনারা হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে এক হয়ে থাকতে পারেন, তাহলে আমি বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বাদ দিয়ে দেব। এই আমার বাবা প্রকাশ করেন কিন্তু কংগ্রেসের চাপে ভারত পাকিস্তান বাদে তৃতীয় একটি দেশ ঐক্য বাংলা হিসাবে ভোট নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে বাংলা ভাগের জন্য স্থায়ী করা যায়না। সনদে নির্দিধায় যাঁরা সই করলেন তাঁরা হলেন জওহরলাল নেহরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল। যদি কাউকে দেশ বিভাগে দায়ী করতে হয় তবে প্রথমে এই দু-জনকে। নিষ্ঠুর হলেও অপার সত্য কথাই আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সব সময়ই দেশ বিভাগের বিরোধীতা করেছে। কোন দিনই তা সমর্থন করেনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাদিগকে চিরদিন কেবল স্বীকৃতিই দেবেনা বরং অভিনন্দিত করবে। মুসলমান তথা জমিয়ত উলামা সর্ব প্রথম দেশকে স্বাধীন করার ডাক দেয়। জমিয়তে উলামা স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই না করলে ভারতের স্বাধীনতা কয়েকশো বছর পিছিয়ে যেত এতে কোন সন্দেহ নাই।" (নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষন, তাং- ১৬/১০/১৯৯৭)

নেতাজীর সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছেন ঃ "Brittish propaganda has deliberately created the impression that the Indian Mohammedans are against the independence movement. The fact is that in the nationalist movement there is a large percentage of Mohammedans. The vast majority of the Indian Mohammedans are anti-British and want to see the India free. The great revolution of 1857 was a grand example of national unity. The war was faught under the flag of Bahadur Shah, Mohammadans have anti need to work for national freedom." (The India Struggle, 1920-42)

বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার উলামায়ে কেরাম (দেওবন্দ) সম্পর্কে লিখেছেন, "আমাদের রাজত্ব করতে মুসলমানদের কোনো দলকে ভয় পাইনা। যদি ভয় হয় তো কেবলমাত্র একছত্র ওহাবী দলটাকে। কেননা তারাই আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।" (The Indian Muslims, Page-32)

তিনি আরও লিখেছেন, "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুজাহিদরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রুপান্তরিত করার উপযোগী বলে বিবেচনা করে। আমাদের ভূখন্ড থেকে বহু অর্থ ও লোকজন সিও না শিবিরে পাচার হয়ে যায়। আমাদের সেনাদলের সঙ্গে বিদ্রোহমূলক পত্রালাপের একটি ঘটনা পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের কাছে ধরাও পড়ে। রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত চতুর্থ নেটিভ পদাতিক বাহিনী ছিল ধর্মান্ধ উপনিবেশের নিকটবর্তী। মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের যে সব বাহিনী প্রেরণ করা হত, তাদের অন্যতম ছিল এই পদাতিক বাহিনী। ধর্মান্ধ নেতৃবৃন্দ সু-কৌশলে এই বাহিনীতে ভাঙানী দেওয়ার চেষ্টা

করেছিল । যে সব চিঠি ধরা পড়েছিল, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা থেকে লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহী শিবিরে চালান দেওয়ার জন্য তারা একটি নিয়মিত সংগঠন স্থাপন করেছিল । একই সময় পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট (১৯ শে আগষ্ট ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) দিয়েছিলো যে, শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল । বৃটিশ ভারতের এই প্রাদেশিক রাজধানী শহরের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীরা প্রকাশ রাজবিদ্রোহ প্রচার করছিল । ধর্মান্ধদের সাথে পুলিশের গোপন আঁতাত স্থাপিত হয়েছিল । একজন বিদ্রোহী নেতার (মাওলানা আহমাদুল্লাহ) গৃহে সাতাশ লোকের এক সমাবেশে এই নেতা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত অনুষ্ঠান প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষনা করে ।" (The Indian Muslims, Page-13/14)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠকারী প্রত্যেক মানুষই জানেন যে উলামায়ে কেরামরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য কিনা করেছেন । ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "Its may be called first war of indipendence in india" (History of Freedom movement, Ramesh Chandra Majumdar, Page-28)

জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শ্রী জ্যাতি বসু বলেছেন, "....The Jamiet E Ulama played a distinguished role in the freedom struggle of India. This organization made sincare efforts to mobise the masses for united movement against British imperialism...."

যে মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক বলা হয় সেই গান্ধীজীকেই মাদ্রাসায় পড়া আমাদের পূর্বসূরী আলেম উলামারাই স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে প্রফেসার দিলীপ চক্রবর্তী বলেছেন, "আমার জানা দুটি কাহিনী - গোখলে গান্ধীজীকে বলেছিলেন ঃ রাজনীতিতে এখন নেমোনা । আগে ভারতকে চেনো । সেই জমিয়ত উলামা তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিল । সেই টাকায় তিনি সারা ভারত ঘুরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন । জমিয়ত গান্ধীকে গান্ধী বানিয়ে ছিলেন । ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের রুপ পেয়েছিল দ্রুত গতিতে ।" (কোলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষন, ইং- ২৯/০১/১৯৯৪)

ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে লিখেছেন, "একই সময়ে ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে উলামা সম্প্রদায় অর্থাৎ যাঁদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যাক্তিদেরও প্রভাব বৃদ্ধি পায় । উলামাদের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তাবাদী তাঁরা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন । এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে এই সংস্থার প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয় । দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উলামারাই এই সংস্থার উদ্দ্যোক্তা ছিলেন । মাহমুদুল ছিলেন এই সংস্থার নেতা । খিলাফত আন্দোলনে উলামারা অংশগ্রহণ করেন । জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সবসময়ে দেশের স্বার্থে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা

করেন তাদের জমিয়তের নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করেন ।" (ভারতের ইতিহাস, দশম শ্রেনী, জানুয়ারী ১৯৮৯)

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন, "(ব্রিটিশের বিরুদ্ধে) প্রথম প্রতিবাদ তোলেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ ওয়ালীউল্লাহ । মুসলমানদের হাত থেকে বাদশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাজেই আঘাতটে মুসলমানদের মনেই বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভাবিক, তাই তাদের এই বিরোধীতা হয়তো এই ধর্মীয় নেতার অভিমতের মধ্য দিয়েই রুপ নিয়েছিল । শাহ ওয়ালীউল্লাহ এর পুত্র ও তার পিতার এই সুত্রটিকে কার্যকর রুপে সম্প্রসারিত করলেন । তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না । এই পরিবেশের মধ্যে কোনও প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথ ভাবে ধর্মাচরন করে চলা সম্ভব নয় । তার দৃষ্টিতে ভারত হচ্ছে 'দার - উল - হারব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ' । তিনি এ দেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারী করলেন । বৃটিশের বিরুদ্ধে শরীক হওয়া তাদের সকলের ধর্মীয় কর্তব্য ।" (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠ-১০/১১)

তিনি আরও লিখেছেন, "দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী এই বৃটিশ বিরোধী জিহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনই বা জানে ? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত, কিন্তু এ কথাটা সত্য নয় । বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি । আব্দুল ওয়াহাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কোনও সংযোগ ছিলনা । তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়েছি ।" (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠ-১১/১২)

ঐতিহাসিক ডঃ কল্যান চৌধুরী লিখেছেন, "(মাওলানা) আব্দুল আযীযের প্রধান শিষ্য রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬ - ১৮৩১) গুরুর আবদ্ধ কাজ সম্পন্ন করতে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন ।..........শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদ উনিশ শতকে এক ব্যাপকতর আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল । ঐ সময়ে মুজাহিদীন 'তরিকা - ই - মুহাম্মাদীয়া' নামে ধর্ম যোদ্ধারা ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ।" (আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৯০/৯১)

ঐতিহাসিক ও কোলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবি বিমলানন্দ শামসল লিখেছেন, "হিন্দুরা এটা স্বীকার করতে চান না, কিন্তু বাংলার ও পাটনার ওয়াহাবীরাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিশারী ছিলেন । সিপাহী বিদ্রোহেও এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, তা অনেকটা এই ওয়াহাবীদের প্রচেষ্টায় ও সংগঠনে । ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে যত ওয়াহাবী

প্রাণ দিয়েছেন বা প্রাণ দন্ডে দন্ডিত হয়েছেন । (যে কোন স্বাধীন জাতীর পক্ষেই তা গৌরবের বিষয় । কিন্তু ভারতের ইতিহাস এদের এভাবে স্বীকৃতি দেয়নি) ।'' (ভারত কি করে ভাগ হল, পৃষ্ঠা- ১৮)

'The Indian Peace Council' এর প্রেসিডেন্ট পন্ডিত সুন্দর লাল বলেছেন, ''একমাত্র কংগ্রেসই দেশকে স্বাধীন করে নাই । বরং স্বাধীনতার পশ্চাতে রয়েছে আলেম সমাজের বহু আত্মহুতি ও অনেক বলিদান । কংগ্রেস আর কতদিনই বা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে । স্বাধীনতার সংগ্রামে আলেমদের ইতিহাস ত্যাগ ও আত্মহুতির ইতিহাস । আমি আজ হিন্দু ভাইদিগকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এই দেশকে পরাধীনতা হতে মুক্ত করার জন্য মৌলবীগণ যত ত্যাগ স্বীকার করেছেন অন্য কোন সম্প্রদায় তত ত্যাগ স্বীকার করেন নাই ।''

তিনি আরও বলেছেন, ''১৯৫৭ সাল হ'তে কংগ্রেস কায়েম হওয়া পর্যন্ত এবং পরে কংগ্রেসের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা সহকারে তাহারা মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছেন । যখন আমরা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছি তখন তাহারা আমাদের সহিত এক ছিলেন ।'' (১৯৬৩ সালের মে মাসে মীরাট শহরে প্রদত্ত ভাষন)

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অপরিসীম । কিন্তু তাঁর আগে মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর অবদান নেতাজীর থেকে কোন অংশে কম ছিলনা । নেতাজী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সুযোগ রূপে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ছাব্বিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯১৭ সালের প্রথম মহাযুদ্ধকে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) সঠিকভাবে ব্যাবহার করেছিলেন । নেতাজী জার্মান ও জাপান প্রভৃতি বিদেশী শক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সরকারকে পর্যূদস্ত করেছিলেন । অনুরুপ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আফগানিস্তান, তুরস্ক ও ইয়াগিস্তান প্রভৃতি বৈদেশিক সাহায্যে আফগানী মুজাহিদীনদের সহযোগোগিতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে ইংরেজদেরকে বিদ্ধস্ত করে ছেড়ে দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার বলেছেন, ''তারা অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদরা ইংরেজ সৈন্যকে কবর দিয়েছিল প্রতিটি বালুকায় ।'' (The Indian Muslims)

মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীরা বেলুচিস্তানের 'বাসভিলা' নামক স্থানে বিদ্রোহ করে এবং ইরাক যাত্রী ১৭০০০ ইংরেজ সৈন্য ও তাদের সেনাপতি মিষ্টার টমসনকে সিন্ধু এলাকায় অবতরণ করিয়ে হত্যা করে ।

'মুক্তি সংগ্রামে ভারত' গ্রন্থে লেখা আছে, ''ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে দেওবন্দ জাতীয়তাবাদী মহাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে বেশ কিছু বিপ্লববাদী তরুন মুসলমান ভারত ছেড়ে চলে যান বেলুচিস্তানে । সেখানে এক দুর্গম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন সরকার । পরে সেখান থেকে তাঁরা কাবুলকে তাঁদের সদর দফতর করেন । তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মাওলানা বরকতুল্লাহ । এরা

দেওবন্দের ছাত্রদের কাছে গোপন বার্তা পাঠিয়ে ভারতে বিপ্লবের পক্ষে প্রচার শুরু করেন । কিন্তু সাংকেতিক লিপিসুদ্ধ তাঁদের প্রেরিত রেশমী রুমাল ধরা পরে যায় । শুরু হয় রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা ।''

হীরন্দ্রেনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, ''১৯১৬ সালের আগষ্ট মাসে 'রেশমী চিঠি' ষড়যন্ত্র বলে এক ব্যাপার সরকারের কানে ওঠে । ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে দেশময় মুসলিম বিদ্রোহ । দেওবন্দের মুসলমানদের যে বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র আছে তার অধ্যক্ষ আবুল কালামের আযাদের গুরু স্বরুপ 'শেখ - উল - হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে হিজাজ থেকে এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছিলেন । তিনি ১৯১৬ সালে (মাওলানা) ওবেদুল্লাহর কাছে ''গালিব নামা বলে এক ঘোষনা পত্র পাঠান, তাতে হিজাজের তুর্কি শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করেন । এ ব্যাপারে বেশী এগোবার পূর্বেই 'শেখ - উল -হিন্দ' ইংরেজদের হাতে আটক পড়েন । দেশের মধ্যে মুসলমানদের যাঁরা সব থেকে তেজস্বী নেতা ইংরেজ তাদের সবাইকে, অর্থাৎ (মাওলানা) মহাম্মদ আলী, (মাওলানা) শওকত আলী, (মাওলানা) আবুল কালাম আজাদ, (মাওলানা) হসরৎ মোহনী), (মাওলানা) হুসাইন আহমদ মাদানী, জাফর আলী খান প্রভৃতিকে অন্তরীন করে রাখে ।'' (বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৪)

একবার ইংরেজদের পক্ষ থেকে মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর জন্য গুলি করার অর্ডার হয়েছিল । তিনি ষ্টেজে উপস্থিত হলেন । কামানের গোলন্দাজ তোপের দাগার অপেক্ষায় । এটা ছিল করাচির খেলাফত কমিটির সম্মেলন । যাতে প্রায় ৯ লাখের মতো লোক জমায়েত হয়েছিল । মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী সাহেব কাফন বগলে নিয়ে মৃত্যুর মোকাবেলায় প্রস্তুত । তিনি বললেন ঃ লে ফোরতু হ্যায় বুলবুল চোঁত মে গুল । লোকে দেখে নারায়ে তাকবীর রবে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলল । প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলল এই শ্লোগানের ধ্বনি । গোলন্দাজের গুলিও স্তব্ধ হয়ে গেল । মাওলানা মাদানী সাহেব অকুতভয়ে বললেন -

খেলোনা সমঝ কর বরবাদ না কর
হম ভী কিসিকে বনায়ে গিয়ে হ্যায় ।

মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) চার বছর মাল্টার জেলে বন্দী ছিলেন । এই চার বছরের মধ্যে তাঁর মোট ১৯ জন লোক ইন্তেকাল করেন । তবুও তিনি ব্রিটিশদের কাছে মাথা নত করেননি ।

আর এক জন মুজাহিদের নাম করা যায় তাঁর নাম মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) । যিনি প্রথম জীবনে হিন্দু ধর্মের লোক ছিলেন, পরে শিখ ধর্ম গ্রহণ করেন । পরে তিনি 'তুহফাতুল হিন্দ' ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । তিনি তাঁর জীবনের ২৫ বছর জেলের

মধ্যে কাটিয়েছেন । তিনি যখন জেলের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁর একটিও দাড়ি গজায়নি, এবং তিনি যখন জেল থেকে মুক্ত হন তখন তাঁর সমস্ত দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল ।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের কথা কে না জানেন । এক সময় তাঁর 'আল হেলাল' পত্রিকা দেশে ঝড় তুলেছিল । স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে জেলে পাঠানো হয় । জেলে তিন অতিবাহিত কালে তাঁর স্ত্রী মারা যায় । ব্রিটিশ সরকার তিন দিনের জন্য তাঁকে বাড়ি যেতে অনুমতি দিয়েছিল । মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইংরেজদের এই দয়া গ্রহণ করেন নি । তিনি বললেন, "কল কিয়ামত কে দিন ম্যায় অপনি বিবিসে মুলাকাত কর লুঙ্গা ।"

তাঁর পত্রিকা সম্পাদনকালে তাঁর লেখনিশক্তি অনুধাবন করে ইংরেজদের এক চর কু-মতলবের জন্য তাঁকে ১০,০০০ টাকা দিতে চেয়েছিল । মাওলানা আযাদ তা গ্রহণ করেননি । তিনি প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, "তু মেরে কলমকো খরিদনা চাহতা হ্যায় আবুল কালামকে কলম কো দুনিয়া কি কোয়ি তাকত খরিদ নেহি সক্তি ।"

এই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা কোন স্কুল কলেজ থেকে পড়াশুনা করেন নি । তাঁরা সকলেই মাদ্রাসা থেকেই পড়াশুনা করেছেন । ইংরেজদের যুগে স্কুল কলেজের ছাত্ররা অধিকাংশই ব্রিটিশদের দালালী করতো এবং সরকারী উঁচু পদে চাকরী করার জন্য লালিয়ে থাকতো । তৎকালীন যুগে কলেজে পড়া ব্রিটিশদের এই পোষ্যপুত্ররা মাদ্রাসার বিরোধীতা করতো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করতো । তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে ব্রিটিশরা স্বদেশপ্রেমী উলামায়ে কেরামদের কাউকে ফাঁসি, কাউকে জেলে বন্দি করতো এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে গন্য করে বন্ধ করার চেষ্টা করতো ।

ইংরেজরা এখন আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করেছে । তবে তারা তাদের ঔরসজাত অবৈধ কিছু সন্তান আমাদের দেশে রেখে গেছে যারা এখনও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বা সন্ত্রাসবাদে আঁতুরঘর বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে হেনস্থা করছে অথচ এই মাদ্রাসা না থাকলে এই ভারত বহুদিন স্বাধীনতার মুখই দেখতো না । সুতরাং যারা মাদ্রাসাকে সন্ত্রসাবাদের আখড়া বলে তারা নিঃসন্দেহে নিজেরাই সন্ত্রাসবাদী ।

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম

এটা বহুলভাবে প্রচারিত যে বর্তমানে সন্ত্রাসের জন্য ইসলাম ধর্মই দায়ী । কারণ পৃথিবীতে যত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয় তার মূলে রয়েছে ইসলাম । সেজন্য কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে ছ'জন ইমামকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে আমেরিকায়

বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি । অনেকে বলেন ইসলাম ধর্মই সন্ত্রাবাদকে প্রশ্রয় দেয়, অথচ এটা সত্যের বিপরীত । ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়না । ইসলাম হয় শান্তির ধর্ম । ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই । 'ইসলাম' শব্দের অর্থই হল শান্তি । ইসলাম ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল আত্মসমর্পন । আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন । তাহলে ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিল কিভাবে ?

ইসলাম ধর্ম সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে কথা বলে এবং সন্ত্রাসকে নির্মূল করার কথা বলে । ইসলাম ধর্মের বক্তব্য হল ঃ "লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদ্বি ইন্নাল্লাহা লা ইউ হিব্বুল মুফসিদীন ।" অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ছড়াবে না নিশ্চয় আমি আল্লাহ সন্ত্রাসবাদীদের পছন্দ করি না ।

ইসলাম ধর্ম বলে ঃ "দিমাউকুম কাদিমা এনা ওয়া আমওয়ালুকুম কা আমওয়ানিনা ।" অর্থাৎ অমুসলমানদের রক্ত ও তাদের ধন সম্পদ মুসলমানদেরই রক্ত ও ধন সম্পত্তির মত পবিত্র ও সুরক্ষিত ।

কাউন্ট হেনরী বলেছেন ঃ "ইসলামের নীতি ছিল এই যে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত, তাদের ধন প্রাণ এবং সম্মানের হেফাজত করা হতো । কিন্তু যারা নিজেদের পৈত্রিক ধর্মে থাকতে চাইত তাদের উপর 'জিজিয়া' নামে এক মামুলী কর চাপিয়ে এরুপ ব্যাবহার করা হতো, যেরুপ মুসলমানদের প্রতি করা উচিৎ । আর ধর্মীয় ব্যাপারেও তাদের উপর কোনো বল প্রয়োগ করা হতো না ।" (নেদায়ে ইসলাম ঃ ১৩শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, হোসামুদ্দীন)

সুতরাং ইসলাম সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয় না । বরং সন্ত্রাবাদের বিপক্ষেই কথা বলে ।

আরবী ভাষায় সন্ত্রাসবাদকে 'ইহরাব' বলা হয় । পবিত্র কুরআন শরীফে ও হাদীস শরীফে সন্ত্রাসবাদকে বোঝানোর জন্য 'ফিৎনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে । আর আল্লাহ পাক তো বলেই দিয়েছেন, 'তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ছড়াবে না নিশ্চয় আমি আল্লাহ সন্ত্রাসবাদীদের পছন্দ করি না ।'

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর যখন ১৭ বছর বয়স ছিল তখন তিনি সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের জন্য 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ।

এই সংস্থায় শর্ত ছিল,

১) আমরা দেশ থেকে অশান্তি দুর করব ।
২) আমরা পথিকবৃন্দে জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব ।
৩) আমরা কোন যালিম ব্যাক্তিকে মক্কায় আশ্রয় দেব না ।

৩) আমরা কোন যালিম ব্যাক্তিকে মক্কায় আশ্রয় দেব না ।
৪) আমরা অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করব এবং
৫) আমরা নির্যাতিত ব্যাক্তিকে সাহায্য করব ।

ঐতিহাসিক গীবনের মতে আইয়্যামে জাহিলিয়াহ অর্থাৎ অন্ধকার যুগে ১৭০০ যুদ্ধ হয় এবং মহানবী (সাঃ) এর ধর্মীয় বিপ্লবের ফলে সমাজ থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাসের মূলৎপাটন হয় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় । যেসব যুবকরা সন্ত্রাসবাদী ছিল তারা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সংস্পর্শে এসে চরিত্রবান হয়ে ওঠে । ফলে সমস্ত শিরক, ফিসক, কুফরীতে আচ্ছন্ন যুবসমাজ সোনার মানুষে পরিণত হয় এবং সমস্ত প্রকার সন্ত্রাবাদের নির্মূল হয় ।

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

'জিহাদ' শব্দের অর্থ হল ধর্মযুদ্ধ । অর্থাৎ ইসলাম প্রসারের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মযুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা হয় । অনেকে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদকে এক বলে মনে করেন । কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ এক নয় । সন্ত্রাসবাদ হল ন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশান্তি বিস্তার করা এবং জিহাদ হল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ধরণীকে সন্ত্রাসমুক্ত করা । সুতরাং সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ কোনোদিনই এক হতে পারে না ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "এখানে 'হাক্কাহ জিহাদিহি' অর্থ হল-জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা ।" হযরত ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, "এখানে জিহাদ নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা - বাসনার বিরুদ্ধ জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে ।"

কাফেরদের বিরুদ্ধেও মুসলমানরা বিতর্ক, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে সেই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয় । আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন, "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর ।" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে নবী, কাফের এবং মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন । তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন ।" আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ ।"

আল্লাহপাক আরও বলেছেন, "আর লড়াই (কিতাল) কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে । অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না । নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না । আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর (কিতাল কর) সমবেতভাবে যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সমবেতভাবে ।"

এই কিতাল বা জিহাদ দুই ধরণের -১) আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ও ২) আক্রমানাত্মক জিহাদ । বর্তমানে ভারতবর্ষে আত্মরক্ষামূলক জিহাদই করনীয় । আর এই আত্মরক্ষামূলক

জিহাদ প্রত্যেক জাতির অধিকার। জায়দ ইয়াসীন জিহাদের অর্থ এভবে তুলে ধরেছেন- Jihad in its trust and purest from. The from to which all Muslims aspire, is the determination to do right. To do justice even against your own interests. It is an individual struggle for personal moral behaviour. Especially today it is struggle that wxists. Public service and social justice on a global scale. It is a struggle involving people of all ages. Colors and creeds, for control of the big decisions, not only who controls what piece of land, but more importantly who gets medicine and who can eat.

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবনে বহু ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ করেছেন। জিহাদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "মহিলা ও শ্রমিকদের হত্যা করো না।" অন্যত্র বলেছেন, "বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুদের হত্যা কর না।" মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তিনি শত্রুদেরকে রাত্রে আক্রমণ করতেন না কেননা তিনি রাত্রে ঘুমন্তদের উপর আক্রমনের বিরোধী ছিলেন। যারা মুসলামানদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যেত তাদের সঙ্গে তিনি নম্র ব্যাবহার করতেন। তাদেরকে খেজুর ও বার্লির খাবার দেওয়া হত। যারা হত দরিদ্র হত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হত। হিন্দা নামে একজন মহিলা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ) এর কলিজা টেনে ছিঁড়ে বের করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল এবং হযরত হামযা (রাঃ) এর নাড়িভুড়ি বের করে নিজের গলায় মালার মতো পরে বেড়াতে থাকে। এত চরম নৃশংস ব্যাবহার করা সত্যেও মহানবী (সাঃ) হিন্দাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। কেননা তিনি মহিলাদের আক্রমনের বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই হিন্দা ইসলাম কবুল করেছিল।

ঐতিহাসিক মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন, "আসলে মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুশাসিত ইসলামের আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিরাট চমকপ্রদ অধ্যায়।.......আরব ব্যাবসায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থ সঞ্জাত এই একেশ্বর-বাদীতার অযথা রক্তপাতের বিরোধী ছিলো। ব্যাবসা বানিজ্যের পথ যেসব দেশ দিয়ে গিয়েছে, সেগুলোকে জয় করে অখন্ড আরব রাজ্যের মধ্যে আনতে হবে। বিজিত জাতি যধি নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে সিদ্ধ হবে - কেননা তখনই এক বিরাট একেশ্বরবাদী রাষ্ট্রও এক দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠবার সুযোগ পাবে। পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন আর তার বন্টন (Onsumption) ব্যাবসায়ে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। সে কারণেই কোরআনকে না মানার অপরাধ কৃষক বা শ্রমিক সাধারণকে হত্যা করা কিংবা ঐশ্বর্য্যশালী নগরগুলোকে ধ্বংস করা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকায় সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এই নব ধর্মমতের বিশ্বাসীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করানোই ছিল তাদের বড় কথা। আল্লাহর রসুলের অনুচরদের অধীনে অবিশ্বারীরা নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছে আর পেরেছে নিজেদের বিকৃত পুজার্চনাও চালিয়ে যেতে।"

"জেরুজালেম যখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কাছে আত্মসমর্পন করে, তখন বিজিত নগরীর অধিবাসীদের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তাদেরই অধীনে ছিল আর তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়নি। খ্রীষ্টানদের ধর্মযাজক ও গোষ্টীপতিসহ বসবাসের জন্য নগরের

অংশবিশেষ ছেড়ে দেওয়া হলো। আর এই আশ্রয় দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সামান্য স্বর্নমুদ্রা কর হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। বিজয়ী মুসলমানরা পবিত্র নগরী জেরুজালেম খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য তীর্থযাত্রার অধীকার ক্ষুন্ন তো করেইনি বরং তীর্থযাত্রার জন্য আগ্রহই প্রদর্শন করেছে। এরপর চারশত ষাট বছর পরে যখন জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের অধীনে ফিরে এলো, তখন প্রাচ্যের খ্রীষ্টানরাই আরবীয় খলিফাদের সদাশয় গভর্ণমেন্টের অবসানে যথেষ্ট দুঃখবোধ করেছিল।"

মানবেন্দ্র নাথ রায় আরও লিখেছেন, "এক আল্লাহর একনিষ্ঠ সেবকদের কাছে জরথুস্টের প্রাচীন ধর্ম আর তার 'ভালো' 'মন্দের' চিরন্তন সংঘর্ষমূলক মারাত্মক দৈত্যনীতি বিশেষ অপ্রীতিকর ছিলো। তবুও বিজয়ী আরবদের সহনসীলতা থেকে উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী পারসীরা একেবারে বঞ্চিত হয়নি। হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতেও সাধারণ মসজিদের পাশে অগ্নি দেবতার প্রাচীন মন্দির জাঁকজমকের সঙ্গেই সোভা পেয়ে এসেছে। ইসলামের তলোয়ারের আক্রমণে প্রাচীন ধর্ম - বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির চুড়া ধ্বংস হয়নি। ধ্বংস ও অবলুপ্তি হয়েছিল তার পুজারী ও উপাসকদের মন্দির ত্যাগের দরুনই। টাইগ্রিস থেকে ওক্রাস পর্যন্ত এই বিশাল ভূখন্ডের অধীবাসি পারসীরা যে বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় যেভাবে তাদের আবহমানকালের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে এই বিজয়ীদের (মুসলমানদের) ধর্ম গ্রহণ করেছে, কোন রকমের বলপ্রয়োগের দ্বারা তা সম্ভবপর হতো না।"

তিনি আরও বলেছেন, "প্রাচীন বিশ্বাসে ঘুন ধরে গিয়েছিল। এটা সুসংস্কৃত ও আলোকসম্পন্ন জাতির আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তা আর মেটাতে পারছিল না। 'সুর্য ও অগ্নির' আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি 'আহরিমানে'র আপাত প্রায় ভীতিপ্রদ ছায়ায় রাহুগ্রস্ত হতে বসেছিল। তাই পারস্যের জনগন অনন্ত কল্যানকারী নীতির ঘোর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির বানীবাহক হিসাবে মোহম্মদের সহজ একেশ্বর-বাদীতাকে গ্রহণ করে নেয়। আলেকজান্দ্রীয়া থেকে কার্থেজ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকাই একমাত্র অঞ্চল, যেখানে ইসলামের প্রসারের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও এই যুগান্তকারী ধর্ম - বিপ্লবের কারণ নতুন ধর্মের সহনসীলতার অভাব নয়, পুরাতন ধর্ম - বিশ্বাসের জীর্নতাপ্রাপ্তি আর তা অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলার পরিণতিতে।"

তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "আরবের উন্নতি এবং প্রসার একমাত্র তলোয়ারের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল - এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। তরবারী একটা জাতীয় জীবনে স্বীকৃত মতবাদ হয়তো বদলে দিতে পারে কিন্তু একথা খুবই সত্য, তা কোনদিনই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না।"

জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "যেখানেই আরবরা খ্রীষ্টানদের কোন জাতিকে পরাজিতে পরাজিত, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইতিহাস দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমাণ করে দেয় যে, বিজিত জাতির জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সাহানুভূতি জানিয়েছে। অধীকাংশ খ্রীষ্টান সরকার

সমূহের অবশ্য লজ্জার কথা যে, বিজয়ী আরবদের শাসন - প্রনালীর তুলনায় তাদের শাসন - প্রনালী ছিলো মিশরীয় খ্রীষ্টানদের তাদের দেশকে আরবদের অধীনে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করলো আর খ্রীষ্টান বেরবেররা মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়ে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। কনস্টান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে এই জাতিগুলোর যে তীব্র ঘৃনা, তারই ফলে তারা মুসলিম শাসনকে বরন করে নিলো আর অভিযাতদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাধারণ উদাসীনতা স্পেন ও দক্ষিন আফ্রিকাকে আতি সহজেই পদানত করে দিলো।" (History of the Byzantine Empire)

"এর পূর্বে আরব রাষ্ট্রের হদিস কেউ কোনদিন পায়নি, তাদের সুসংগঠিত সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক আদর্শের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। আরবরা ছিল কবি স্বপ্ন-বিলাসী, তারা করতো যুদ্ধ আর ব্যাবসা। তারা রাজনীতির ধার ধারতো না, যে ধর্মের পুজারী তারা ছিলো, তার মধ্যে একীকরণের কিংবা স্থিতির কোন শক্তিই কিনদিন তারা প্রত্যক্ষ করেনি। বহু দেববেবীর উপাসনা করতো তারা - তাও অত্যান্ত জঘন্যভাবে। অথচ কিছুকাল পর এই অন্ধ অসভ্যেরাই জগতে একটা বৃহত্তম শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলো - সিরিয়া এবং মিশর করলো জয়, পারস্যকে করলো পদানত এবং ইসলামে দীক্ষিত পশ্চিম তুর্কিস্তান এবং পাঞ্জাবের কতকাংশের উপর করলো অধোপত্য বিস্তার। বাইজান্টাইন এবং বেরবের জাতির (Berbers of Algeria) কাছ থেকে আফ্রিকা নিল ছিনিয়ে, আর স্পেন নিলো ভিসিগথদের কাছ থেকে কেড়ে। পশ্চিম কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব প্রান্ত ফ্রান্স তাদের ভয়ে কেঁপে উঠলো। আলেকজান্দিয়া ও সিরিয়ার বন্দরগুলিতে তাদের জাহাজ হলো তৈরী, ভুমধ্যসাগরে নির্ভয়ে করলো চলাফেরা, গ্রীক দ্বীপগুলিকে করলো লুট আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নৈশক্তিকে জানালো প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান। একমাত্র পারস্যবাসীরা ও অ্যাটলাস পার্বত্য অঞ্চলের বেরবের-রা ছাড়া তাদের তেমন কোন বাধাই কেউ দিতে পারলো না। এত সহজে তারা কৃতকার্য হলো যে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই প্রশ্নই সকলের মনে জাগলো - সত্যি তাদের এই অবাধ জয়ের পথে আর কোন বাধাই দেওয়া যাবে না। ভুমধ্যসাগরের উপর রোমকদের আধিপত্য গেল নষ্ট হয়ে। য়ুরোপের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত সর্বত্র সারা খ্রীষ্টজগৎ প্রাচ্যের এক নবীন বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।" (H. A. L. Fasher-A History of Europe (pp. 137-8)

মানবেন্দ্র নাথ রায় বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, "এ যেন এক ভীষন ঐন্দ্রজালিক কান্ড! কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা আজও হতভম্ব হয়ে যান।"

ঐতিহাসিক মানবেন্দ্র নাথ রায় আরও লিখেছেন, "জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসারতা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। আগাস্টাসের রোমক সাম্রাজ্য বীর ট্রাজানের সাহায্যে পরবর্তী যুগে আরও বড় হয়েছিলো। সাতশত বছর ধরে বিরাট ও বিখ্যাত জয়ের উপরেই তার ভীত গড়ে উঠেছিলো। তবুও তা একশত বছরেরও কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যে ভাবে ফেঁপে উঠেছিলো, তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। আলেকজান্ডারের রাজত্ব খলিফাদের

সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয় । প্রায় এক হাজার বছর পারস্য সাম্রাজ্য রোমের আক্রমনের বিরুদ্ধে টিকেছিলো কিন্তু দশ বছরেরও কম সময়েইসলামের তরবারির কাছে তাকে হার মানতে হয় । আধুনিক কোন ঐতিহাসিক ইসলামের এই অপরূপ ও অভিনব অলৌকিকত্বে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাবেন কি ?" (Historical Role of Islam By M. N. Roy)

সুতরাং ইসলামের প্রসার হয়েছে অলৌকিকভাবে । কারণ ইসলামের খলিফারা জিহাদ করে ইসলাম প্রসার করেছিলেন । কিন্তু তাঁরা ইসলাম প্রসার করার জন্য কোন রকমের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় নেননি । কেননা সন্ত্রাসবাদ ইসলাম সমর্থিত নয় । সেজন্য খলিফারা ইসলাম প্রসারের জন্য যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলেন তখন তাঁদের একটাই ফরমান ছিল যে আক্রমনের সময় কোন শিশুকে, নারীকে, বৃদ্ধকে এবং যারা আত্মসমর্পন করবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং মানুষের সম্পদ নষ্ট করা যাবে না, গবাদী পশু হত্যা করা যাবেনা, খামারের ফসল নষ্ট করা যাবেনা । কেননা এগুলি জল সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ ।

অপরদিকে হিন্দুত্ববাদীদের আর. এস. এস. সদস্যদের কাছে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ ঃ ১) সামনে থেকে নয় - পিছন থেকে আক্রমণ করো, ২) বেশিরভাগ রাত্রের দিকে আক্রমণ করো, ৩). বৃদ্ধদেরকে আক্রমন করো, ৪) নারীদেরকে আক্রমন করো । যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে ।

রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "ভারেতের মুসলিমরা মোটেও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না । ১৫ কোটি মুসলিম জনসংখার মধ্যে এক দুজন সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বেশীর ভাগটাই বাইরে থেকে আমদানী । বাইরে থেকেই সন্ত্রাসবাদ ভারতে ঢুকছে । ভারতের নিজস্ব সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম একেবারেই নগন্য । আর দেশের মধ্যে যখন এমন কোন সন্ত্রাসবাদের খবর মেলে আমরা তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিই ।"

তিনি আরও বলেছেন, "ধর্ম বা সীমান্ত মানে না সন্ত্রাসবাদ । সন্ত্রাসবাদীদের কোন আদর্শ নেই । তাদের একটাই লক্ষ্য সব কিছু ধ্বংস করা ও মানুষের মূল্যবোধকেই এককথাই নাকচ করা । সন্ত্রাসবাদদের মধ্যে ভালো-মন্দ খোঁজ করা উচিৎ নয় ।"

তিনি আরও বলেন, "ইন্দোনেশিয়ার পর মুসলিম জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় দেশ হল ভারত । অথচ এইন দেশের এত বিপুল সংখ্যক মুসলিম মূলত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত নন, এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা ।"

তিনি আরও বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরোধীতা করতেই হবে । কোন অজুহাতেই সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না ।"

এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সি. এন. এন কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, “ভারতের মুসলিমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে কিন্তু দেশবিরোধী কোন কাজকর্ম তারা প্রশ্রয় দেবে না । মুসলিমদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিৎ নয় ।”

সুতরাং ভারতবর্ষের মুসলমানরা কোনকালেই সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাল্লাহ । তবে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দেশপ্রেমী হওয়ার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষীর আমাদের প্রয়োজন নেই । তিনি মুসলমানদের দেশপ্রেমী বলেছেন বলে আমরা দেশপ্রেমী তা নয় । আমরা জন্ম দেশপ্রেমী । কারণ নবী (সাঃ) বলেছেন, “দেশপ্রেম ইমানের একটি অঙ্গ ।” (আল হাদীস)

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

(দারুল উলুম দেওবন্দ ফতোয়া বিভাগ)
(উর্দূর বাংলা অনুবাদ)

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে উত্তর লিপিবদ্ধ করা হল ।

ইসলাম শান্তি ও সুসৃঙ্খল ধর্ম । ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যে কোনো অংশে দাঙ্গা-ফাসাদ, উচ্ছৃঙ্খলতা, খুন-খারাবী, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ যারপরনাই নিন্দনীয়, মানবতার চরম অপরাধ । পবিত্র কোরআনের কয়েকটি স্থানে পৃথিবীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । (সুরা কাহাফ, আয়াত ৫৬) “সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি সুশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর অশান্তি ছড়িয়ো না ।” আর একটি ক্ষেত্র অশান্তি বিস্তারকারীদের নিন্দা করা হয়েছে । এবং পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে (সুরায়ে বাকারাহ্, আয়াত ২০৫) “এবং যখন ঐ ফাসাদকারী পিছন ফিরে পলায়ন করে এবং এই চেষ্টাই থাকে যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে, কোন ব্যাক্তির খেতখামার ও জীবজন্তুকে ধ্বংস করবে, অতপর আল্লাহ তাআলা ফাসাদ পছন্দ করেন না ।” অপর আর একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে । (সুরা বাকারাহ্, আয়াত ৬০) “এবং পৃথিবীতে দাঙ্গা ফাসাদ করে বেড়িয়ো না ।”

পবিত্র কোরআন ও ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে একজন নিরপরাধকে খুন করা সমগ্র মানবজাতিকে খুন করার সমতুল্য, কেননা এই অশুভ দরজা যখন খুলে যায় তখন কারো আয়ত্তের মধ্যে থাকে না । অথচ একজন মানুষের প্রাণরক্ষা করা সমগ্র মানব জাতির প্রাণরক্ষা করার মতো, একথাও বলা হয়েছে । অপর একটি স্থানে (সুরায়ে বাকারাহ্, আয়াত ৩২) “এই কারণে আমি বনী ইসরাইলদের জন্য লিখে দিয়েছি যে কোন ব্যাক্তি অপর ব্যাক্তিকে অকারণে অশান্তি না করে যে পৃথিবীতে খুন করে ফলাও করে, তাহলে সে সকল মানবজাতিকে হত্যা করে দিল ।” এবং যে অপর কোন ব্যাক্তিকে বাঁচিয়ে দিল, সমগ্র মানুষকে তথা মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দিল । অপর আর একটি স্থানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কোনো ব্যাক্তিকে খুন করা

আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন, সেখানে হত্যা কোরো না। কিন্তু যদি হক ও ন্যায় সম্মত হয়।

ইসলাম ধর্মে শান্তি - শৃঙ্খলার বাতাবরণ এত উজ্জ্বল যে যদিও নিপীড়িত অত্যাচারিত ব্যাক্তিকে নিজের আত্মরক্ষার ও প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, অত্যাচারিত ব্যাক্তিরা বদলা নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের গন্ডির বাইরে যেন না যায় এবং নিরীহ মানুষজনকে যেন নিশানা বানানো না হয়। কোরআন মজীদে (সুরায়ে বাকারাহ্, ১৯০ নং আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে ট্ "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, তুমিও আল্লাহর নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করো, কিন্তু গন্ডি অতিক্রম করোনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা গন্ডি অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এই কারণে পবিত্র হাদীস শরীফে যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও মানবসমাজের অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার পূর্ণ বিবরণ হাদীস শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। এটা ব্যতীত ইসলামের শিক্ষা হল আল্লাহর সৃষ্টি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একই সমাজের বলে অভিহিত করা হয়েছে। যে ব্যাক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, সে ব্যাক্তি আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় বলে গন্য হবে। (বাইহাকী ফিকাহ্)। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, যারা অপর ব্যাক্তির প্রতি ঘৃনা করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তার প্রতি কৃপা করেন, তোমরা জমীনে বসবাসকারীর প্রতি দয়া করো, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাদীস গ্রন্থ) ফতোয়ার সারবত্তা হল, ইসলাম ধর্ম অকারণে অশান্তি অত্যাচার, খুন - সন্ত্রাস, ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতিকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং এই মৌলিক বিষয় যে ভালো এবং গঠনমুলক দিকগুলি একে অপরের প্রতি সহায়তা করা প্রচার করা প্রয়োজন। গোনাহ্ (পাপ) ও জুলুম অত্যাচারের সঙ্গ দেওয়া চলে না। কোরআন মজীদের সুরা মায়েদার দ্বিতীয় রুকুতে বলা হয়েছে, "একে অপরের প্রতি সাহায্য করো ভালো কাজের ভিত্তিতে এবং সতর্ক হয়ে চলো, আর গোনাহ ও অত্যাচারের বিষয়ে সাহায্য করো না।"

উপরোল্লিখিত কোরআন মজীদের আয়াতসমুহের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম পুরোপুরিভাবে বিশ্বশান্তির জন্য দায়বদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অপবাদ নিঃসন্দেহে মিথ্যা এবং অমুলক। ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে সর্বপ্রকারের সন্ত্রাসকে বন্ধ করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি এবং সুস্থতাকে প্রসারিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে।

সাক্ষ্যদানে,

ক) মুফতী হাবীবুর রহমান, মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ,

খ) মুফতী জুয়নুল আবেদীন, নায়েব মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ,

গ) মুফতী ওয়াকার আলি, সহায়ক মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ,

ঘ) মুফতী মাহমুদ হাসান, মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ,

তারিখ ২৩ জামাদিউল আওয়াল, ১৪১৯ হিজরী/ ২০০৮

বর্ধমানে খগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ড ও মিডিয়ার জালিয়াতি

বর্ধমানে খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর দেশে তুমুলভাবে আলোড়ন সৃষ্ট হয়েছে । আর এই খগড়াগড় বিস্ফোরণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকেই দায়ী করা হয়েছে । অথচ এই বিস্ফোরণের জন্য মাদ্রাসা কোনভাবেই দায়ী নয় । পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এই বিস্ফোরণের জন্য কেন্দ্র সরকারকে দায়ী করেছেন । তিনি বলেছেন, "খগড়াগড়ে হয়তো কেন্দ্রই 'র' (RAW/Research & Analysis Wing) কে দিয়ে বোমা রাখিয়েছে । মনে রাখবেন আমি ২৩ বছর কেন্দ্রে ছিলাম কে কিভাবে ষড়যন্ত্র করে সব জানি ।"

আর খগড়াগড় কান্ডে ভয়াবহ গরমিল রয়েছে । এবং বাংলাদেশে জঙ্গী কাহিনী রচিত হচ্ছে । যখন বোম খগড়াগড়ে বোস্ফোরণ হয় তখন যে যুবকটি মারা গেছে তার খতনা করা ছিল না কিন্তু যাকে জঙ্গী বলে মুসলিম বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার খতনা করা ছিল । তাহলে কে সেই মৃত জঙ্গী । বলা হয়েছে জমশেদ শেখ নাকি তার ছেলের লাশ শনাক্ত করেছে কিন্তু জমশেদ এই শনাক্তকরণের কথা অস্বীকার করেছে । তিনি বলেছেন- NIA সেলফোনে ছেলে ছবি দেখায় এবং জোর করে যে এটি সামনে পড়ে থাকা লাশের ছবি । (১) কেন NIA কাগজে ছাপাকৃত লাশের ছবি দেখায় নি ? (২) লিখছে জমশেদ শেখ লাশ শনাক্ত করেছে, (৩) কেন DNA টেষ্ট করা হয়নি ? কার লাশ ছিল ? কে সেই জঙ্গী ? কেন বর্ধমান থেকে বাংলাদেশ তদন্ত টিম গেল ? তবে মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেই দিয়েছেন যে এই বিস্ফোরণটি 'র' কর্তৃক পরিকল্পিত । গোয়েন্দা সংস্থা ঘটনাস্থলে পৌছালে পশ্চিম বঙ্গ পুলিশ তাদেরকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি । এর রহস্য কি ? বর্ধমানের খগড়াগড় বিস্ফোরণের সকল খুটিনাটি বিষয় NIA তদন্তের বিশ্লেষন এবং ফাঁকফোকর নিয়ে বিবিসির সাংবাদিক অজিত সাহি এর একটি সরজমিনে প্রতিবেদন 'বর্ধমানের সেই বাড়িটি' । প্রতিবেদনটি আউট লুক ইন্ডিয়া ডট কমে প্রকাশিত হয় ।

বিস্ফোরণের পর যখন মাদ্রাসায় তদন্ত করা হয় তখন মাদ্রাসা থেকে কোনপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য, বন্দুক বা কোন হাতিয়ার পাওয়া যায়নি । বিস্তারিত জানতে নিচে ইংরেজী প্রতিবেদনটি পড়ুন-

Nine dilapidated rooms made of mud and bamboo, with peeling walls and a thatched roof, arranged in a rectangular shape. This is Simulia madrasa — the focus of a National Investigation Agency (NIA) probe, an alleged training ground for women "jihadis", and the so-called nerve centre of a terror network linked to the Burdwan blast in West Bengal.

The Simulia cluster of five villages from which the madrasa derives its name, located around 35 km from Burdwan, is surprised at the charges. The villagers, mostly Muslim, say they saw no sign of such activities.

Findings of the probe so far, in fact, point to Simulia madrasa being a radical Islamic centre than a training ground for "jehadis", with not one gun or any explosive being found. What is also clear is that it drew its girl students from outside the Simulia area. Barring one family, nobody from the villages here sent their girls there to study. Since the Burdwan blast though, Borhan Sheikh and Yousuf Sheikh, who helped set up the madrasa, are absconding.

The two had also bought land to set up another madrasa in Simulia, about half a kilometre away. Work on it has been halted.

According to the NIA, the Simulia madrasa was the centre for arms training for women cadres linked to the Jamaat-ul-Mujaheedin Bangladesh, with at least 25 of them receiving training there.

While most of these women, it claims, have gone underground, it is on the testimony of the two in custody, Razia and Alima, that the whole case rests. The wives of two Burdwan blast accused and victims, the two have reportedly told police that they had spent some time at Simulia madrasa where they received radical Islamic teachings and also physical and arms training. The two also said that most of the recruits at the madrasa were from Murshidabad, Nadia and some parts of Burdwan.

Rosula Biwi's land borders the madrasa spread over 6,300 sq ft of land. The family survives on a nursery that her two daughters have grown on the plot. Looking for explosives, the NIA had drained the pond on Rosula's land but found nothing.

Says Rosula, "Even if a cycle tyre bursts here, people get to know. Being next-door neighbours, won't we get to know if there was shooting practice at the madrasa?"

About 20 yards away, lives Sakina Biwi. As her grandson and grand-daughters Salma, Naseema and Habiba crowd around her, she explains why the family didn't send the girls to the madrasa. "It is a purdah madrasa (where women have to wear a veil). We did not want to put our kids there to learn religious scripts."

The girls go instead to the government school at Krishnabati, about 2 km away.

However, she doesn't believe the charges

levelled at the madrasa. "There was a veil of secrecy about it but don't you think we would be the first to know if a single gunshot was fired inside?" says Sakina.

Roquea Biwi and her daughter Shamima moved into their new two-storey pucca house on the other side of the Simulia madrasa just two months ago. They said they never noticed any suspicious activity, let alone a shooting range.

The imam of the Simulia Uttarpara Mosque, Sanaullah aka Bokul, sent his 13-year-old daughter to the madrasa, the only one who appears to have done so here, but only for a couple of weeks.

He says he sent his daughter to learn religious teachings but regretted it almost immediately. “No proper lesson was imparted there. Also, they wanted to charge Rs 1,000 per month, which I had no means to pay,” he says.

A resident of Simulia, Borhan Sheikh, had donated the land for the madrasa around 2009 and helped run it along with Yousuf. His wife Fatehma taught at the madrasa. All three are now absconding.

Borhan’s 70-year-old mother Asura Biwi breaks down recalling how afraid the family was when police came searching for him following the blast. In nervousness, she says, she couldn’t speak when asked for her sons’ names. “They slapped me saying I was acting.”

Borhan used to run a carpentry unit in Mangalkot market. Asura Biwi says he gave land for the Simulia madrasa “as it is perhaps one of the most pious things a Muslim can do”.

Others in the village vouch that Borhan was a devout Muslim who said namaz five times a day and led a simple lifestyle. Dalim Sheikh, the local panchayat member and Trinamool Congress worker, recalls seeing Borhan and Yousuf occasionally at the local market in Mangalkot about 2 km away. “But the women at the madrasa always wore a burqa and hardly came out,” says Dalim.

These women were mostly from poor families in Murshidabad, Nadia and some parts of Burdwan whose parents couldn’t afford a better education. The madrasa with residential facilities gave them religious education as well as took care of their basic needs.

Even the 10-odd policemen at the camp set up inside the Simulia madrasa since the NIA took over investigations have doubts about it being a terror centre. Take the charge of students receiving shooting practice, they say. “The small area and the neighbouring settlements would have been major impediments,” says one of the policemen.

Narrating the sequence of events, top police sources say that a day after the blast at Burdwan's Khagragarh, the Simulia madrasa put up a notice saying it was closing for Eid. Soon after, the Sheikhs went missing. On October 9, the name of the madrasa came up during interrogation of Razia and Alima, the wives of the Burdwan blast accused. But even before police could reach the place, some mediapersons entered the madrasa. They found nothing.

According to a senior police official, this is what the NIA has seized so far: a long white fibre wire (probably used for

- See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-gun-not-a-grain-of-explosive-found-at-simulia-jihadi-training-ground/2/#sthash.NpfBu2Bd.dpuf

drying clothes); SIM cards; mobile phones; phone books (but with no Bangladeshi number, despite alleged "Bangladeshi links"); a voter ID card; literature from the Internet; notebooks with writings such as Muslims are downtrodden, one must "qurban (sacrifice)" one's life for Islam, and that Muslims must fight oppression (all of it termed "jehadi"); a Nano car; IED-making procedures from the Net; about 12 airgun pellets; knee caps; one roller shoe; and Bengali books of Bangladeshi publications.

"It might be the airgun pellets that led to the suspicion of there being shooting practice at Simulia madrasa," says a senior police official involved in the probe.

Razia and Alima reportedly told police that students were taught how to "uncock a gun". "But no supportive evidence has been found, particularly any gun. Not even a grain of explosive was seized from the madrasa," the official adds.

The Timeline
Oct 2: Burdwan blast
Oct 3: After an Eid holiday notice, Simulia madrasa closes
Oct 3: Borhan, Yousuf and the women studying at the madrasa go underground
Oct 9: Razia and Alima, wives of Burdwan blast accused and victims, tell police of their links to Simulia madrasa
Oct 11: NIA takes over the case
Oct 13 to 17: NIA searches, declares madrasa a centre for terror network

See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/no-gun-not-a-grain-of-explosive-found-at-simulia-jihadi-training-ground/3/#sthash.ipMtVJnU.dpuf

খগড়াগড় বিস্ফোরণ নিয়ে মার্কিন সাম্রজ্যবাদের দোসর, ব্রাম্ভন্যবাদী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও দুষ্ট মিডিয়া অনেক বাড়াবাড়ি করেছে এবং এর পুরো দায় মাদ্রাসার উপর চাপিয়েছে। এই বিস্ফোরণের জন্য তারা খগড়াগড়ের আহলে হাদীস মাদ্রাসা দ্বীনিয়া মাদানীয়াকে দায়ী করে। অথচ এই বিস্ফোরণের জন্য উক্ত মাদ্রাসা কোন মতেই দায়ী নয়। এই মাদ্রাসা দ্বীনিয়া মাদানীয়া ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাটিকে নিয়েই বাজারী ঘাতক মিডিয়া হইচই ফেলে দিয়েছে। বিস্ফোরণের পর যখন তদন্ত করা হয় তখন মাদ্রাসা থেকে কতকগুলি বই-পুস্তক উদ্ধার করা হয়। সেই বইগুলি হল, নুরানী কায়দা, মৃত্যুর ভালো উপায়, চেপে রাখা ইতিহাস প্রভৃতি। শয়তান মিডিয়া এই বইগুলিকে আল কায়াদার বই বলে ফলাও করে এবং জনমানষের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উসকানী দিতে থাকে যাতে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তির শিকার হয় ও মাদ্রাসার প্রতি সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী হয়। অথচ এই বেইমান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল ঘাতক মিডিয়া যদি ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখত তাহলে বুঝতে পারত যে নুরানী কায়দা কোনমতেই আল কায়দা নামক সংগঠনের পুস্তক নয় বরং সেটা আরবী বর্ণপরিচয়। সেই পুস্তকটি উপমহাদেশের প্রায় প্রত্যেক মাদ্রাসায় পড়ানো হয় এবং ভারতের সরকারী মাদ্রাসাসহ আরবী সিলেবাসভুক্ত স্কুল কলেজেও পড়ানো হয়। তাবলে কি স্কুল কলেজের ছাত্ররাও সন্ত্রাসবাদী ? এর জবাব মিডিয়ার কাছে আছে কি ?

একথা আমাদের সকলের জানা যে আল কায়দা দলের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ওসামা বিন লাদেনের জন্মের আগে নুরানী কায়দা লেখা হয়েছে, তাহলে নুরানী কায়দা নামক আরবী বর্ণপরিচয়টি কিভাবে আল কায়দার পুস্তক হতে পারে ? দুষ্ট মিডিয়ার এতটুকুও জ্ঞান নেই।

অপরদিকে 'ভালো মৃত্যুর উপায়'বইটি একটি উপদেশমুলক বই। এই পুস্তকটির ১২৪ পাতা জুড়ে রয়েছে মৃত্যুর অনিবার্যতার আতঙ্ক, যন্ত্রনা নিয়ে কুরআন, হাদীস সহ একাধিক মনীষীর উদ্ধৃতি বা ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ সুন্দর সংকলন। এই পুস্তকে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা তো দুরের কথা একটি বারের জন্যও 'জিহাদ' শব্দের কোন উল্লেখও নেই। কিন্তু শয়তান মিডিয়া কোথায় এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা পেয়েছে কে জানে ?

আর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থটি একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ। বইটির লেখক বক্তাসম্রাট ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা। এটি কোন সন্ত্রাসবাদী বা জিহাদী গ্রন্থ নয়। এর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রমের ইতিহাস, মুসলমানদের উত্থান পতনের ইতিহাস ও সিলেবাসে অনুপস্থিত শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক গোপন করে দেওয়া দুর্লভ একটি ইতিহাসগ্রন্থ। এই বইয়ের মধ্যে গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধের ডাক দিয়েছেন এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরীর মানষে লিখেছেন যাতে হিন্দু মুসলমান একে অপরের প্রতি যে ভুল ধারণা পোষন করে তা যাতে দুরীভূত হয়। এই 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থটিকে পশ্চিম বঙ্গের বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিরা প্রশংসা করেছেন। যেমন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাধাকান্ত চক্রবর্তী, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফনীনাথ ভট্টাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিত মল্লিক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের

প্রাক্তন বিচারপতি চৌধুরী আব্দুর রহীম, কলকাতার মৌলানা আযাদ কলেজের অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ এগ্রঃ ইউনিভার্সিটির আব্দুল খালেক আখন্দ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক শিবকালী মিশ্র, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাসকুমার সামন্ত, বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ এ. রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগলকনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতিরা এই 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই বইয়ের কোথাও সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি। কিন্তু শয়তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল মিডিয়াকে বোঝাবে কে ? আর এই বইকে যদি জঙ্গী বা সন্ত্রাসবাদী বই বলা হয় তাহলে উপরিউক্ত ঐতিহাসিকদেরকে সন্ত্রাসবাদী বইয়ের প্রশংসা করার জন্য ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আর তা নাহয় যেসব মিডিয়ার শয়তান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা দালাল, ঘাতক সাংবাদিকরা যারা মিথ্যা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, জনমানষে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য অপপ্রচার চালিয়ে মোর্তজা সাহেবের বইকে সন্ত্রাসবাদী বই বলে তাদেরকে মূল সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে একটি লাইনে দাঁড় করিয়ে ইরাকের আবু বকর আল বাগদাদীর আই. এস. আই. এস (ISIS/Islamic State Iraq and Siriya) সংগঠনের মতো গুলি করে তাদের শরীরকে ছিন্ন করে দেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার আগে তাদের বুক কেঁপে উঠে। এতদিনে বুঝতে পারলাম ইরাকের আই. এস. আই. এস (ISIS/Islamic State Iraq and Siriya) জঙ্গিরা কেন মার্কিন সাংবাদিকদের হত্যা করছে।

আমরা আসল রহস্য বুঝতে পেরেছি

এতদিনে আমরা আসল রহস্য বুঝতে পেরে গেছি। গোলাম আহমদ মোর্তজা সাহেবের যে 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থটিকে জেহাদী বই বলে চালিয়ে জনমানষে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই বইটি আজ থেকে ৩৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে মোর্তাজা সাহেব 'ইতিহাসের ইতিহাস' নাম দিয়ে ছেপেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন যুগের এই ঘাতক মিডিয়ার ষড়যন্ত্রে ১৯৮১ সালে বাজেয়াপ্ত করে। তাদের ভুয়া যুক্তি ছিল বইটা নাকি স্কুল কলেজে পড়ানো হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ লেখা। যাইহোক পরে গোলাম আহমাদ মোর্তাজা সাহেব একই বিষয়বস্তুর উপর 'চেপে রাখা ইতিহাস' নামে প্রকাশ করেন। কিন্তু এই শয়তান মিডিয়া তখন এই বইটির বিরুদ্ধে আর ষড়যন্ত্র করতে পারেনি। কিন্তু তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কিভাবে এই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা যায়। বর্ধমানে খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর মিডিয়া পুনরায় সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে এই বইটিকে ভোল পরিবর্তন করে জেহাদী বই বলে চালানোর চেষ্টা করে। তবে শয়তানের চক্রান্ত কোনদিন সফল হয় না। একদিন না একদিন ব্যার্থ হবেই হবে। আর মিডায়া কোনদিন মোর্তজা সাহেবের 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটিকে সন্ত্রাসবাদী বই বলে প্রমাণ করতে পারবে না। 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটিকে মিডিয়ার চক্রান্তে সরকার বাজেয়াক্ত করেছে সত্য কিন্তু মিডিয়ার ও সরকারের লাভ কি হল ? বইটিকে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করে ইন্টারনেটে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আজ বইটি শুধু বাঙালীর ঘরে ঘরে নয় বরং সারা বিশ্বের সকল প্রান্তে পৌঁছে গেছে। যে কোন সময় যে কোন দেশের মানুষ বইটি ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। মিডিয়া আর মানুষের নিকট বইটি পৌঁছাতে আটকাতে পারবে কি ?

বর্ধমানে খগড়াগড় কান্ড নিয়ে রাজনীতি

বর্ধমানে খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার রাজনীতির খেলা খেলছেন । মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেছেন বিস্ফোরণের জন্য দায়ী । তিনি বলেই দিয়েছেন, “খগড়াগড়ে হয়তো কেন্দ্রই ‘র’ কে দিয়ে বোমা রাখিয়েছে । মনে রাখবেন আমি ২৩ বছর কেন্দ্রে ছিলাম কে কিভাবে ষড়যন্ত্র করে সব জানি ।”

অপরদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এই বিস্ফোরণের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন । তাঁর দাবী সারদার টাকা দিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে । তিনি বলেছেন, “সারদার টাকা বর্ধমান বিস্ফোরনে গিয়েছে । এনআইএ এবং সিবিআই তদন্তে সমস্ত তথ্য আসতে শুরু করেছে । দ্রুত দুই সংস্থার তদন্ত এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে ।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ ডিসেম্বর ২০১৪)

তহলে দেখা যাচ্ছে খগড়াগড় বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে দুই সরকার রাজনীতি জঘন্য খেলা খেলছেন । সুতরাং উক্ত স্থানে বোমা রাজনৈতিক নেতারাই ফাটিয়েছেন নিজেদের স্বার্থ পুরণ করার জন্য । মাদ্রাসার সঙ্গে এই বিস্ফোরণের কোন সম্পর্কই নেই । মাদ্রাসাকে এই বিস্ফোরণের সাথে জড়িয়ে ইসলামকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

সাত্তোড় গ্রামের হাসপাতালে বোমা উদ্ধার

খগড়াগড় বিস্ফোরণের কয়েকদিন পরেই বীরভূমের সাত্তোড় গ্রামের হাসপাতালে বোমা পাওয়া যায় । বীরভূম পুলিশ সেই বোমাগুলিকে উদ্ধার করে ফাটিয়ে নষ্ট করে অথচ মিডিয়া এই হাসপাতালে বোমা রাখা নিয়ে কোন হইচই করেনি । একবারের জন্য সেই হাসপাতালের ডাক্তারদিগকে জেরা করার জন্য ডাকে নি এবং একবারের জন্যই হাসপাতালগুলোকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে ঘোষনা করেনি । খগড়াগড়ের মাদ্রাসাকে বদনাম করা হয় এবং বিস্ফোরণকারীদের খোঁজার জন্য বাংলাদেশ পর্যন্ত পাড়ি দেওয়া হয় কিন্তু সাত্তোড় গ্রামের হাসপাতালটিকে এখনো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি এবং মেডিকেল কলেজগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে প্রচারও করা হয়নি । দেখুন বেইমান মিডিয়া ও সরকারের দ্বিচারীতা ।

এখন যদি হাসপাতালে বাদ দিয়ে মাদ্রাসায় বোমা পাওয়া যেত তাহলে এতদিনে দেশের বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেত এবং মিডিয়া, সরকার ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জামাআতুল মুজাহিদীন, আল কায়দা, ইসলামিক ষ্টেটসহ বেশ কয়েকটি বিদেশী সংগঠনের সাথে ভুয়া যোগসূত্রও পেয়ে যেতেন । যদি প্রমাণ করতে না পারতেন তাহলে ভয় দেখিয়ে মাদ্রাসার ব্যক্তিত্বদেরকে জোর করে নিজেদেরকে আল কায়দা, জামাআতুল মুজাহিদীন, ইসলামিক ষ্টেটের এজেন্ট বলে স্বীকার করানো হত যাতে মুসলমানদেরকে বদনাম ও হেনস্থা করা যেতে পারে । সম্রাট আলেকজান্ডার এই ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করে সঠিক কথাই বলেছিলেন,

সত্য সেলুকস ! কি বিচিত্র এই দেশ !

একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে পশ্চিম বঙ্গের প্রায় অনেক বাড়িতেই বোমা এবং কিছু না কিছু অস্ত্র পাওয়া যাবে । কারণ পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রবল । খাস করে বর্ধমানের অধীকাংশ মানুষই রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য বাড়িতে বোমা বারুদ রাখেন । তাঁরা ইসলামী চেতনার জন্য বোমা রাখেন না বরং তাঁরা হিংসার রাজনীতি খেলার জন্যই এইসব করে থাকেন । যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত বাড়িতে তদন্ত করে দেখা যাক দেখা যাবে প্রায় অনেক বাড়িতেই বোমা রাখা আছে । তাহলে সকলকেই জঙ্গী বা সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে হোক । দেখা যাবে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও জঙ্গীর কাতারে শামিল হয়ে গেছেন । তারপর দেশে আর কেউ সন্ত্রাসবাদী নয় এমন কেউ পাওয়া যাবে কি ?

জামাআতুল মুজাহিদীনের নামে পোস্টার

কোলকাতার একটি কলেজের বি. কম প্রথম বর্ষের অমিয় সরকার নামে একজন হিন্দু যুবক দেওয়ালে পোষ্টার লাগিয়ে দেয় ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় । কোলকাতার বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে । তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৫০৫ ধারায় (পাবলিক মিসচিফ) মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডিসি জানিয়েছেন, "তদন্তে জানা যায় ১৯ বছর বয়সী ওই কলেজের ছাত্রের নাম । তবে এই ঘটনায় কোনো জঙ্গীসূত্র পাওয়া যায়নি ।" গত ২৭ শে নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) রাজারহাট থানা এলাকায় বিষ্ণুপুরে একটি স্কুল সংলগ্ন দেওয়ালে হঠাৎ করেই জামাআতুল মুজাহিদীনের পোষ্টার দেখতে পাওয়া যায় । তাতে ১৮ বছরের এক কিশোরীকে মানববোমা হিসাবে ব্যাবহার করার হুমকি দেওয়া হয় । সেই পোষ্টারে দুটি মোবাইল নম্বরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় এবং সাংকেতিক ভাষায় নামও লেখা ছিল । সেই হাতে লেখা পোস্টারে লেখা ছিল, "তোমরা আমাদের আর আটকাতে পারবে না । আমরা পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতে ছড়িয়ে আছি । ১৮-১৯ বছরের ছেলে মেয়েদেরকেই ব্যাবহার করব । প্রথম বিস্ফোরণ করব শিয়ালদাহ ষ্টেশনের কাছে । নজর রাখছি ১৮ বছরের একটি মেয়ের উপর । যেকোনো সময় ধরে মানব বোমায় পরিণত করব । মেয়েটির ব্যাপারে সব জানি ।"

এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে ফেসবুকের বান্ধবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই যুবক অমিয় সরকার জেহাদী পোষ্টার লাগিয়েছিল । পুলিশ এও বলেছে 'অনির্বান সেন' নামে ফেসবুকের একজনের সঙ্গে অমিয় সরকারের পরিচয় হয় । প্রোফাইলের নাম পুরুষের হলেও ব্যাবহারকারী ছিলেন একজন তরুনী । কিন্তু হঠাৎ করেই প্রোফাইলটি 'ডিসেবেলড' হয়ে যায় । চ্যাটে পাওয়া ফোন নম্বরটিও কাজ করেনি । এ কারণে মানসিক আঘাত পেয়েই নাকি 'বান্ধবী'র উপর প্রতিশোধ নিতে তার নম্বর দিয়ে পোষ্টার সাঁটিয়ে দেয় এই ধৃত অমিয় সরকার । এটাই পুলিশের বক্তব্য ।

এখানে পুরো ব্যাপারটাই যেন গোলমেলে ব্যাপার । সাধারণত আমরা জানি ছেলেরাও মেয়েদের নামে ফেসবুকে ফেইক অ্যাকাউন্ট তৈরী করে মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করে । কিন্তু

এখানে বলা হয়েছে তরুনী নাকি অনির্বান সেন নামে অ্যাকাউন্ট তৈরী করে ছেলেদের সঙ্গে চ্যাটিং করত । যদি তাই হয় তাহলে মেয়েটার আসল নাম কি ছিল ? কোথায় বাড়ি ? তার কোন বিবরণ পুলিশ দেয়নি । নাকি অমির সরকার ও অনির্বান সেন দুজনের সাথে কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সংযোগ ছিল ? ব্রাম্ভন্যবাদী পুলিশ হিন্দু জঙ্গী সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য ফেসবুকের কাহিনী তৈরী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ।

কোলকাতার মত শহরের একজন বি. কম প্রথম বর্ষের ছাত্র কি জানে না যে জিহাদী পোষ্টারে হুমকী দেওয়ার পর ধরা পড়লে তার কি শাস্তি হতে পারে ? পুরো ব্যাপারটাও যেন গোলমেলে ।

এখন একটু ভাবে দেখুন যদি পোষ্টার সাঁটানোকারী ব্যাক্তি অমিয় সরকার (হিন্দু) না হয়ে আজমল নামক মুসলমান হত তাহলে কি হত ? যদি সে সত্যই ফেসবুকের বান্ধবীকে ঠকানোর জন্য জেহাদী পোষ্টার লাগিয়ে জামাআতুল মুজাহিদীনের নাম ব্যাবহার করত তাহলে তার কোন কথাই শোনা হত না । তাকে জোর করে চক্রান্ত করে কোলকাতা ব্রাম্ভন্যবাদী পুলিশ জামাআতুল মুজাহিদীনের কর্মী বানিয়ে ফেলত এবং তার উপর ১০-১২টা বোমা বিস্ফোরণের চার্জশীট তৈরী করে তাকে নিয়ে মিডিয়ার যোগসাজিসে এমন কাহিনী বানানো হত সে যেন হাফিয সয়ীদের লস্করে তাইয়েবা, ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা, আবু বকর আল বাগদাদীর ইসলামিক ষ্টেট, মাসউদ আযহারের জৈশে মুহাম্মাদ অথবা সে যেন দাউদ ইব্রাহীমের খাস লোক । তার পরিবারবর্গকে হেনস্থা করা হত, তার বন্ধু বান্ধবদেরকেও সন্ত্রাসবাদীবের এজেন্ট বানিয়ে পেশ করতো এবং জোর করে প্রচার করা হতো পাকিস্তানের অমুক অমুক সংগঠনের কাছ থেকে সে জিহাদী প্রশিক্ষন নিয়েছে এবং অমুক জায়গা থেকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষন নিয়েছে । আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) দ্বারা তার বাড়িতে দু চারটি জিহাদী পুস্তক গোপনে রেখে দিয়ে জেরা করা হতো অথবা কলেজেরই কোন পাঠ্যপুস্তককে জিহাদী পুস্তক বলে ফলাও করে প্রচার করে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে ক্ষিপ্ত করা হতো যাতে পশ্চিমবঙ্গে গুজরাটের মতো একটা দাঙ্গা বাঁধানো যায় এবং তাতে রাজনৈতিক রুটি সেঁকে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে আর গুজরাটে যেরকম নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গী বাহিনী মুসলমানদেরকে খোলা আকাশের নিচে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ঠিক সেই রকম যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকেও হত্যা করা যায় । কিন্তু পুলিশের সে চক্রান্ত সফল হলোনা । করণ ছেলেটি আজমল হয় অমিয় সরকার । অমিয় সরকারও হিন্দু এবং তাকে নিয়ে যারা গল্প বানিয়ে মুক্ত করেছে তারাও হিন্দু আর মিডিয়াও হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ন্ত্রনে ।

ভারতে মুসলিম সন্ত্রাবাদ একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজেপি, আর. এস. এস, বজরঙ্গ দল এবং ভারতের অন্যানন্য হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করত । যেখানে সেখানে দাঙ্গা লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠ করার চেষ্টা করত । যখনই তারা দেখত যে অমুক স্থানে ভোটে হেরে যাবার সম্ভাবনা আছে সেখানে তারা দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে রাজনীতির জঘন্য খেলা খেলত । কিন্তু মুম্বাই দাঙ্গা, ভাগলপুর দাঙ্গা ও গুজরাট

দাঙ্গায় মুসলমানদের খোলা ময়দানে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর উপরিউক্ত রাজনৈতিক দলগুলি সারা বিশ্বে বদনাম হয় এবং সমাজে তারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে যায় । তখন এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলি বুঝতে পারে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে আর রাজনীতি করা যাবে না যা গত পাঁচ দশকে তাদের কাছে এটা যাদুর ছড়ির মতো ব্যাবহার করে এসেছে । এখন আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধালে পাল্টা মার তাদের উপরেই পড়বে এবং বাবরী মসজিদ ধ্বংস পর্যন্ত তা যে ফায়দাটুকু লুটেছে শেষ পর্যন্ত সেটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাবে । সেজন্য উপরিউক্ত রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ভোল পরিবর্তন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রাজনীতির চক্রান্ত ছেড়ে দিয়ে এখন একটি নতুন চক্রান্ত শুরু করেছে সেটা হল মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বা জেহাদী সন্ত্রাসবাদের প্রোপাগান্ডা । এই প্রোপাগান্ডায় আই. বি এবং মিডিয়ার সমর্থন তারা সম্পূর্ণভাবে পেতে শুরু করে ।

ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বা জেহাদী সন্ত্রাসবাদের প্রোপাগান্ডার জন্য ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই. বি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুসলমানদের হতাশ করার জন্য সন্ত্রাসবাদের হাতিয়ারকে ব্যাবহার করার সিদ্ধান্ত নেই তখন আই. বি 'সাধারণ গোয়েন্দা সূচনা' (General Intelligence) নামে পরিচিত এবং অপরিচিত মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নামে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদেরকে, প্রতিষ্ঠান এবং ধার্মিক স্থানের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার মিথ্যা প্রচার শুরু করে দেয় এবং মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির ভূয়া সংবাদ দেওয়া শুরু করে দেয় । অথচ সত্য এটাই যে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অভিধানে 'সাধারণ গোয়েন্দা সূচনা' নামের কোন পারিভাষিক অর্থই নেই । ইন্টেলিজেন্স শব্দের অর্থ হল গোপন ভাবে এমন গুপ্ত সংবাদ প্রাপ্ত করা যা সার্বজনিক করা যায় না বরং গোপন রাখা যায় যার উপর ভিত্তি করে উচিৎ সম্মত তদন্ত করা যেতে পারে । কিন্তু আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) মুসলমানদেরকে বদনাম করার জন্য এবং মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য সঙ্ঘ পরিবারের আদেশে এবং পুলিশ আই. বির ইশারায় ইন্টেলিজেন্সের নামে ভুয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণ্যবাদী মিডিয়ার সহযোগিতায় প্রায় প্রতি সপ্তাহে সন্ত্রাসবাদের ভূয়া সংবাদ প্রচার করা শুরু করে দেয় যাতে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে বদনাম করা যায় এবং সমাজে মুসলমানদের চিত্র নষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিপূনভাবে সফল হয় । মুসলিম সন্ত্রাসবাদের যে প্রোপাগান্ডা করা হয় তার কয়েকটি উদাহারণ নিচে দেওয়া হল,

১) আল কায়দা মুম্বাই এবং দিল্লীতে হামলা করতে পারে : স্বাধীনতা দিবসের দিনে সন্ত্রাসবাদী হামলার সম্ভাবনার জন্য আমেরিকার তরফ থেকে সাবধানবার্তা । (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা, ১২ আগষ্ট ২০০৬) নোট ঃ- এই গোপন সংবাদ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো মিডিয়াকে দেয় যা তার পরের দিন আমেরিকা তা অস্বীকার করে ।

২) পুলিশের রুপ ধারণ করে মুম্বাইয়ের গণপতি বিসর্জনের দিনে হামলা করতে পারে । (গুপ্তচর বিভাগের সূত্র অনুযায়ী, দৈনিক পুধারী, কোলহাপুরের রিপোর্ট, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৩) গোয়ার পর্যটকরা আল কায়দার নিশানায় । (ইন্টেলিন্সের সূত্র অনুযায়ী, দৈনিক সকাল, পুনা, ২ ডিসেম্বর ২০০৬)

৪) আল কায়দা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল । (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পুনা এবং দৈনিক সকাল, পুনা, ৯ জুন, ২০০৭)

৫) মহন্ত নৃত্য রামগোপাল দাসকে আল কায়দার হুমকি । (নবভারত, মুম্বাই, ২৩ নভেম্বর ২০০৭) এই খবর পুলিশের দ্বারা সংবাদপত্রে দেওয়ার ফলে প্রকাশিত হয়েছিল যে মহন্তকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যেখানে আল কায়দা ধমক দিয়ে বলেছে যে, "নিজের চ্যালাদের নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করো তা নাহয় মরার জন্য প্রস্তুত হও ।" কিন্তু পরের দিন বোঝা যায় যে সেটা জাল চিঠি ছিল এবং মহন্ত নিজে তার এক চ্যালা সন্তোষ জয়সওয়াল নামের একজনকে দিয়ে লিখিয়েছিল । সে চেয়েছিল যে মহন্তর সুরক্ষা বাড়িয়ে দেওয়া হোক । (আজ কা আনন্দ, পুনা, ২৪ নভেম্বর, ২০০৭)

৬) দাউদ ইব্রাহিম আদবানী এবং মোদীকে হত্যা করার জন্য সুপারী নিয়েছে । (দৈনিক সকাল, পুনা, দৈনিক সামনা, পুনা, ৩০ জানুয়ারী ২০০৮) 'র' দ্বারা এই খবর সংবাদপত্র সংগ্রহ করে)

৭) (ক) সচীন তেন্ডুরকরকে অপহরণ করার চেষ্টা । (দৈনিক সকাল, কোলহাপুর, ৩ নভেম্বর ২০০৮, নাগপুর পুলিশের সূত্র অনুযায়ী)

(খ) সচীনকে অপহরণ করার চেষ্টা করছে জৈশ (জৈশে মুহাম্মাদ), কিন্তু ইন্টেলিজেন্স এই খবরকে অস্বীকার করেছে । (দৈনিক পুধারী, কোলহাপুর, ৪ নভেম্বর, ২০০৮) নাগপুরের পুলিশ কমিশনারের সুত্র অনুযায়ী ।

(গ) সচীনকে জৈশ থেকে বিপদ । (তরুন ভারত, কোলহাপুর, ৪ নভেম্বর, ২০০৮) নাগপুরের পুলিশ কমিশনারের সুত্র অনুযায়ী । যখন আই. বি এই সংবাদ থেকে অস্বীকার করে তখন কমিশনার বলে যে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয় থেকে এই খবর পেয়েছে ।

৮) বরুন গান্ধীকে হত্যা করার চক্রান্ত শাকিলের । (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১ এপ্রিল ২০০৯, লক্ষ্ণৌয়ে আই. বির সূত্র অনুযায়ী ।

৯) জগন্নাথের মন্দির নিশানায় । (দৈনিক সকাল, পুনা, ১৮ মে ২০০৮, ইন্টেলিজেন্সের সূত্র অনুযায়ী) ১০) দেশে ঢুকছে ৩০০ মানববোমা (সংবাদ প্রতিদিন, ৫ নভেম্বর ২০১৪, বুধবার)

১১) ২৬/১১-র ধাঁচে কলকাতা বন্দরে হামলার ছক, চাঞ্চল্য । (সংবাদ প্রতিদিন, ৫ নভেম্বর ২০১৪, বুধবার)

১২) ২৬/১১-র ধাঁচে কলকাতা বন্দরে হামলার ছক, চাঞ্চল্য । (সংবাদ প্রতিদিন, ৫ নভেম্বর ২০১৪, বুধবার)

১৩) কলকাতা মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে বার্তা,

- ❖ মার্কিন গবেষক জানালেন, পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিদের লক্ষ্য এখন ভারত ।
- ❖ মাসুদ আযহারের হুঁশিয়ারী, ৩০০ আত্মঘাতী মানববোমা ভারতে ঢোকার জন্য প্রস্তুত ।
- ❖ আফগানিস্তান থেকে যত মার্কিন সেনা সরবে তত জঙ্গিরা লক্ষ্য বানাবে ভারতীয় সেনাদের ।
- ❖ ভারত ও আফগানিস্তানের অস্থিরতা তৈরির কাজ করে চলেছে পাকিস্তান । (সংবাদ প্রতিদিন, ৫ নভেম্বর ২০১৪, বুধবার)

এই হল গোয়েন্দা সুত্রের খবর । এখানে কয়েকটি উদাহরণস্বরুপ দেওয়া হল । এরকম খবর সংবাদপত্রে হামেশায় দেখা যায় যার একটাও সত্য নই । এইসব উড়ো খবরের উপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে কড়া সুরক্ষা ব্যাবস্থার বন্দোবস্ত করা হয় ফলে বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে, জাহাজবন্দরে, বিমানবন্দরের যাত্রিদের লাইনে দাঁড় করিয়ে তল্লাসী চালানো হয় এবং যাত্রীরা পেরেশান হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং মনে মনে মুসলমানদের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম হয় এবং তারা এটাই মনে করেন যে তাদের এই তল্লাসীর জন্য মুসলিম সন্ত্রাসবাদই দায়ী । কিন্তু এই নিরীহ হিন্দুদেরকে কে বোঝাবে যে মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, নানদেড়ে বিস্ফোরণ, মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কারা ?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মিডিয়া যে কোন খবর কোনরকম সত্যতা যাঁচাই না করেই প্রসারণ করে দেই ফলে সমাজে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের একটি এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে । তাহলে বাস্তবেই কি তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসবাদ ভয়ঙ্কর ? এবং এটাই গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন যে বাস্তবেই কি ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু আছে কি ? সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের মানসিকতা, ইতিহাস এবং তাদের কর্মপদ্ধতির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে এর উত্তর একটাই "ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু নেই ।"

গত দুই শতকের সন্ত্রাসবাদের গতিবিধির উপর যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে সন্ত্রাসবাদী সেইসব লোককে কোনমতেই ছাড়েনি যারা তাদের মতাদর্শের বিরোধীতা করেছে অথবা তাদের গতিবিধিকে আটকাবার চেষ্টা করেছে অথবা তাদের দাবীকে অস্বীকার করেছে । নিচে এর কয়েকটি উদাহারণ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায়,

১) যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন দক্ষিন আমেরিকার রাজ্যগুলিকে আলাদা দেশ হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন তখন নতুন দেশ হিসাবে দাবীদার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'কন্ফিড্রেসী' এর এক সদস্য আব্রাহাম লিঙ্কনকে ১৫ এপ্রিল ১৮৬৫ সালে হত্যা করে ।

২) ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীকে তামিলনাডুর পেরুমবুদুরে এল. টি. টি. ই জঙ্গিরা হত্যা করে । অভ্যর্থনা জানানোর বাহানায় এল. টি. টি. ইর একজন মহিলা জঙ্গি নিজের দেহে রাখা বিস্ফোরক ফাটিয়ে রাজীব গান্ধীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় । পরে তাঁর পায়ের পাতা দেখে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় । পরে জানা যায় ওই আত্মঘাতি মহিলাটির নাম ধানু ।

৩) পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনযীর ভুট্টোকে 'লস্কর এ ঝঙ্গবী' নামক শিয়া বিরোধী চরমপন্থী ইসলামী সংগঠন ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে হত্যা করে । তবে অনেকেই বলেন যে এই হত্যা আল কায়দা গোষ্ঠী করেছে এবং আল কায়দা এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে বলেই সংবাদ মাধ্যমে জানা যায় ।

৪) ১৮৮১ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটাসবার্গের রাস্তায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হয়েছিল । তিনি বুলেট প্রুফ গাড়িতে ঘুরছিলেন । বোমা বিস্ফোরণ করে হত্যা করেছিল ইগনেসি ।

সন্ত্রাসবাদী দ্বারা বিরোধীপক্ষকে খতম করার ঘটনা জানার জন্য বেশী দুর যেতে হবে না । আমাদের দেশেই স্বাধীনতার ৬৬ বছরের মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতাদেরকে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করে । জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে ব্রাম্ভন্যবাদী আর. এস. এস নেতা নাথুরাম গডসে চরম নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অপারেশন ব্লু ষ্টারের জন্য খলিস্তানী শিখ সন্ত্রাসবাদীরা নৃশংসভাবে গুলি তার বুক ঝাঁঝরা করে হত্যা করে এবং ১৯৯১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকেও তামিলনাডুর পেরুমবুদুরে এল. টি. টি. ই জঙ্গিরা হত্যা করে ।

এই উদাহারণগুলি থেকে এটাই বোঝা যায় যে যারা প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী তারা বিরোধী নেতাদেরকে কখনো ছাড়েনি । কিন্তু ভারতে বহুল চর্চিত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' বা 'জেহাদী সন্ত্রাসবাদ' এর ব্যাপারে এই রকম মনে হয় না । তাদের এই ব্যাপারে কোন দৃষ্টান্ত নেই । আই. বি এবং মিডিয়ার সহযোগিতায় ব্রাম্ভন্যবাদীরা মুসলিম সন্ত্রাসবাদের যে চিত্র লোকেদের মস্তিস্কে প্রবেশ করিয়েছে যে পুর্ব এবং বর্তমান সমস্ত সন্ত্রাসের থেকে বেশী মারাত্মক । যদিও ভারতে সমস্ত সন্ত্রাস ভয়ানক তথাপি মুসলিম সন্ত্রাসের ব্যাপারে শোরগোল বেশী । রাজনৈতিক নেতা এবং কট্টরপন্থী ব্রাম্ভন্যবাদী নেতারা দিনরাত মুসলিম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগরণ করে চলেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো উপর হামলা তো দুরের কথা, হামলার প্রয়াসও করেনি ।

হয়তো একথা বলা যেতে পারে যে জেহাদী সন্ত্রাসবাদীরা সেইসব ব্রাম্ভন্যবাদী নেতাদের হত্যা করতে পারে না তার কারণ তাদের সুরক্ষা ব্যাবস্থা কড়া, দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসবাদীদের এটা ভয় যে এরকম ধরণের কোন হামলার প্রতিক্রিয়াস্বরুপ দেশী অধিক সংখ্যক মুসলমানদের হত্যা করা হবে । এখানে এই দুটি তর্কই ভ্রান্ত কেননা, এর আগে একাধিক রাষ্ট্রনেতাদেরকে হত্যা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নেতার সুরক্ষা যতই কড়া হোক সন্ত্রাসবাদীরা যে কোন উপায়ে

তাদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে হত্যা করে দেখিয়ে দিয়েছে তাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না । দ্বিতীয়ত আই. বি এবং ব্রাম্ভন্যবাদী নেতারা এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে 'জিহাদী সন্ত্রাসবাদ' কোন মতেই এর উপর দুঃখ প্রকাশ করবে না যে সাধারণ নিরীহ মুসলমান তাদের জন্য মারা গেছে । আসল কথা হল আমাদের দেশের জিহাদী সন্ত্রাসবাদের ভুতের কোন অস্তিত্বই নেই । ব্রাম্ভন্যবাদী নেতারা একথা ভালভাবেই জানে সেজন্য তারা সারা দেশে খোলমেলাভাবে ঘুরে বেড়ায় ।

তবে ভারতে কতকগুলি সন্ত্রাসবাদী হামলায় মুসলমারা লিপ্ত থাকার কথা বলা হয় যেমন, ১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ, ১৯৯৮ সালে কোয়েম্বাটুরে বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি । তবে এগুলির জন্য মুসলমানদের বিশেষভাবে দায়ী করা যায় না, কেননা, ১৯৯২ সালে বাল ঠাকরে দ্বারা মুসলমানদের যে গণহত্যা করে তার প্রতিবাদস্বরুপ এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় । আর কোয়েম্বাটুরে যে বোমা বিস্ফোরণ হয় তাও কোয়েম্বাটুরে সংঘ পরিবার দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক গতিবিধির জন্য ক্ষোভে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তবে এই বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত আব্দুল নাসীর মাদানীকে এবং অন্যান্য লোকেদেরকেও মাদ্রাস হাইকোর্ট অপরাধমুক্ত বলে ঘোষনা করে । এই ঘটনাকে নিয়েও মিডিয়া প্রচুর জালিয়াতি করেছে । ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া মুসলমানদের বাড়িতে বালির বস্তাকে আর. ডি. এক্স এর বস্তা বলে প্রচার করেছে ।

মুসলিম সন্ত্রাসবাদের প্রোপাগান্ডা আই. বি, ব্রাম্ভন্যবাদীরা এবং ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া এইজন্য ছড়িয়েছে যাতে তাদের দ্বারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আড়াল হতে পারে । প্রকৃতপক্ষে ভারতের কোন মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয় । কেননা, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "ভারেতের মুসলিমরা মোটেও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না । ১৫ কোটি মুসলিম জনসংখার মধ্যে এক দুজন সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বেশীর ভাগটাই বাইরে থেকে আমদানী । বাইরে থেকেই সন্ত্রাসবাদ ভারতে ঢুকছে । ভারতের নিজস্ব সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম একেবারেই নগন্য । আর দেশের মধ্যে যখন এমন কোন সন্ত্রাসবাদের খবর মেলে আমরা তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিই ।"

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সি. এন. এন কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "ভারতের মুসলিমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে কিন্তু দেশবিরোধী কোন কাজকর্ম তারা প্রশ্রয় দেবে না । মুসলিমদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিৎ নয় ।"

তবে আমাদের বক্তব্য হল নরেন্দ্র মোদীর কথায় আমরা ভারতীয় মুসলমানরা দেশপ্রেমী নয় । আমরা আজন্মা দেশপ্রেমী । নরেন্দ্র মোদী যে গুজরাটে নরহত্যা করিয়েছে তাতে তো স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি দেশের নম্বর সন্ত্রাসবাদী ।

জিহাদ ইসলামের একটি পবিত্র শিক্ষা

জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হল ইসলামের একটি পবিত্র শিক্ষা। জিহাদ আল্লাহতাআলার হুকুম। জিহাদের সংজ্ঞা হল, চেষ্টা করা, সাধনা করা, সর্বাত্মক মেহনত করা, ধর্মযুদ্ধে কাফেররদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করাকে শরীয়াতের ভাষায় জিহাদ বলে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যাক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন জিহাদ কি ? রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন, কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হট। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল কোন জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট ? রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন, ঐ ব্যাক্তির জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট যার ঘোড়া জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শাহাদাত বরণ করে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭/ মুসনাদে আহমদ/ বাইহাকী শরীফ/ তিবরানী)

হাদীস শরীফে আরও আছে, একদা কোন এক সাহাবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল জিহাদ কি ? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কোন প্রকার খিয়ানত ও অলসতা থাড়া কাফেরের মুকাবিলা করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (শোয়াবুল ইমান লিল বাইহাকী)

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) জিহাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, জীম হরফে কসরা 'জের' বিশিষ্ট শব্দের শাব্দিক অর্থ কষ্ট করা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। জিহাদের শাব্দিক অর্থ হল, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যায় করা। (ফতহুল বারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪)

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহতাআলার জমিনে আল্লাহর দীন বুলন্দ করার জন্য খোদাদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় কর। (উমদাতুল কারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৬)

আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, জিহাদ বলা হয় কাফেরের মুকাবিলায় জিহাদের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যায় করা। (আল মিরকাতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ)

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আল বিদায়া ওয়াস সানায়াতে লেখা আছে, জিহাদ হল আল্লাহর তাআলার রাহে জান, মাল ও জবান ইত্যাদির সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলায় সর্বশক্তি ব্যয় করা। (আল বিদায়া ওয়াস সানায়া, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৭)

রদ্দুল মুহতারে আছে, (জিহাদ হল) সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা। গ্রহণ না করলে তার সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে। (খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৯)

সুতরাং এককথায় জিহাদ হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলার দ্বীন ইসলামকে বুলন্দ করা, কলেমার শিক্ষা বুলন্দ করার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা, কষ্ট সহ্য করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ।

এখানে কাফের বলতে সেইসব কাফেরের কথা বলা হয়েছে যার ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে, ইসলামকে উৎখাত করার জন্য, ইসলামের শিক্ষাকে নির্মূল করার জন্য, নবী (সাঃ) এর মর্যাদাকে আঘাত করার জন্য যারা উঠেপড়ে লেগেছে । যারা ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করে, নবী (সাঃ) এর চরিত্র নিয়ে কু-সমালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধকে জিহাদ বলা হয়েছে । জিহাদ মানে এই নয় যে কোন নিরীহ মুসলমান, নির্দোষ হিন্দু বা অমুসলিমকে হত্যা করা । কোন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করাকে ইসলাম সমর্থন করেনা । নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা কুফরী সে হিন্দু হোক অথবা যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন । কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন যে, কেউ যদি একজন ব্যাক্তিকে হত্যা করে সে যেন সারা পৃথিবীর লোককে হত্যা করল, আর কেউ যদি একজন লোকের প্রাণ বাঁচালো সে যেন সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ বাঁচালো । (আল কুরআন)

যেসব মুজাহিদ জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মারা যান তাদেরকে শহীদ বলা হয় । আর শহীদদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (سورة البقرة:154)

অনুবাদ ঃ এবং যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় কতল (নিহত) হয়েছেন তাদেরকে মৃত বলোনা তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তাদের জীবন সম্পর্কে জাননা । (সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. (سورة آل عمران:169)

অনুবাদ ঃ যাঁরা আল্লাহর রাস্তার শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বলে মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত, তাঁরা আল্লাহর নিকট রিজিক পান ।

সুতরাং জিহাদ হল ইসলামের একটি পবিত্র শিক্ষা যা উচ্ছেদ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নেই । কেননা কুরআন শরীফের ৪৮৪টি আয়াতে আল্লাহ জিহাদের কথা বলেছেন । নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সারা জীবন জিহাদে অতিবাহিত করেছেন । সাহাবায়ে কেরামগণ আমরণ জিহাদে জীবন উৎসর্গ করেছেন । তাই জিহাদকে ইসলামী জীবন থেকে উচ্ছেদ করা কষ্টসাধ্য নয় বরং দুঃসাধ্য ব্যাপার ।

যেসব ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনী মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় খানাতল্লাসী করে জিহাদের বই পুস্তক উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন তাদেরকে জানিয়ে দিই যে কুরআন শরীফের পাতায় পাতায় আল্লাহ জিহাদের কথা বলেছেন, নবী (সাঃ) জীবনটাই হল জিহাদের জীবন, মাদ্রাসার বর্ণপরিচয় পুস্তক থেকে শুরু করে মাওলানা কোর্সের শেষ গ্রন্থ বুখারী

শরীফ পর্যন্ত জিহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় জিহাদের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর নবী (সাঃ) বদরের ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ১০০০ জন কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, তিনি উহুদে ৭০০ জন সৈন্য নিয়ে ৩০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, খন্দকে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে ১২,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, মুতায় ৩০০০ সৈন্য নিয়ে ১০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, ইয়ারমুকে ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে ২,৪০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। অপরদিকে কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানরা ৮০০ সৈন্য নিয়ে ৬০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, স্পেনে মুসলমানরা ৭০০০ সৈন্য নিয়ে ১০০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানরা ৬০০০ সৈন্য নিয়ে ৫০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

সুতরাং জিহাদ ইসলামী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত যা ইসলাম থেকে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। জিহাদকে ইসলাম থেকে পৃথক করা মানেই ইসলামকে খতম করা। ইসলামকে খতম করা যেমন সম্ভব নয় ঠিক তেমনি জিহাদকোও ইসলাম থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী লেফটেনান্ট জেনারেল জাভেদ আশরফ কাজি, শিক্ষক, অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, আধ্যাত্মিক নেতা প্রভৃতি সকল মহলের সঙ্গে মাদ্রাসা ও স্কুল থেকে জেহাদ সম্পর্কিত সিলেবাস তুলে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন। কোনও স্কুল বা মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম থেকে 'জিহাদ' সংক্রান্ত অধ্যায় তুলে দিতে রাজি হন নি। তাঁরা বলেছিলেন, জিহাদ ইসলামের পবিত্র শিক্ষা, জিহাদ আল্লাহ তাআলার হুকুম। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান- "Jihad is an integral part of Islamic teaching and beliefs and would not be taken off the curricula, is currently being revewed. Jihad has many dimensions, which also includes self negation, and we will teach student the full concept of Jihad." (The Telegraph, 26 July 2006)

সুতরাং ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনীদেরকে জানাই মাদ্রাসায় আর জিহাদী পুস্তক খোঁজার জন্য খানাতল্লাসী চালাতে হবে না। কেননা, মাদ্রাসায় বর্ণপরিচয় থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জিহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে আপনারা কি পারবেন ভারতবর্ষ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাজেয়াপ্ত করতে ? একবার চেষ্টা করে দেখুন দেখবেন মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাজেয়াপ্ত তো করতে পারবেন না বরং আপনাদের অস্তিত্বই মিটিয়ে দেওয়া হবে। কেননা আপনাদের পূর্বসূরী ইংরেজরা এসেছিল মাদ্রাসাশিক্ষাকে খতম করার জন্য কিন্তু আজ তো তাদের এদেশে অস্তিস্ব তবে নেই মাদ্রাসা শিক্ষা রয়ে গেছে। আর তাদের উত্তরসূরী হয়ে আপনারা যদি মাদ্রাসাকে উচ্ছেদ করার অপপ্রয়াস করেন তাহলে আপনাদের অস্তত্বও শেষ হয়ে যাবে।

গযওয়ায়ে হিন্দ বা ভারতবর্ষে জিহাদ

আল্লাহর রসুল (সাঃ) ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযানের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি এমন যুদ্ধের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করলেই দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে। ইমাম

নাসাই (রহঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থে 'গাযওয়াতুল হিন্দ' শিরোনামে, ইমাম তিবরানী মু'জাম গ্রন্থে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সাওবান মাওলা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার অনুসারীদের দুটি গোষ্ঠিকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন । প্রথমত যারা ভারতর্ষে জিহাদ করবে, দ্বিতীয়ত যারা হযরত ইসা (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে । (সুনানে নাসাই, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩)

অন্য বর্ণনায় আছে যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে ভারতবর্ষের গযওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন । আমি তাতে শরীক হলে ধন-প্রাণ ব্যয় করব । যদি তাতে মারা যাই, উচ্চ স্তরের শহীদ রুপে গন্য হব । আর যদি জীবিত ফিরি তবে আবু হুরাইরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে । (সুনানে নাসাই, মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আসাকির ও ইবনে কাসীর 'গাযওয়া হিন্দ' বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন । আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৯৫ এর মধ্যে আছে - 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' বিষয়ক হাদীস জানা যায়, যা বর্ণনা করেছেন হাফিয ইবনে আসাকির প্রমুখ । গোলাম আলী আযাদ উপরের দুটি হাদীসই বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন সাবহাতুল মারজান গ্রন্থের ২১ নং পৃষ্ঠায় । খিলাফতে রাশেদা ঐর হিন্দুস্তান নামক পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায়ও এই হাদীস রয়েছে । তথ্যসূত্র ঃ হিন্দুধর্মের গোপন কথা, প্রনেতা - মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী)

এই হাদীসটির পর্যালোচনা

এইসব হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যারা ভারতবর্ষে জিহাদ করবে তাদের শরীর জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না এবং তারা উত্তম শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে ।

ভারতবর্ষে জিহাদের হুকুম আল্লাহর নবী (সাঃ) দিয়েছেন তার মানে এই নয় যে যেকো সময় তরবারী নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা সাধারণ হিন্দুদেকেকে হত্যা করা জায়েজ হয়ে যাবে । কারণ শরীয়াতের হুকুম হল সরকার যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ফরমান জারী না করে বা মুসলমানদেরকে অত্যাচার না করে তাহলে সেই দেশের মুসলমানবদের জন্য অস্ত্রের দ্বারা জিহাদ করা জায়েয নয় ।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল তিন প্রকার, (১) দারুল ইসলাম, (২) দারুল আমান ও (৩) দারুল হারব ।

(১) দারুল ইসলাম ঃ 'দারুল ইসলাম' বলা হয় সেই রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়াত কায়েম আছে এবং কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা অনুযায়ী দেশের সংবিধান রচিত এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী দেশ শাসন হয় এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের সমস্ত রকমের সুরক্ষা ব্যাবস্থা সেখানে মজুত আছে । এই রাষ্ট্রে সরকার ও শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা জিহাদ করা হারাম । যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার শরীয়াত মেনে চলে জানা সত্যেও

জিহাদ করে তাহলে সে দেশদ্রোহী । তার শাস্তি হওয়া উচিৎ । দারুল ইসলাম হল, সৌদী আরব, ইয়ামেন, কাতার প্রভৃতি । এইসব দেশে জিহাদ করা হারাম ।

(২) দারুল আমান ঃ 'দারুল আমান' বলা হয় সেই রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্রে শরীয়াতী আইন চালু না থাকলেও মুসলমানদের জন্য সমস্ত রকম ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা আছে । মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করে না । এইসব দেশের শাসক অমুসলিম মতো মুসলমানদেরকে সরকারী কাজে নিয়োগ করে এবং কোন রকম দ্বিচারিতা করে না । এইসব দেশকে বলা হয় দারুল আমান । দারুল আমানে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয নয় । বরং সরকার ও সংবিধান মান্য করা উচিৎ । সংবিধান মান্য করে কলমের জিহাদ, ধর্মীয় আন্দোলন, অধিকারের আন্দোলন করা যেতে পারে । এটা মানুষের মৌলিক অধিকার । দারুল আমানের উদাহরণ হল, ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষে বর্তমানে মুসলমানদের জন্য অস্ত্রের দ্বারা জিহাদ করা যাবে না ।

৩) দারুল হারব ঃ 'দারুল হারব' বলা হয় সেই রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্রে শরীয়াতি আইন তো চালু নেই বরং মুসলমানদের কোন ধর্মীয় অধিকারও নেই । এই রাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন করা হয় । জোর করে মুসলমানদেরকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় । মুসলমান মেয়েদের ইজ্জত লুন্ঠন করা হয় । মসজিদ ভাঙা হয় । কুরআন শরীফে পাবন্দী লাগানো হয় । এককথায় যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের কোনরকমের ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার নেই সেই রাষ্ট্রকে বলা হয় দারুল হারব । এই দারুল হারবে মুসলমানদের জন্য জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায় । দারুল হারবের হুকুম হল হয় জিহাদ করতে হবে তা নাহয় দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে হিজরত করতে হবে । দারুল হারবের উদারহণ হল ফ্রান্স । কেননা এখানে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান বোরকা নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে । এই দেশের মুসলমানদের জন্য হয় জিহাদ করতে হবে নাহয় হিজরত করতে হবে ।

এখন আমরা দেখব ভারতবর্ষ দারুল হারব কিনা । আমাদের উলামায়ে কেরামগণ এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষকে দারুল হারবের ফতোয়া দেন নি কেননা ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা এখনো ক্ষুন্ন হয়নি । সংবিধানে মুসলমানদের জন্য সবরকম মৌলিক অধিকার রয়েছে । যদিও সাচার কমিটির রিপোর্ট আসার পর এটা আমরা বুঝতে পেরেছি ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের মুসলমানরা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে তবুও ভারতবর্ষকে আলাদের উলামারা দারুল হারব বলে ফতোয়া দেন নি । কারণ এই সমস্যার সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সমাধান করা সম্ভব । তাই আমাদের উচিৎ আইনকে সামনে রেখে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে মুসলমানদের এই পিছিয়ে পড়াটাকে যেন দুর করা হয় ।

একটা সময় ছিল যখন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ভারতবর্ষকে দারুল হারব বলে

ফতোয়া দিয়েছিলেন । এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমান ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেছিলেন এবং শ্যামলীর ময়দানে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছিলে । এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করেই মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) রেশমী রুমাল আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং ১৮৫৭ সালে ৫৭ হাজার আলেম ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছিলেন । এবং এই প্রসঙ্গেই বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার উলামায়ে কেরাম (দেওবন্দ) সম্পর্কে লিখেছেন, "আমাদের রাজত্ব করতে মুসলমানদের কোনো দলকে ভয় পাইনা । যদি ভয় হয় তো কেবলমাত্র একছত্র ওহাবী দলটাকে । কেননা তারাই আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ।" (The Indian Muslims, Page-32)

এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করেই যে আন্দোলন উলামায়ে কেরামগণ করেছিলেন তা আমি এর আগে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামদের অবদান' নামক শিরোনামে উল্লেখ করেছি ।

যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল এবং ইংরেজরা এই দেশ থেকে পলায়ন করল তখন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর ফতোয়া স্থগিত হয়ে যায় এবং জিহাদের হুকুমও রহিত হয়ে যায় ।

এখন আমরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বলব, যেহেতু ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারতবর্ষ আর দারুল হারব নেই সেজন্য ভারতবর্ষে এখন আর আস্ত্রের জিহাদ করা চলবে না তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে আর উলামায়ে কেরামরা দারুল হারব বলে ফতোয়া দিবেন না । ইংরেজদের আমলে যেরকম মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার জন্য শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) দারুল হারবের ফতোয়া দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম যদি ভবিষ্যতে এদেশের মুসলমানদের উপর ইংরেজদের জামানার মতো অত্যাচার শুরু করা হয় এবং মুসলামানদের জান মালের উপর যদি আক্রমন শরু হয় তাহলে যে কোনদিন উলামায়ে কেরামগণ এই দেশকে দারুল হারব বলে ফতোয়া দিয়ে দিতে পারেন । আর যেদিনই এই দেশকে উলামাগণ দারুল হারব বলে ফতোয়া দিবেন সেই দিনই আমরা শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব । সেদিন কিন্তু মুসলমানদের তরবারীর আঘাত থেকে তাদেরকে কাউ বাঁচাতে পারবে না । আর একথা মনে করার প্রয়োজন নেই যে ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা কম বলে আমাদের পরাজয় হবে । ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন আল্লাহর নবী (সাঃ) বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ১০০০ কাফের সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন, উহুদ যুদ্ধে ৭০০ জন সৈন্য নিয়ে ৩০০০ কাফের সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন, ইয়ারমুকে ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে ২,৪০,০০০ সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন । ইসলামের ইতিহাস পাঠকারী প্রত্যেকেই জানেন মুসলমান সৈন্যদের থেকে কাফের সৈন্য অনেক বেশী ছিল তবুও ইসলামেরই জয় হয়েছে । সেজন্য ঐতিহাসিক মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন, "আসলে মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুশাসিত ইসলামের আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিরাট চমকপ্রদ অধ্যায় ।"

ঐতিহাসিক মানবেন্দ্র নাথ রায় আরও লিখেছেন, "জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসারতা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট । আগাস্টাসের রোমক সাম্রাজ্য বীর ট্রাজানের সাহায্যে পরবর্তী যুগে আরও বড় হয়েছিলো । সাতশত বছর ধরে বিরাট ও বিখ্যাত জয়ের উপরেই তার ভীত গড়ে উঠেছিলো । তবুও তা একশত বছরেরও কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যে ভাবে ফেঁপে উঠেছিলো, তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি । আলেকজান্ডারের রাজত্ব খলিফাদের সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয় । প্রায় এক হাজার বছর পারস্য সাম্রাজ্য রোমের আক্রমনের বিরুদ্ধে টিকেছিলো কিন্তু দশ বছরেরও কম সময়েইসলামের তরবারির কাছে তাকে হার মানতে হয় । আধুনিক কোন ঐতিহাসিক ইসলামের এই অপরূপ ও অভিনব অলৌকিকত্ত্বে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাবেন কি ?" (Historical Role of Islam. M. N. Roy)

সুতরাং ইসলামের কাছে অসম্ভ কিছুই নয় । তাই আমরা বলব ভারতবর্ষকে যেন দারুল হারবে পরিণত না করা হয় । তানাহলে পরিণতি অবশ্যই খারাপ হবে । তবে বর্তমানে বিজেপির রাজেশ্বর সিং যে বলেছেন "ভারতে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের থাকার কোন অধিকার নেই ২০২১ সালে মধ্যে ভারত থেকে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত করে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে ।" যদি তাই করার চেষ্টা করা হয় তাহলে এই দেশকে দারুল হারব ফতোয়া দিয়ে জিহাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে । কারণ মুহাম্মাদ বিন কাসেমের উত্তরসুরীরা এখনো বেঁচে আছে ।

যদিও এদেরকে সন্ত্রাসবাদী ধরা হয় তবুও মাদ্রাসাকে দায়ী করা যায় না

বর্তমানে সারা বিশ্বে মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী (Most Wanted Terrorist) হিসাবে খ্যাত হলেন ওসামা বিন লাদেন, ড. আইমান আল জাওয়াহিরী, আবু বকর আল বাগদাদী, দাউদ ইব্রাহীম, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ প্রভৃতিরা । যদিও আমরা এদেরকে তর্কের খাতিরে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ধরেও নিই তবুও মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া হিসাবে ধরা যেতে পারে না । কারণ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ছাড়া তাঁরা কেও মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন নি । মোল্লা ওমর যদিও মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত মাওলানা কোর্স পুরণ করেন নি । পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন । আর ওসামা বিন লাদেন মাদ্রাসায় পড়েন নি তিনি কলেজেই পড়াশুনা করেছেন । তিনি জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক পাশ করেন এবং পরে বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট নিয়েও স্নাতক করেন । তবে তাঁর ইসলামের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল গভীর । ইসলামের উত্থান পতনের ইতিহাস গভীর ভাবে অধ্যায়ন করেন । অপরদিকে আল কায়দার বর্তমান চীফ ড. আইমান আল জাওয়াহিরী ১৯৬৮ সালে মিশরের কাইরো ইউনিভর্সিটি থেকে মেডিসিন নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৭৮ সালে স্পেশাল সার্জারীর (Specialized in Surgery) উপর স্নাতক করেন । পরে তিনি পাকিস্তান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা চালু রাখেন এবং অনার্সসহ সার্জারীতে পিএইচডি (Ph.D) করেন ।

অপরদিকে ভারতের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী (Most Wanted Terrorist) দাউদ ইব্রাহীমও কোন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন নি। তিনিও স্কুল কলেজেই পড়াশুনা করেছেন। এবং যে নিরপরাধ আজমল আমীর কাসাবকে চক্রান্তকারীরা চক্রান্ত সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল তিনিও কোন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন নি তিনিও আমাদের মতো স্কুল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এবং বর্ধমানের খগড়াগড় বিস্ফোরণের জন্য এন আই এ (NIA/National Investigation Agency) যাদেরকে 'জঙ্গি' (?) সন্দেহ করে পাকড়াও করছে তারাও কোন মাদ্রাসার ছাত্র নয়। তারা সকলেই স্কুল কলেজের ছাত্র। তাঁরা কেবলমাত্র পড়াশুনাই করেননি। জেনারেল শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রিও তাঁরা অর্জন করেছেন।

তাহলে যাঁরা মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন তাঁরা এগিয়ে আসুন এবং পৃথিবীতে যত ম্যানেজম্যান্টে কলেজ আছে ও ইঞ্জিয়ারিং কলেজ আছে সেগুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিই কেননা আপনাদের কাছে মারাত্মক মোস্ট ওয়ান্টেট সন্ত্রাসবাদী (Most Wanted Terrorist) ওসামা বিন লাদেন এই কলেজে পড়াশুনা করেছেন এবং পৃথিবীতে যত ম্যাডিকেল কলেজ আছে সেগুলোকে উচ্ছেদ করি কেননা বর্তমান আল কায়দা চীফ ড. আইমান আল জাওয়াহিরী এই কলেজ থেকে সার্জারীতে পিএইচডি করেছেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত সরকারী ইউনিভার্সিটিগুলোকে উপড়ে ফেলি কেননা এইসব ইউনির্সিটি থেকে আপনাদের নিকট তথাকথিত ভয়ানক সন্ত্রাসী (?) আবু বকর আল বাগদাদী পড়াশুনা করেছেন।

পারবেন এইসব কলেজগুলোকে খতম করতে ? আছে আপনাদের কলেজাই দম ? আপনারা পারবেন না। আপনারা পারতেই পারেন না। কেবল ইসলামকে সমালোচনা করতে পারবেন। মাদ্রাসাশিক্ষা নিয়ে কটাক্ষ করতে পারবেন। কিন্তু এই স্কুল কলেজগুলোকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে ফতোয়া দিয়ে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না। আর বাজেয়াপ্ত করতে গেলে আপনাদের ছেলেমেয়েরা মুর্খ হয়ে মারা যাবে। ম্যাডিকেল কলেজে ডা. আইমান আল জাওয়াহিরী পড়াশুনা করেছেন বলে যদি তা বাজেয়াপ্ত করতে যান তাহলে আপনারা বিনা চিকিৎসার বেমত মারা যাবেন। আর আবু বকর আল বাগদাদী ইতিহাসে পিএইচডি করেছেন বলে ইউনিভর্সিটিগুলোকে বাজেয়াপ্ত করতে গেলে আপনাদের বাপদাদাদের ইতিহাসও খুঁজে পাবেন না।

সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির কারণ

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির সবথেকে বড় কারণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদকে উসকে দিচ্ছে। আর মুসলিম বিশ্বে জিহাদী গোষ্টীর তৎপরতারও মূল কারণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর পিছনে যে কোন রাজনৈতিক নেই তা নয়। আমেরিকা দ্বারা সন্ত্রাসবাদকে উসকে দেওয়া ও জিহাদী গোষ্ঠীর উসকে দেওয়ার পিছনে মার্কিনীদের যে স্বার্থ কাজ করছে তা মুসলিম বিশ্বের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রন আনা। এই মুসলিম বিশ্বের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রন এনে আমেরিকা নিজ দেশে অর্থনৈতিক

উন্নয়ন আনতে চায় । আর তার এই চাওয়াতে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাক তাতে আমেরিকার কোন পরোয়া নেই । আর আমেরিকার এই বেপরোয়াভাবে মুসলিম বিশ্বে অবৈধ আগ্রাসনের জন্য তাকে সারা পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে গণ্য হতে হয়েছে ।

আমেরিকা সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে অবতীর্ন হবার দ্বিতীয় কারণ হল, অবৈধভাবে ক্ষমতাদখল । সে চায় না যে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশ বিশ্বে সবথেকে বেশী শক্তিশালী দেশ হোউক । আর এই ক্ষমতাদখলের জন্য চালিয়েছে ইরাক ও আফগানিস্থানের মতো দেশে অবৈধ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ । তারা আক্রমণ করতে গিয়ে এতই নৃশংস হয়েছে যে বুশের আক্রমণে ইরাকের ৫০,০০০ নিরীহ শিশুই মারা গেছে । আফগানিস্তানে আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান মারা যান এবং বর্তমান আল কায়দা চীফ ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী ও কন্যাসন্তান মারা যান । এই আক্রমনের পিছনে আমেরিকার মূল কারণ ছিল মুসলিম বিশ্বকে ক্ষমতাহীন করে দিয়ে নিজে একছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া । আর এই ক্ষমতাহীন করার জন্য পরমাণু অস্ত্র অনুসন্ধানের নাম করে দিনের পর দিন মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করেছে ।

আর এই আমেরিকার মুসলিম বিশ্বে অবৈধ আগ্রাসনকে আটকাবার জন্য ও মুসলিম বিশ্বকে আমেরিকার থাবা থেকে বাঁচাবার জন্য জিহাদী গোষ্ঠী তৎপরতা বৃদ্ধি হয়েছে এবং বার বার আমেরিকা জিহাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছে । যাকে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে চিহ্নিত করেছে । কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই হামলার জন্য মূল দায়ী হল আমেরিকা । আমেরিকা যদি অবৈধভাবে মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ না করত তাহলে আমেরিকা নিজে আক্রমণের শিকার হত না ।

আমেরিকার উদ্দেশ্য তারা নিজেরা পরমাণু বোমা তৈরী করবে তাতে কোন দোষ নেই কিন্তু মুসলমানরা বানালে মারাত্মক অপরাধ । ইজারাইলের প্রধানমন্ত্রী এহুদ এলমার্ট ৬/১২/২০০৬ সালে বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘‘আমাদের পরমাণু বোমা আছে’’ তাতে আমেরিকার কোন মাথাব্যাথা নেই কারণ ইজারাইল তাদের ক্রীতদাস কিন্তু ইরাকে সাদ্দাম হোসেন পরমাণু বোমা বানালে তার চোখ কপালে উঠে গেছে কারণ সাদ্দাম আমেরিকার অনুগত্য স্বীকার করতে চান নি । আমেরিকা সারা বিশ্বে অস্ত্র তৈরী করে ব্যাবসা করলে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মুসলমানরা করলেই তার আর সহ্য হয় না । করলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো শক্তধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে আর আমেরিকা চায় না যে তারা ছাড়া আর কেউ পৃথিবীতে শক্তিশালী থাকুক । তারা চায় সারা বিশ্ব তাদের পদলেহী গোলাম হয়ে থাকুক । শায়খ ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ, ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরী আমেরিকাকে প্রভূ বলে স্বীকার করেন নি বলেই তারা সন্ত্রাসবাদী আর গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমানের রক্তপানকাররী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার গোলাম বলে তিনি নাকি শান্তিকামী ।

ইরাক রাষ্ট্রসংঘের ১৭টি আদেশ মানে নি তাই তারা অপরাধী । আর ইজারাইল রাষ্ট্রসংঘের ৬৬টি আদেশ মানে নি তবুও তারা নির্দোষ । উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা করেছে বলে সেই দেশের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে অবরোধ তৈরী করেছে আমেরিকা । কেন এই দ্বিচারিতা ? এই দ্বিচারিতা কেউ মেনে নিতে পারে ? যে মানবে না সেই আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসবাদী । যে মানবে সে শান্তিকামী । সে হয়ে যাবে শান্তিতে নোবেলজয়ী ।

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা হোয়াইট হাউসের ইন্টেলিজেন্স কমিটি ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কাছে । এই রিপোর্টটির শিরোনাম "Trends in Global Terrorism: Implications for United States." এই রিপোর্টটি তৈরী করে আমেরিকার বাঘা বাঘা গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা । তারা বলেছেন, "The American invasion and occupation has helped spawn a new generation of Islamic Radicalism and the overall terrorist threat has grown since the 9/11 attacts." এটা ইরাকের সম্পর্কে বলা হয়েছে । অর্থাৎ "ইরাকে আমেরিকা অভিযান চালিয়ে এবং ইরাকের ভূখন্ড দখল করে নতুন প্রজন্মের ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং ৯/১১ এর আক্রমণের পর থেকে সামগ্রিক সন্ত্রাসবাদী হুমকী বেড়েছে ।"

রিপোর্টটি নিউইয়ার্ক টাইমস নিউজ সার্ভিস ২০০৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে এবং তা সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমেই প্রচারিত হয় । রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, Islamic radicalism, rather than being in retreat, has spread across the globe …. Iraq war is a reason for the diffusion of Jihad ideology. Iraq war has made the overall terrorist problem worse. অর্থাৎ "ইসলামী চরমতন্ত্র (বা সন্ত্রাসবাদ) দমন হওয়ার পরিবর্তে উল্টে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে । ......ইরাক যুদ্ধই জেহাদী মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ । ইরাক যুদ্ধ সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদ সমস্যাকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে ।" (দেখুন The Times of India ২৫/৯/২০০৬)

তাহলে দেখুন আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা স্বয়ং একথা বলছে যে জেহাদী গোষ্ঠীর (যাদেরকে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদী বলে) বাড়বাড়ন্তের জন্য আমেররিকার সঙ্গে ইরাক যুদ্ধই দায়ী । আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুনিয়ার জর্জ বুশের পিতা সিনিয়ার জর্জ বুশ এবং আমেরিকার তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক শেনী ছিলেন টেক্সাসের সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানীর অন্যতম মালিক । জুনিয়ার জর্জ বুশের পিতা সিনিয়ার জর্জ বুশ ক্ষমতায় এসেই তেল উৎপাদক দেশগুলিকে ষড়যন্ত্র করে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন । ১৯৯১ সালে মিথ্যা অজুহাতে তিনি ইরাকে আক্রমণ করেন । টন টন বোমা ফেলে ইরাকের প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে ধ্বংস করা হয় । তবে বর্তমান বিশ্বের মতো তৎকালীন বিশ্ব এতো ক্ষমতাহীন ছিল না বলেই সেই অভিযান বন্ধ হয় । শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত সরকারের হতেই ইরাকে ক্ষমতা থাকে । কিন্তু বুশের বাচ্চা বুশ ক্ষমতাই যখন আসেন তখন বিশ্ব মেরুদন্ডহীন ও আমেরিকার পদলেহীতে পরিণত হয়ে গেছে । তাই পিতা যা পরেন নি তাই পুত্র করে দেখিয়ে দেন । সুতরাং পুরো ইরাককেই দখল করে নেওয়া হল এবং তেল ভান্ডারগুলোকে আত্মসাৎ

করা হল। তার কারণ তখন আমেরিকার অর্থনীতি ডলারের পাশাপাশি ইউরোর উত্থান বিপন্ন করে তুলেছিল। ডলারের তুলনায় ইউরোর দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। সাদ্দাম হোসেন সমস্ত বানিজ্য ইউরোয় করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বাড়তে লাগল ইউরো অঞ্চলে। তাই ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ডসে প্রচুর বিদেশী বিনিয়োগ আসতে লাগল। ইরান, সৌদী আরব ও ভেনেজুয়েলার মতো দেশগুলি ইউরোর বৃত্তের মধ্যে চলে আসে। তখন আমেরিকার লক্ষ্য হয়ে উঠল, তেল উৎপাদক দেশের সমিতি 'ওপেক' এর কার্টেলকে ভেঙে দেওয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার কাতার, কুয়েতের মতো দেশকে নিয়ে তেলের বাজার দখল করা। আমেরিকার এই তেলের বাজার দখলে আমেরিকা বনাম পশ্চিম এশিয়ার ইরান - ইরাকের মতো দেশের লড়াই আপন নিয়মে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রাচীন দ্বন্দ চলছিল তা জেগে উঠল। মুসলিম বিশ্বের শিল্পপতিরা ব্যাবসায় পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন ফলে তারা প্রমাদ গণলেন। আমেরিকার এই অবৈধ আগ্রাসনের ফলেই শায়খ ওসামা বিন লাদেনের উত্থান হয় এবং তিনি প্রথমে আফগানিস্তানের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং পরে মুসলিম বিশ্বের হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের দাবানল জ্বালিয়ে দিলেন। যা আমেরিকা সারা বিশ্বের সামনে লাদেনের এই উত্থানকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে আখ্যা দিতে লাগল। এবং আমেরিকার পোষ্যপুত্র দেশগুলিও লাদেনকে সন্ত্রাসী হিসেবে গন্য করতে পাগল। কারণ আমেরিকার পোষ্যপুত্ররা আমেরিকার ললিপপ খেতে ভালোবাসেন। আমেরকা যা শিক্ষা দেয় তাই তারা বাধ্য সন্তানের মতো মুখস্ত করে। যা খেতে দেয় তাই হজম করে। আমেরিকা তাদের গলায় বেড়ি (?) পরিয়ে যেরকম ঘুরোই সেরকম ঘুরে।

আমেরিকার এই অবৈধ প্রভূত্বকে ওসামা বিন লাদেনের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বগণ মেনে নেন নি। তাঁরা আমেরিকাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বরাবরই চেষ্টা করেছেন আর আমেরিকা সন্ত্রাসবাদ দমনের নাম করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। যেখানে সেখানে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে। আমেরিকা লক্ষ্য লক্ষ্য নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করেছে। ১৯৯২ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় আমেরিকার বাহিনী ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করে। ১৯৯১ সালের ইরাক যুদ্ধে ২০ লক্ষ্য মনুষকে হত্যা করে। ২০০১ সালের আফগানিস্থান আক্রমণে অন্তত ২০ হাজার মানুষকে হত্যা করে। এরা সকলেই মুসলমান। আফগানিস্তান আক্রমণের সময় এই মার্কিন হায়েনা বাহিনী বর্তমান আল কায়দা চীফ ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে হত্যা করে। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ তা সহ্য করবেন না। যার স্ত্রী ও সন্তানকে চোখের সামনে হত্যা করা হয় সে তো তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উগ্র হয়েই উঠবে। এই জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে না। এই প্রতিশোধের মানসে সে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকার উপর যেকোনভাবে আক্রমণের চেষ্টা করবে। যদি বুশের কন্যা লোরা বুশকে হত্যা করা হত তাহলে কি হত ?

মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্য ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে জর্জ বুশ খামখেয়ালীভাবে ৫০০০০ কোটি ডলার খরচ করেছে যা ভারতীয় মূল্য হিসাবে ২৫ লক্ষ্য কোটি টাকারও বেশি। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ চালানোর পর আমেরিকার খরচ হয়েছে ৩৭,৫০০ কোটি ডলার। সমগ্র আমেরিকা জুড়ে একটাই কথা যে War on Terrorism তে

আমেরিকা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বুশ তা মানছেন না। জনমত সমীক্ষায় ৮০% লোক বলছে, আমেরিকার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বুশ অনড়। 'নিউইয়ার্ক টাইমস' পত্রিকার কলমচি টমাস ফ্রিডম্যান ছিলেন ইরাক যুদ্ধের ভীষন সমর্থক। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ মত পরিবর্তন করে লিখেছেন, "The U.S is pursuing a failing strategy in Iraq snd the much promised victory is not happening and we cannot throw more good lives after good lives. It's time to rethink about plan B-how we might disengage with the least damage possible" (4/8/2006) অর্থাৎ "আমেরিকা ইরাকের পরাজয়ের কৌশল নিয়ে চলছে এবং বহু প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আমাদের বিজয় হয়নি এবং আমরা আরও অমূল্য জীবন নষ্ট করতে পারিনা। এখন সময় এসেছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কথা ভাবার - কীভাবে সবচেয়ে কম ক্ষতি করে আমরা সরে আসতে পারি।"

'নিউইয়ার্ক টাইমস' পত্রিকায় লেবাননে ইজরাইলের হামলার পর এক লেবাননী ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাতকারে লেবাননী ডাক্তার দম্পতি বলেন, "We will killed every American for this. Every Shiite Muslim will kill Americans. We will grind them under our shoes." মানুষ কতটা উত্তেজিত হলে এই মন্তব্য করতে পারে চিন্তা করুন। এইসব ঘটনাই মুজাহিদীনদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করছে। যাকে বর্তমান বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "Every action has its reaction" অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া আছে। স্বভাবতই মুসলিম বিশ্বে মার্কিন আগ্রাসন যত বাড়ছে জিহাদী গোষ্ঠীর তৎপরতাও বাড়ছে। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার আগ্রাসন। সন্ত্রাসবাদ ততদিন দমন হবে না যতদিন না মার্কিনী আগ্রাসন বন্ধ হচ্ছে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদী সন্ত্রাসবাদ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিলেন ফলে আমাদের দেশ স্বাধীনতার মুখ দেখতে পায়। এই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা মনে করত ইংরেজদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হামলা করে, তাদের অফিসে বোমা বিস্ফোরণ করে তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে ফলে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে। এই চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের পুনেতে দামোদর চাপেকর এবং বলিহারি চাপেকর নামে দুই ভাই মিলে দুইজন ইংরেজকে হত্যা করেছিল। ১৯০১ সালে মদনলাল ধিংড়া লন্ডনে স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে হত্যা করেন। তিনি বলেছিলেন, "মাতৃভূমির প্রতি অপমান ঈশ্বরের প্রতি অপমান। রক্ত নেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই।" বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, অরবিন্দ এরা ছিলেন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ভাবধারার ব্যাক্তিত্ব। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের পর্যালোচনা করে ব্রিটিশরাই গোপন রিপোর্টে লেখে যে Many Terrorists had made their political debut as civil resistor. অর্থাৎ অনেক সন্ত্রাসবাদীই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন সত্যাগ্রাহী হিসাবে।

এইসব ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীরা ১৯০২ সালে গুপ্তসমিতি গড়ে তোলেন এবং পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে বিপ্লবী সমিতি তৈরি হয় তার সমিতিতে ছিলেন প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, ব্যারোষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অরবিন্দ ঘোষ । তৎকালীন যুগে চিত্তরঞ্জন দাশকে বলা হত The best legal stried of the revolutionaries অর্থাৎ বিপ্লবীদের সবথেকে বড় ঢাল । এই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''ভারতবর্ষে কে প্রথম সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে ? বৃটিশ গভর্নমেন্ট শঠতা - কপটতা - বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন শোষন করিতেছে না কি ? কোন অধিকারের বলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবাসীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসিয়া আছে । একটা শান্তিপ্রিয় জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা কি সন্ত্রাসবাদ নয় কি ? ফল কথা । গভর্নমেন্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ডিমরেলিজেসন আসিয়াছিল, তখন আমরা বিপ্লবীরা কাউন্টার টেররিজম চালাইয়াছি ।'' বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবতীর এই কথাটি অত্যন্‌ত গুরুত্বপূর্ন । স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমচন্দ্র কানুনগো 'বাংলার বিপ্লবের প্রচেষ্টা' নামক বইয়ে বলেছেন, ''আমরা ছিলাম নিছকই টেররিষ্ট ।'' বারিন্দ্রকুমার ঘোষ নিজের আত্মজীবনিতে বলেছেন, ''আমরা ছিলাম ধনীশ্রেনীর ভাড়াটিয়া গুন্ডা ।'' বিপ্লবী অনন্ত সিং 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ' গ্রন্থে লিখেছেন, ''কিছুই জানা নেই । শুধু জানি ব্রিটিশকে হঠাতে হবে । মারব এবং মরব - এই আমাদের নীতি ।''

স্বাধীনতা সেনানী ব্রম্ভবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন । তিনি তাঁর পত্রিকায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় লিখতেন । তিনি লিখেছেন, ''যেমন পারবে সরাসরি মার ফেরত দেবে । যদি কপালে একটা ঘুষি জোটে সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে সে ঋণ পরিশোধ করতে ভুল যেন না হয় ।.....দ্বন্দক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়াই শ্রেষ্ট রীতি ।'' (১১ জানুয়ারী, ১৯০৭)

বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী হামলা ছাড়া দেশ স্বাধীন করা যাবে না । তিনি প্রথমে গান্ধীজির সঙ্গে অহিংসা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি পরে বুঝতে পারেন যে গান্ধীজির নীতিতে দেশ স্বাধীন হবে না সেজন্য সহিংস সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়েন ।

এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহিংস ধারা অবলম্বন করার একটাই উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশকে স্বাধীন করা । অপরদিকে জেহাদ (যাকে ইসলাম বিদ্বেষীরা সন্ত্রাসবাদ বলে) অর্থাৎ বর্তমানে শায়খ ওসামা বিন লাদেনের উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্মকে আমেরিকার থাবা থেকে মুক্ত করা, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের উদ্দেশ্য হল আফগানিস্থান থেকে আমেরিকার সৈন্যদেরকে তাড়ানো, এর আগে আফগান মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার হাত থেকে আফগানিস্থানকে স্বাধীন করা । মাওলানা মাসউদ আযহারের উদ্দেশ্য হল কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে স্বাধীন করা ।

সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য ও বর্তমান মুজাহিদদের উদ্দেশ্য একটাই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা আর মুজাহিদদের উদ্দেশ্য হল ইসলামকে বিপন্ন হতে মুক্ত করা। তাই আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ভগৎ সিং, শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ), সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ), মাওলানা হসরৎ মোহানী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ), আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ), মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) প্রভৃতিদের মধ্যে শায়খ ওসামা বিন লাদেন (রহঃ), মোল্লা ওমর মুজাহিদ, আনওয়ার আলাওয়াকী (রহঃ), আইমান আল জাওয়াহিরী, বাইতুল্লাহ মাহমুদ এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেরকম দেশকে স্বাধীন করার জন্য গোলা বারুদ হাতে তুলে নিয়েছিলেন ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের মুজাহিদরা ইসলামকে যুগের দাজ্জালের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গোলা বারুদ হাতে তুলে নিয়েছেন। সকলের উদ্দেশ্য নিজেদের জায়গায় ঠিক।

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক জয়ন্ত সিংহ লিখেছেন, "আল কায়দার সন্ত্রাস এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিংসবাদী ধারার সন্ত্রাসের আসমান জমিন পার্থক্য রয়েছে। ...... ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিংসবাদী ধারা - অর্থাৎ এইসব বিপ্লবী সমিতিগুলি যে সন্ত্রাস প্রয়োগ করেছে তাই-ই একমাত্র মাধ্যম ছিল না। আগাগোড়া এরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়াকেই মুখ্য মনে করেন নি। তাই এরা সন্ত্রাসবাদী সংজ্ঞায় অভিহিত হন না। যদিও এই লেখক মনে করেন চাপেকর ভাইদের এক ইংরেজকে হত্যা মাওবাদীদের কোনও পুলিশকে হত্যা অথবা ধানুর রাজীব গান্ধীকে হত্যা - তিনটি কাজের মধ্যে চরিত্রগত কোনও পার্থক্য নেই। তিনটিই ব্যাক্তি হত্যার লাইন। আল কায়েদার দৃষ্টান্ত এখানে আসে না। কারণ ওরা ব্যাক্তি হত্যা করে না। গণহত্যা করে ত্রাস ছড়ায়।" (সন্ত্রাস এত বাড়ছে কেন, পৃষ্ঠা - ৮১)

এখানে একটা কারণে শ্রী জয়ন্ত বাবুর কথা মেনে নিয়ে আল কায়দা গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসবাদের কাঠগড়ায় খাড়া করা যায় না। কারণ আজ পর্যন্ত আল কায়দা গণহত্যা চালিয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টম্বর যে আল কায়দা তথা শায়খ ওসামা বিন লাদেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করেনি তা এর আগে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। অপরদিকে শায়খ ওসামা বিন লাদেন নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচা করে আফগান জিহাদে অংশগ্রহন করে সেখান থেকে রাশিয়ান সৈন্যদের পরাজিত করে আফগানিস্থানকে স্বাধীনতার মুখ দেখান, ফিলিপাইনের জিহাদে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, ইয়ামেনের জিহাদে সাহায্য করেন। আর রইল ব্যাক্তি হত্যা যখন ওসামা আফগানিস্থানের জিহাদের ছিলেন তখন তাঁর পয়সায় কেনা বন্দুকে আফগান মুজাহিদরা রাশিয়ার সৈন্যের বুকে গুলি চালিয়েছে। এটা কি কম বড় কথা ? আর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের জিহাদ তো আফগানিস্থান স্বাধীন করার জন্য এবং আফগানিস্থানে ইসলামী হুকুমত বা শাসনতন্ত্র কায়েম করার জন্য। তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজকের যুগের মুজাহিদদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ? একটা সময় ছিল যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করত। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আজ শায়খ ওসামা বিন

লাদেন, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ, ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরী, আনওয়ার আলাওয়াকী প্রভৃতিদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে। তবে আমি আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের লোকেদের একটি কথায় বলব যে যারা আজকে মুজাহিদ গোষ্ঠীগুলিকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরী।

ইসলামে আত্মঘাতী বোমার বিধান

আত্মঘাতী বোমা (Suicide Bombings) হল নিজের শরীরে গ্রেনেড বেঁধে কোন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকেসহ শত শত মানুষকে হত্যা করা। আমরা এখানে দেখব ইসলামে আত্মঘাতী ব্যাবহার করা জায়েয কি না? এই আত্মঘাতী বোমার ব্যাপারে আসল ফতোয়া হল, প্রয়োজনের খাতিরে আত্মঘাতী বোমা (Suicide Bombings) ব্যাবহার করা জায়েয। প্রয়োজনটা হল, নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য বা ইসলাম বিপন্ন হলে যখন দেখা যাবে যে সরাসরি যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা সম্ভব হচ্ছে না তখন আত্মঘাতী বোমা ব্যাবহার করে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে নিজের শরীরে গ্রেনেড বেঁধে প্রবেশ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একসঙ্গে শত শত শত্রু সৈন্যদের হত্যা ফলে শত্রুপক্ষ পরাজিত করা সম্ভব হয়। কেননা যাঁরা যোদ্ধা হন তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পান না। আর অনেক সময় দেখা যায় যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের একটাও সৈন্য মরে না অথচ সংগ্রামীদের লোক মারা যায় বা শত্রুপক্ষ এক দুইজন মারা গেলেও সংগ্রামীদের অধিকসংখ্যক লোক মারা যায় ফলে আসল উদ্দেশ্যই পন্ড হয়ে যায়। যদি শরীরে আত্মঘাতী বোমা বেঁধে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় তাহলে এক সঙ্গে শত শত শত্রুর প্রাণনাশ করা সম্ভব। যুদ্ধ করতে গেলে শত্রুপক্ষ যে মারা যাবে সেটা অবশ্যম্ভাবী নয় কিন্তু আত্মঘাতী বোমাতে তা সম্ভব। সেইজন্য কিছু ক্ষেত্রে এইসব আত্মঘাতী বোমা (Suicide Bombings) ব্যাবহার করা জায়েয। যেমন প্রমোদ মুথালিক হিন্দুদের শ্রীরাম সেনারও প্রাধান। তিনি দাবী করেন তাঁর আত্মঘাতী সংগঠনে এই পর্যন্ত ১১৩২ জন হিন্দ নওজোয়ান আত্মঘাতী বোমা হিসাবে ভর্তী হয়েছে। শ্রীরাম সেনার আত্মঘাতী সংগঠনের এই বোমারুদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য (Brain Washing) ম্যাঙ্গালোর, বেলগাঁও এবং সাম্মোগার মধ্যে গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প লাগানো হয়েছে। (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮) যখন আফগানিস্থানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয় তখন বালুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় আফগান মুজাহিদীনদের গেরিলা যুদ্ধ ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। আফাগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন আফগান মুজাহিদীনগণ যুদ্ধ করেছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ একজন সেনা প্রধান হিসাবে মুজাহিদীন বাহিনীকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ করেতে হয়। যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমেরিকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে মুজাহিদীন বাহিনীকে সাহায্য করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা অফিসাররাও শরিক হন। মুজাহিদীন গেরিলাগণ আফগানিস্তানের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন সোভিয়েত কামিউনিষ্ট বাহিনীদেরকে খতম করার জন্য। ছোট ছোট গ্রুপে তাঁরা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যান। চলতে থাকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা। মুজাহিদীন গেরিলাদের ছোঁড়া গ্রেনেডে ধ্বংস হতে থাকে অপ্রস্তুত সোভিয়েত সেনাদের ক্যাম্প, কনভয়। আফগান মুজাহিদদের আত্মঘাতী বাহিনী

আচমকা সোভিয়েত সেনাদের ঘাঁটিতে ঝাপিয়ে পড়েন । একজন আফগান গেরিলা নিজেদের তলপেটে টাইম বোমা বেঁধে সোভিয়েত বাহিনীর কনভয়ের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাতাধিক রুশ সেনাকে মৃত্যুর ওপারে পাঠিয়ে দেন । এই গেরিলা আক্রমনের ফলে রুশ সেনাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে । আর আফগান মুজাহিদীনদের গ্রামের পর গ্রাম দখলে চলে আসে । সুতরাং আফগানিস্থানের মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আত্মঘাতী বোমা (Suicide Bombings) ব্যাবহার করা প্রয়োজন ছিল তা না হলে তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না । এইসব ক্ষেত্রে আত্মঘাতী বোমা ব্যাবহার করা জায়েয । তবে রাজনৈতিক প্রয়োজনের জন্য বা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য আত্মঘাতী বোমা ব্যাবহার করা জায়েয হবে না । কেননা এই ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং এই আত্মঘাতী বোমা (Suicide Bombings) ব্যাবহার করার ফলে শত শত নিরীহ মানুষ মারা যায় ।

বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সন্ত্রাসবাদীরা দেশের কোন রেলওয়ে ষ্টশনে, এয়ারপোর্টে, শপিং মলে বা যে কোন জনসমাগন স্থানে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত শত নিরীহ মানুষ হত্যা করে । এটা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম কেননা এই ক্ষেত্রে যারা মারা যায় তারা কেউ কোন অপরাধের অপরাধী থাকে না এবং এতে শিশু, নারী, বৃদ্ধ মানুষরাও মারা যায় । আর ইসলামের যুদ্ধেক্ষেত্রে শিশু, নারী, বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে জনসমাগম স্থানে এদেরকে হত্যা করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? ইসলামে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হারাম । আর অশান্তি সৃষ্টি বা ফিৎনা করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদ্বি ইন্নাল্লাহা লা ইউ হিব্বুল মুফসীদিন ।” অর্থাৎ “তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে না কেননা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না ।” তাহলে জনসমাগমে আত্মঘাতী বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? আল্লাহ আমাদের এই অশান্তি থেকে হেফাজত করুন ।

সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলেছিল কে ?

সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলেছিল নিজেকে খোদা হিসাবে দাবীদার বেইমান শয়তান মিশরের স্বৈরাচারী বাদশাহ ফিরআন । সে হযরত মুসা (আঃ) সন্ত্রাসবাদী বলেছিল কেননা হযরত মুসা (আঃ) ফিরআনকে খোদা হিসাবে মান্য করেন নি । তিনি মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন । যেমন মহান আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন, “অতঃপর মুসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌছাল; তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ । কাফেরদের চক্রান্ত ব্যার্থই হয়েছে । ফিরআন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে ! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি বরবে ।” (কুরআন শরীফ, সুরা মুমিন, আয়াত ২৫-২৬)

সুতরাং মুসলমানদেরকে সর্বপ্রথম সন্ত্রাসবাদী বলেছিল মিশরের কুখ্যাত স্বৈরাচারী বাদশাহ ফিরআন । কারণ হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য এবং বাদশাহ ফিরআনের মিথ্যা খোদাই দাবীকে চুর্ণ করার জন্য বাদশাহর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেছিলেন । আর এদিকে দেখা যায় যেসব মর্দে মুজাহিদ স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেন সেইসব মুজাহিদদেকেও সন্ত্রাসবাদী বা 'জঙ্গি' বলে গালিগালাজ করা হয় । আজকের যুগে শায়খ ওসামা বিন লাদেন, ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরী, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ প্রভৃতিরা আমেরিকার স্বৈরাচারকে মেনে নেন নি এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করার জন্য তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে । অর্থাৎ যে বুলি সর্বপ্রথম ফিরআন হযরত মুসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে আওড়িয়েছিল সেই বুলি আজ আমেরিকা ও তার পোষ্যপুত্ররা আওড়াচ্ছে এবং মুজাহিদীনদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে গালিগালাজ করছে । হযরত মুসা (আঃ) এর জামানায় ফিরআন তো কেবলমাত্র পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা কারার নির্দেশ দিয়েছিল এবং কন্যাসন্তানদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু আজকের যুগের ফিরআনরা কোন শিশু সন্তানকে মুক্তি দেয়না তারা নির্বিচারে টন টন বোমা ফেলে শিশুদেরকেও হত্যা করে । এই যুগের ফিরআন বুশ যে ইরাকে ৫০,০০০ শিশু হত্যা করেছে এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আজকের যুগের ফিরআনরা তো আসল ফিরআনের থেকে বেশী ভয়ঙ্কর । আফগান যুদ্ধের সময় ২০০১ সালে এই আমেরিকা ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে হত্যা করে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা কম বড় ফিরআন নয় । যারা শায়খ ওসামা বিন লাদেন, ড. শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরী, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ প্রভৃতি মুজাহিদীনদেরকে যার সন্ত্রাসবাদী বলে তারা মিশরের স্বৈরাচারী বাদশাহ ফিরআনের উত্তরসূরী । আর আমাদের দেশের যারা বুশের বাচ্চা বুশকে সমর্থন করে তারা আবু জেহেল ও আবু লাহাবের উত্তরসূরী ।

কাশ্মীরকে আযাদ করা হোক

কাশ্মীরকে বলা হয় 'সুইটজারল্যান্ড অফ দ্য ইস্ট' । বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়ে বলেছিলেন, "কাশ্মীর হল প্যারাডাইস অফ ইন্ডিটা ।" অর্থাৎ ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীর । কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য সবাইকে মুগ্ধ করে । বিখ্যাত পন্ডিত কলহন 'রাজতরঙ্গিনী'র ভূমিকায় লিখেছেন, "কাশ্মীর এমন এক দেশ যেখানে সূর্যের আলো মোহময় এবং নরম । উঁচু পাহাড়ের চুড়ায় ? এমন জ্ঞানভান্ডার, গেরুয়া রঙের বরফঠান্ডা জল আর রসালো আঙুর যেগুলি স্বর্গেও বিরল, এখানে তো সর্বত্র পাওয়া যায় ।" সেই কাশ্মীরে আজ সর্বত্র বারুদের গন্ধ । কোথায় মুজাহিদদের গুলির আওয়াজ আবার কোথাও ভারতীয় মিলিটারীদের গুলির আওয়াজ । আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীর যেন জাহান্নামের আগুনে পরিণত হয়ে গেছে । কেন ? এর পিছনেও রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের চক্রান্ত ।

ভারত যখন ভাগ হয়েছিল তখন হিন্দু মুসলিমের ধর্মের ভিত্তিতেই ভাগ হয়েছিল । কিন্তু কাশ্মীরে ৭৫ শতাংস মুসমান থাকা সত্বেও কেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হল ? কারণ ইংরেজরা চেয়েছিল কাশ্মীরের কিছুটা অংশ পাকিস্তানে চলে যাক আর কিছুটা অংশ ভারতে

থেকে যাক । ফলে এক তৃতিয়াংশ কাশ্মীর পাকিস্তানের অধীনে চলে যায় এবং বাকিটা ভারতের অধীনা থাকুক যাতে ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ চিরদিন জিইয়ে থাকে । ভারত যখন ভাগ হয় তখন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং । দেশ ভাগ হবার সময় কাশ্মীরের সব রাজারা দলে দলে কেও পাকিস্তানে কেও ভারতে যোগ দেন কিন্তু রাজা হরি সিং পাকিস্তানে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন কারন তিনি বুঝতে পারেন এতে তাঁর লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হবে । এর আগে রাজা হরি সিংকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, ‘‘রাজারা সবাই একে একে ভারতে অথবা পাকিস্তানের যোগ দিচ্ছে । আপনি কি করবেন ? আমার মনে হয়, আপনার উচিৎ পাকিস্তানে যোগ দেওয়া ।’’ সেদিন রাজা হরি সিং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । দ্বিতীয়বার লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহারাজা হরি সিংকে এই কথা মনে করিয়ে দেবার সময় হরি সিং আর হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন নি । তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছিলেন কারণ তিনি বিচক্ষণ জানতেন যে কাশ্মীর মুসলিম প্রধান এলাকা । তাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না ।

১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর হঠাৎ একদিন রাতে সশস্ত্র সেনা পাঠিয়ে পাকিস্তান কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে নেয় এবং মেজর জেনারেল আকবর খানের নেতৃত্বে্যে পাক সেনারা সহজেই মহারাজা হরি সিংয়ের সেনাদের কব্জা করে ফেলে । এরপর পাক সেনারা শ্রীনগরে ঢুকে পাকিস্তানের পতাকা উঁচিয়ে দিল । তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ পাকিস্তানের দখলকৃত কাশ্মীর পুনরায় দখল করার জন্য মাত্র ২৪ ঘন্টার সময় চেয়েছিল কিন্তু নেহরু বলেছিলেন, ‘‘আপনি নির্দেশ দিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাক সেনাদের তাড়িয়ে উল্টো পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করে নেব ।’’ কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে পাকিস্তানের দ্বারা অধিকৃত কাশ্মীরকে পুনরায় দখল করতে বাধা দিলেন । নেহরুও অসহায় হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন । এদিকে হরি সিং অসহায় হয়ে ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য অবেদন করছিলেন । এরপর ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর তৎকালীন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে কাশ্মীরকে ভারতের অধীনে করে নেন । এদিকে ২৭শে অক্টোবর ভোরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগর দখল করার জন্য অভিযান চালায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীদের প্রতিঘাতে পাক সেনারা পালিয়ে যায় । এরপর ভাতরতীয় সেনারা বারমুলা দখল করে নিয়ে পুরো কাশ্মীর দখলের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে তা অধিগ্রহণ করতে বাধা দিলেন । নেহরুও বিভ্রান্ত হয়ে সেনাদের আর এগোতে নিষেধ করলেন । ফলে জম্মু-কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের দখলে রয়ে গেল এবং বাকিটা ভারতের অধিনে রয়ে গেল । এই এক তৃতীয়াংশ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের লোকেরা বলে ‘আযাদ কাশ্মীর’ ।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্যনীয় যে সেদিন যদি লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে পুরো কাশ্মীর দখল করতে বাধা না দিতন তাহলে পুরো কাশ্মীর ভারতের অধীনে চলে আসতো । কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন তথা ব্রিটিশরা চেয়েছিলেন কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটা দ্বন্দ যাতে চিরদিন জিইয়ে থাকে । আর হলও তাই ।

এর পরে পন্ডিত নেহেরু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে আর সেনা অভিযান না চালিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রসংঘকে নালিশ জানালেন । ফলে বিষয়টি আর দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না বিষয়টি তখন আন্তর্জাতিক হয়ে গেল । এর আগে গান্ধীজি পন্ডিত নেহরুকে বলেছিলেন "Don't accept Mountbatan. We should kick out the occupiers from the Kashmir" কিন্তু নেহরু তা মানতে অস্বীকার করেন এবং রাষ্ট্রসংঘের কাছে নালিশ জানালেন । এই আবেদনের ফলে রাষ্ট্রসংঘ কমিশন গড়ল এবং সেই কমিশন যুক্তি দিল, কাশ্মীরের অধীকাংশ লোকই মুসলমান । তাই এই ভূখন্ড পাকিস্তানেই যাওয়া উচিৎ । কিন্তু নেহরু সেটা আর মানলেন না তিনি তিনি রাষ্ট্রসংঘ ও ব্রিটেনের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বোন মস্কোর দুত বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতকে ১৯৪৮ সালের এক চিঠিতে লিখলেন, "The United State end great Britain have played a dirty role, the Great Britain probably being the chief actor behind the sins." রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করে এবং যৌথ সরকার গঠনন করার প্রস্তাব দেয় । ব্রিটিশ অফিসাররা কাশ্মীরে হানা দেওয়ার জন্য মদদ করতে থাকেন । এবং পরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় । এরপর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তাপরিষদ বলে, কাশ্মীরে এখন যুদ্ধবিরতি হবে, কাশ্মীর থেকে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশ সেনা সরিয়ে নেবে তারপর গণভোট হবে । পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি নিয়ে গণভোটে রাজি হয়ে যায় কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু গণভোটে রাজী হন নি । তিনি বলেন ১৯৫২ সালে বলেন, "কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ।" কারণ তিনি জানতেন গণভোট হলে কাশ্মীর পাকিস্তানের অধীনেই চলে যাবে । ভারত থেকে ভূস্বর্গ হাতছাড়া হয়ে যাবে । তাই তিনি এমন ব্যাবস্থা করেন যাতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী যখন ভারতের সংবিধান রচনা করা হয় তখন থেকেই সেই সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কাশ্মীরকে এমন কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যা এখনও কাশ্মীরিরা ভোগ করতে থাকে । অর্থাৎ সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে কাশ্মীরি জনগণকে ভারতের দিকে টেনে আনা হয় ।

এখানে আমার বক্তব্য হল, পন্ডিত নেহেরু নিজেই কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পন করেন যখন রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অধিকার বলে ঘোষনা করলেন তখন নেহেরু তা মানতে অস্বীকার করলেন কেন ? যদি রাষ্ট্রসংঘের আদেশ না মানাই তাঁর নীতি ছিল তাহলে এই সমস্যাকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পন করে ব্যাপারটিকে আন্তর্জাতিক বানাতে গেলেন কেন ? এতে কি আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমুর্তী ক্ষুন্ন হল না ? পরে যখন রাষ্ট্রসংঘ থেকে বলা হল কাশ্মীরে গণভোট হবে, সেই যুক্তিও কেন নেহেরু মেনে নেন নি ? যদি মেনে নিতেন তাহলে এত দিনের কাশ্মীর সমস্যা হয়তো মিটে যেত । আমি এখানে পাকিস্তানের স্বপক্ষে কোন বক্তব্য পেশ করছিনা । যুক্তি পূর্ণ কথা হল, যদি গণভোট হত তাহলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যেত ?

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে এখানে বক্তব্য হল, কাশ্মীরে গণভোট হোক । এখানে তিনটি ব্যাপারে ভোট হওয়া উচিৎ । (১) কাশ্মীর ভারতের অধীনে থাকবে, (২) কাশ্মীর পাকিস্তানের অধীনে থাকবে এবং (৩) কাশ্মীর একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে । এই তিনটি বিষয়ে কাশ্মীরে গণভোট হওয়া উচিৎ । কাশ্মীর জনগণ যদি

ভারতের পক্ষে বেশি ভোট দেয় তাহলে কাশ্মীর ভারতের অধীনে থাকবে আর যে কাশ্মীরের অংশ পাকিস্তানের অধীনে আছে তা পাকিস্তানকে ভারতকে ছেড়ে দিতে হবে, যদি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় তাহলে কাশ্মীর পাকিস্তানের অধীনে চলে যাবে আর কশ্মীরের যে অংশ ভারতের অধীনে আছে তা ভারতকে পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি গণভোটে দেখা যায় যে কাশ্মীরি জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কাশ্মীরকে দেখতে চায়ছেন তাহলে পাকিস্তানে অধীকৃত কাশ্মীর পাকিস্তান ছেড়ে দিবে, ভারতের অধীকৃত কাশ্মীর ভারত ছেড়ে দিবে । এই দুই কাশ্মীর নিয়ে গঠিত হবে স্বাধীন কাশ্মীর দেশ । তাহলেই কাশ্মীর সমাস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা ।

তবে আমার কাছে অধীক যুক্তিযুক্ত মতামত হল, কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত করা হোক এবং পাকিস্তানও নিজের অংশ ছেড়ে দিক এবং ভারতও নিজের অংশ ছেড়ে দিক । তাহলেই কাশ্মীর আযাদের আন্দোলন বন্ধ হবে । কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলাও বন্ধ হয়ে যাবে । এই ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশ মিলে যারা কাশ্মীরকে আযাদ করার আন্দোলন করছেন তাদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে । কিন্তু কথা হল উদ্যোগটা নেবে কে ? দুই দেশের রাজনৈতিক নেতারাই তো কাশ্মীরকে নিয়ে রাজনীতির জঘন্য খেলায় মাতোয়ারা ।

পরিশিষ্ট : ১

পুর্বপুরুষের ঘরে প্রত্যাবর্তন

ভারতের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ । আর. এস. এস ও বজরঙ্গ দলের লোকেরা জোর জবরদস্তি করে ১০০ টি মুসলিম পরিবারকে হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করেছিল । কিন্তু আল্লাহর রহমত যে তারা আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে । তারা স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেনি । হিন্দুত্ববাদীদের তরবারীর ভয়ে তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল । কিন্তু ইসলামে জোর জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম ধর্মে রুপান্তরিত করা হারাম এবং প্রাণের ভয়ে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না কেননা তার অন্তরে ইমান থাকবে না । আর আল্লাহ বলেছেন, 'লা-ইক রাহা ফিদ্দিন' অর্থাৎ ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই । ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । যেমন মানবেন্দ্র নাথ রায় বলেছেন, "এক আল্লাহর একনিষ্ঠ সেবকদের কাছে জরথ্রুস্টের প্রাচীন ধর্ম আর তার 'ভালো' 'মন্দের' চিরন্তন সংঘর্ষমূলক মারাত্মক দৈত্যনীতি বিশেষ অপ্রীতিকর ছিলো । তবুও বিজয়ী আরবদের সহনসীলতা থেকে উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী পারসীরা একেবারে বঞ্চিত হয়নি । হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতেও সাধারণ মসজিদের পাশে অগ্নি দেবতার প্রাচীন মন্দির জাঁকজমকের সঙ্গেই সোভা পেয়ে এসেছে । ইসলামের তলোয়ারের আক্রমণে প্রাচীন ধর্ম - বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির চুড়া ধ্বংস হয়নি । ধ্বংস ও অবলুপ্তি হয়েছিল তার পুজারী ও উপাসকদের মন্দির ত্যাগের দরুনই । টাইগ্রিস থেকে ওক্রাস পর্যন্ত এই বিশাল ভূখন্ডের অধীবাসি পারসীরা যে বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় যেভাবে তাদের আবহমানকালের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে এই

বিজয়ীদের (মুসলমানদের) ধর্ম গ্রহণ করেছে, কোন রকমের বলপ্রয়োগের দ্বারা তা সম্ভবপর হতো না ।”

মানবেন্দ্রনাথ রায় আরও বলেছেন, “আরবের উন্নতি এবং প্রসার একমাত্র তলোয়ারের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল - এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত । তরবারী একটা জাতীয় জীবনে স্বীকৃত মতবাদ হয়তো বদলে দিতে পারে কিন্তু একথা খুবই সত্য, তা কোনদিনই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না ।”

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর পুস্তকে আরও বলেছেন, “সকল কালের যুগান্ত প্রবাহিত ধর্মের মানদন্ডে বিচার করলে দেখা যাবে, যারা সেই যুগসঙ্কটে ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাই ছিল সবার চেয়ে বড় ধার্মিক ।” (Historical Role of Islam. By M. N. Roy)

সুতরাং ইসলামের প্রসার জোর জবরদস্তিতে হয়নি । জোর জবরদস্তি করে ইসলামের প্রসার হলে নতুন মুসলমান সবচেয়ে বড় ধার্মিক হতেন না । (বিস্তারিত জানতে পড়ুন মৎপ্রণীত ‘ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ?’)

অপরদিকে আর. এস. এস ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করাকে নাম দিয়েছে ‘পুরখো কী ঘর বাপসি’ (পুরখো কি ঘর ওয়াপসী) অর্থাৎ ‘পূর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তন’ । অথচ এই হিন্দুত্ববাদী নেতা মোহন ভাগবত, প্রবীন তেগড়িয়া প্রভৃতিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক ধর্মের এই ঠিকাদারদের ঘরের মহিলাদের কেন মুসলমান পুরুষদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় ? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংহল নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টী) নেতা মুখতার আব্বাস নাকবীর সাথে, বজেপি নেতা মুরলী মনোহর যোশীর মেয়ের বিবাহ হয়েছে বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হুসাইনের সাথে । নরেন্দ্র মোদীর ভাইঝির বিবাহ হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে, লাল কৃষ্ণ আদবানীর ভাইঝি এবং মেয়ে দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে, এমনকি লালকৃষ্ণ আদবানী তাদেরকে বিয়েতে আশির্বাদও করেন । জনতা দলের প্রেসিডেন্ট সুভ্রমনিয়াম স্বামীর কন্যা সুহাসিনীর বিবাহও হয়েছে মুসলমান পুরুষের সাথে এবং বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । শিবশেনার নেতা প্রয়াত বাল ঠাকরের পুতির (Grand Daughter) নেহা গুপ্তের (বয়স ২৫) বিবাহ হয়েছে মুহাম্মাদ নবী নামক (বয়স ২৭) মুসলমান পুরুষের সাথে, তিনি মুহাম্মাদ নবীর সঙ্গে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । নেহা গুপ্তে হলেন বাল ঠাকরের বড় ছেলে প্রয়াত বিন্দুমাধবের মেয়ে । মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিষ উদগীরণকারী বিশ্ব হিন্দ পরিষদের নেতা প্রবীন তেগড়িয়া বোনের বিবাহ হয়েছে ধ্বনী ব্যাবসায়িক মুসলমান যুবকের সাথে এবং প্রবীন তেগড়িয়া আজও নিজের বোনের সাথে মধুর সম্পর্ক রাখেন ।

এইসব ধর্মের ঠিকাদারদের মুসলমান জামাই এতো পছন্দ কেন ? এখন আমি এই হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীদের বলবো যারা ‘পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তনে’র আন্দোলনে নেমেছেন

তাঁরা আগে নিজেদের কন্যা, বোন, ভাইঝি এবং পুতিনদেরকে 'পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তন' করুন তারপর অন্যান্যদের করবেন ।

এছাড়াও অভিনেত্রী অমৃতা সিং ফিল্ম অভিনেতা সেইফ আলী খানকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও অমৃতা মুসলমানই আছেন । তাঁর শাশুড়ি শর্মিলা ঠাকুরও সাইফের পিতা পতৌদি নবাবকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান এবং বিবাহের পর তাঁর ইসলামী নাম হয় আয়েশা সুলতানা । সাইফ আলি খান দ্বিতীয় বিবাহ করেন রাজ কাপুরের পুতি কারীনা কাপুরকে । করীনাও সাইফকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শিলা দিক্ষিতের কন্যা মুসলমান ছেলেকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে যান । বলিউড অভিনেত্রী রীনা রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানী ক্রিকেটার মোহসীন খানকে বিবাহ করেন । অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নী এবং তাঁর স্বামী ভিকি গোস্বামী উভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । অভিনেতা নাসীরুদ্দীন শাহ বিবাহ করেন রত্না পাঠক নামক হিন্দু রমনীকে, রত্না নাসীরুদ্দীন শাহকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । অভিনেতা শাহরুখ খান ও আমির খানও হিন্দু রমনীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের স্ত্রীরা মুসলমান হয়ে যান । অভিনেতা সলমন খানের পিতা সেলিম খানও হিন্দু রমনীকে বিবাহ করেন । অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ও অভিনেত্রী হেমা মালিনীও একে অপরকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । এর আগে ধর্মেন্দ্র বিবাহ করেছিলেন প্রকাশ কৌর নামক রমনীকে । ধর্মেন্দ্র হেমা মালিনীকে ২১ আগষ্ট ১৯৭৯ সালে ইসলামীক মিয়মানুযায়ী বিবাহ করেন । তাঁদের বিবাহের দেনমোহর ছিল ১১১,০০০ টাকা । ধর্মেন্দ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর ইসলামী নাম হয় দেলাওয়ার খান এবং হেমা মালিনীর ইসলামী নাম হয় আয়েশা বি. আর. চক্রবর্তী । তাঁদের বিবাহ পড়ান মাওলানা কাজি আবু তালহা ফায়সালাবাদী । বিখ্যাত গায়ক কিশোর কুমার অভিনেত্রী মধুবালাকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । অভিনেতা পঙ্কজ কাপুর একজন বিখ্যাত ফিল্ম অভিনেতা এবং ফিল্ম নির্মাতা তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নীলিমা আযীম নামক মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেন । তাঁদেরই পুত্র হলেন অভিনেতা শাহিদ কাপুর । তিনিও মুসলমান । বিখ্যাত ক্যারিওগ্রাফার সরোজ খান ছিলেন একজন সিন্ধী হিন্দু তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । তাহলে সংঘ পরিবারসহ আর. এস. এস, বজরং দলের ধ্বজাধারীরা কেন উপরিউক্ত ব্যাক্তি কাছে গিয়ে তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করছে না ? কেন তাদেরকে 'পুর্বপুরুষদের ঘরে প্রত্যাবর্তনে'র আমন্ত্রন জানাচ্ছে না ? কারণ তারা জানে যে শিক্ষিত ব্যাক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের মহিমা জেনেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । তাদেরকে বোকা বানানো যাবে না । আর আগ্রার যেসব মানুষকে তারা ক্ষনিকের হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত করেছিল তারা মুর্খ খেটে খাওয়া মানুষ । তারা ধর্মের কিছুই বোঝে না । তাদের একদিন কাজ না করলে চুলোতে হাঁড়ি চাপে না এবং খেতে পায় না । তাদেরকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড প্রভৃতি তৈরী করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলে দেশ থেকে তেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে জোর করে হিন্দু বানানো হয় । কিন্তু এই ধর্মের ধ্বজাধারীরা বলিউড অভিনেতা - অভিনেত্রীদের কাছে গিয়ে ও যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবিদের কাছে যায় না । কারণ তারা জানে শিক্ষিত ব্যাক্তিদের কাছে গেলে তাদের কোন কাজই হবে না । আর সব থেকে বড় কথা হল যারা 'পুর্বপুরুষদের ঘরে

প্রত্যাবর্তনে'র নাম করে মুসলামানদেরকে হিন্দু বানাতে চাইছে তাদের ঘরের মেয়েগুলোর স্বামীগুলোই মুসলমান । আগে নিজেদের মেয়ে জামাইগুলোকে 'ঘরে প্রত্যাবর্তন' করুক তারপর অন্যদেরকে করবে ।

কিছুদিন আগে হিন্দুত্ববাদীরা ঘোষনা করেছে যে ভারতে হিন্দু ছাড়া আর অন্যদের থাকার কোন অধীকার নেই । ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্রে রুপান্তরিত করা হবে । এ এক বিরাট ষড়যন্ত্র । এই ষড়যন্ত্রের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন হেগড়েওয়ার আর. এস. এস. নামক হিন্দু জঙ্গি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে । হেগড়েওয়ার এর অনুসারী এম. এস. গোলওয়ালকার তৎকালীন যুগে বলেছিলেন ঃ ''কঠোর প্রাচীন জাতিসমূহের অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমোদিত এই অবস্থান থেকে, হিন্দুস্থানে বসবাসকারী অ-হিন্দু জনগণ, অবশ্যই, হয়, হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাষা গ্রহণ করবে, অবশ্যই হিন্দু ধর্মকে সম্মান ও সমীহ করতে শিখবে, অবশ্যই হিন্দুজাতির মহিমান্বিত রুপ ছাড়া অন্য কোন ভাবনা মনে লালন করবে না অর্থাৎ এই দেশ ও তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তারা তাদের অসহিষ্ণুতার এবং অকৃজ্ঞতার মনোভাব কেবলই বর্জনই করবে না, উপরন্তু প্রেম ও ভক্তির সদর্থক মনোভাব কর্ষণ করবে; এক কথায় তারা আর বিদেশি থাকবে না, নতুন হিন্দুজাতির সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে এদেশে থাকবে কোন কিছুর দাবী না - করে, কোন সুযোগ - সুবিধা, বাড়তি আদর - আপ্যায়ন তো নয়ই, এমনকি নাগরিক অধিকারও চাইতে পারবে না ।'' (We and aur Nationhood Defined)

এমনকি গোলওয়ালকার তাঁর বইটিতে হিটলার কর্তৃক জার্মান জাতির ইহুদি বিতাড়নের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং এই আকাঙ্খা পোষন করেন যে হিন্দু জাতিরও উচিৎ একইভাবে মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের বিতাড়িত করা ।

পাঠকগণ ভেবে দেখুন ! আগে থেকেই কিরকম মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে । আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বর্তমানে বিজেপি সরকার । সেজন্য বিজেপির বর্তমান এমপি রাজেশ্বর সিং বলেই দিয়েছেন, ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত মুসলমান ও খ্রীষ্টানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে বা ধর্মান্তরিত করে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানো হবে ।

আমি বলি, রাজেশ্বর সিংয়ের মতো নেতারা মুসলমানদের উপর হাত তুলবে আর মুসলমানরা তাদেরকে তোয়াজ করবে ?

আমি বলি, রাজেশ্বর সিংয়ের মতো নেতারা মুসলমানদের উপর হাত তুলবে আর মুসলমানরা তাদেরকে তোয়াজ করবে ? আর যদি মুসলমানরা দেশ থেকে হিজরত করেই থাকে বা তাদেরকে বিতাড়িত করা হয় তাহলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরী করা ভাস্কার্য, শিল্প, স্থাপত্য বা তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা প্রভৃতি এই দেশ থেকে নিয়েই বিদায় হব । কারণ ওগুলো আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি । আর এসব নিয়ে পালালে ভারতে পড়ে

থাকবে শুধু অজন্ত - ইলোরার নগ্ন নারী মুর্তীগুলো । সেগুলো দেখে কামাশক্ত হয়ে হিন্দুত্ববাদীদের হস্ত - মৈথুন ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না ।

পরিশিষ্ট : ২

ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা

বর্তমানে ভারতে কথায় কথায় মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয় । কোথাও বোমা বিস্ফোরণ হলে প্রথমে মুসলমানদের পাকড়াও করা হয় । পরে যখন প্রমাণ হয় যে এই বিস্ফোরণ মুসলমানরা ঘটায়নি তখন কিন্তু আর মুসলমানদেরকে ছাড়া হয় না । তাদেরকে জেলের মধ্যেই পচানো হয় ।

কছুদিন আগের কথা, আজমল আমীর কাসাবকে ফাঁসি দেওয়া হল মুম্বাইয়ে ২৬/১১ এর হামলার জন্য । অথচ কাসাব সেই হামলায় দায়ী ছিল না । তাকে ষড়যন্ত্র করে হিন্দুত্ববাদীরা আই. বি-র সহযোগিতায় ফাঁসিয়ে দেয় । তার ফাঁসি হয়ে গেল । কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি কাসাবের বিচার হয়ে গেল ? মাত্র চার বছরের মধ্যে কাসাবের বিচার হয়ে গেল এবং তার ফাঁসিও হয়ে গেল । ভারতের বিচার ব্যবস্থা কি এতই উন্নত হয়ে গেল ? অথচ ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শহীদ করা হয় । এই ২৩ বছরেও বাবরী মসজিদের বিচার সমাপ্ত হল না, কেন ? ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গা হল । এই ১৩ বছরেও মুসলমানরা ন্যায্য বিচার পেলেন না, কেন ? হিন্দুত্ববাদীরা এই দুস্কর্ম করেছে বলে ? অপরদিকে মাত্র চার বছরে কাসাবের বিচারও হয়ে গেল আর ফাঁসিও হয়ে গেল ? কারণ টা কি ? কারণ একটাই কাসাব মুসলমান ছিল বলে তার ফাঁসি হয়েছে । সে যদি নরেন্দ্র মোদি হত তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বাপেরও হিম্মত হতো না তার ফাঁসি দেবার । আইন হিন্দুত্ববাদীদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনা । সেজন্য সোহরাবুদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় বিজেপি নেতা অমিত শাহকে সি. বি. আই. (CBI/Central Investigation Burou) ক্লিন চিট দিয়ে মুক্ত করে দিল । বেচারা সোহরাবুদ্দিন মুসলমান হওয়ার দায়ে তার উপর অবিচার করা হল, তার ন্যায্য বিচারটুকুও হল না । তার হত্যাকারীরা খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য ভারত সরকার দাউদ ইব্রাহীমকে কুকুরের মতো খুঁজছে । দাউদ পাকিস্তানের গিয়ে আশ্রয় গেড়েছে । সন্ত্রাসবাদীদেরকে খুঁজে আইনত শাস্তি দেওয়া ভাল কথা । কিন্তু দাউদের থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী বাল ঠাকরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি ভারতীয় পঙ্গু আইন । দাউদ তো ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, কিন্তু বাল ঠাকরে ? সে তো ১৯৯২ সালে মুম্বাইয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত । তাকে কেন ভারতীয় আইন গ্রেফতার করে জেলে পুরল না ? সে কেন স্বাভাবিকভাবে মারা গেল ? তার কেন ফাঁসি হল না আজমল আমীর কাসাবের মতো ।

সঞ্জয় দত্তও মুম্বাই বিস্ফোরণে দায়ী ছিলেন । তবুও তাঁকে মাত্র কয়েক বছরের জন্য জেল হল শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য, অপরদিকে আফজল গুরুর ফাঁসি হয়ে গেল শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য । আফজল গুরু যদি সঞ্জয় দত্ত হতেন তাহলে তাঁরও কয়েক বছরের জেল হত, আর সঞ্জয় দত্ত যদি আফজল গুরু হতেন তাহলে তাঁর ফাঁসি হয়ে যেত । ভারতীয় সংবিধানে অপরাধীদের ধর্মীয় নামের একটা গুরুত্ব আছে ।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো যে, কোন ভারতীয় মুসলমান আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত আছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেনি । ভারতে যতবার সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে প্রত্যেকবারই তদন্তের পর ধরা পড়েছে হিন্দুত্ববাদীরা । মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ, নানদেড় বিস্ফোরণ, দিল্লী বিস্ফোরণ, আজমিরে বিস্ফোরণ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আর ভারতীয় মুসলমানরা যা কিছু করেছে তা মুসলমানদের উপর অন্যায় অত্যাচার করার পর । মুম্বাই দাঙ্গায় যদি মুসলমানদের হত্যা না করা হত তাহলে মুম্বাই বিস্ফোরণও হতো না । সুতরাং মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো । অথচ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হল না ।

মুম্বাইয়ে দাঙ্গার সময় হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানের রক্ত চুষেও হিন্দুত্ববাদী রাক্ষস সেনাদের তৃষ্ণার্ত মেটেনি । রাবনের উত্তরসূরীরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেও মুসলমানদের দিকে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে রৈ রৈ করে ছুটে ধাওয়া করে আসতে লাগল । এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রফেসার গৌতম রায় লিখেছেন, “সবে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙে এসে আরও অনেক কিছু ভাঙবার জন্য তাদের হাত তখন নিশপিশ করছে । বাল ঠাকরে তাদের মুম্বাইয়ের মুসলিম মহল্লায় লেলিয়ে দিলেন । শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের ভাষায়, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ সেনাপতির মতো (পড়তে হবে, বহু দাঙ্গায় হাত - পাকানো লেঠেল সর্দারের মতো) ঠাকরে তাঁর শিবসৈনিকদের সংখ্যালঘু বিরোধী দাঙ্গায় নিয়োজিত করেন । শিবসেনার মুখপাত্রে তখন রোজ বেরচ্ছে উস্কানীমূলক নানা আহ্বান, ঝাঁপিয়ে পড়ার, কচুকাটা করার, প্রতিশোধ নেবার ডাক । কীসের প্রতিশোধ ? বাবরী ভাঙার বয় নিশ্চয় । এটা তো মুসলিমদের নেবার কথা । বাবরী ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী মুসলিম দাঙ্গাবাজদের ‘আল্লাহো আকবর’ বলে কোষমুক্ত তরবারী হাতে বেরিয়ে পড়তে দেখা গেল কই ? বরং মুসলিমরা এমন গুটিয়ে রইলেন এবং শিবসৈনিক, বজরঙ দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দিকে দিকে হর হর মহাদেব বলে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন বাবরী ধ্বংসের অপরাধও মুসলিমদের ।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২.৮.১৯৯৮)

সুতরাং ভারতের মুসলমানদের অবস্থা অত্যান্ত শোচনীয় । কোন ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু যদি ইসলামের প্রশাংসা করে কিছু লেখেন তবে তারও রেহাই নেই । যেমন, উপরিউক্ত গৌতম রায় সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছে তাদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আর. এস. এস. ও সংঘ পরিবারের লোকেরা তাঁকে ‘মোল্লা গৌতম’ বা ‘মৌলানা গৌতম’ বলে অভিহিত করেছে । হিন্দুত্ববাদীদের রায়ে বেচারা গৌতমের ‘রায়’ পদবীকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । হিন্দুত্ববাদীদের রায়ে বেচারা গৌতমের ‘রায়’ পদবীকেও

সুতরাং ভারতের মুসলমানদের অবস্থা অত্যান্ত শোচনীয় । কোন ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু যদি ইসলামের প্রশাংসা করে কিছু লেখেন তবে তারও রেহাই নেই । যেমন, উপরিউক্ত গৌতম রায় সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছে তাদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আর. এস. এস. ও সংঘ পরিবারের লোকেরা তাঁকে 'মোল্লা গৌতম' বা 'মৌলানা গৌতম' বলে অভিহিত করেছে । হিন্দুত্ববাদীদের রায়ে বেচারা গৌতমের 'রায়' পদবীকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । হিন্দুত্ববাদীদের রায়ে বেচারা গৌতমের 'রায়' পদবীকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । অথচ গৌতম রায় তাঁর লেখনিতে ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতাকেও তুলোধুনা করেছেন এবং তিনি নিজে একজন কমিউনিষ্ট ভাবধারার লোক ।

ষড়যন্ত্র, চারিদিকে শুধু ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে । বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হল, এইবার হিন্দুত্ববাদীরা ইসলামের অন্যান্য সংস্কৃতিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । বলা হচ্ছে যে, যেখানে তাজমহল রয়েছে সেখানে নাকি পুরোনো শিবমন্দির ছিল । সেই শিব মন্দিরেই নাকি সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন । তাই বাবরী মসজিদের মতো তাজমহলও ভাঙতে হবে । গুঁড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যে প্রথম আশ্চর্যের অধিকারী প্রাচীন নিদর্শন তাজমহলকে । এদের জন্যই প্রফেসার গৌতম রায় লিখেছেন, “যারা প্রচার করে তাজমহল রুপান্তরিত হিন্দু মন্দির, যারা মহাকাব্যের নায়কের 'জন্মস্থান' নিয়ে রক্তাক্ত কাজিয়া করে এবং পি এন ওকের মতো যাদের কেউ কেউ ফোকটে ঐতিহাসিক বনে যায় ।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.১১.১৯৮৭)

পরিশিষ্ট : ৩

কয়েকটি জিহাদী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নামের তালিকা

সংগঠন	প্রকৃতি	নিষিদ্ধ বছর
আবু নিদাল ওরগানাইজেশান (ANO)	জেহাদী	March 2001
আলফা ৬৬ (Alfa 66)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
আবু শাইয়াফ গ্রুপ (ASG)	জেহাদী	March 2001
অ্যানিম্যাল লিবারেশান ফ্রন্ট (ALF)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
আল আকসা মারটায়র্স ব্রিগেড (AAMS)	জেহাদী	-----------
আর্মি অফ গড (AOG)	সন্ত্রাসবাদী	----------
আল সাহাব (AS)	জেহাদী	March 2010
আরিয়ান নেশন (AN)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
আনসার আল ইসলাম (AAI)	জেহাদী	October 2005
ব্ল্যাক লিবারেশান আর্মি (BLA)	সন্ত্রাসবাদী	------------
আর্মি অফ ইসলাম (AOI)	জেহাদী	------------
কোয়ালিশান টু সেভ দি প্রেসার্ভস	সন্ত্রাসবাদী	-----------
আসবাত আল ইসলাম (AAI)	জেহাদী	November 2002

দি কোভেনান্ট দি সোয়ার্ড অ্যান্ড দি আর্ম অফ দি লর্ড (CSA)	সন্ত্রাসবাদী	------------
আউম সিংরিখো (AUM)	সন্ত্রাসবাদী	---------------
ইষ্ট ফার্স্ট (EF)	সন্ত্রাসবাদী	------------
বাস্ক ফাদারল্যান্ড অ্যান্ড লিবার্টি (ETA)	সন্ত্রাসবাদী	-------------
ইষ্ট লিবারেশান ফ্রন্ট (ELF)	সন্ত্রাসবাদী	------------
কমিউনিষ্ট পার্টি অফ দি ফিলিপিন্স (CPOP)	সন্ত্রাসবাদী	-------------
নিউ পিপল আর্মি (CPPA/NPA)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
গ্রিন পিস (GP)	সন্ত্রাসবাদী	------------
কন্টিনিউটি আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি (CIRA)	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
হার্ডেষ্টি অ্যাভেন্জার্স (HA)	সন্ত্রাসবাদী	------------
গামা আল ইসলামিয়া (ISLAMIC GROUP)	জেহাদী	March 2001
জামাআতুল ফুকরা (JF)	জেহাদী	October 2005
হামাস (Islamic Resistance Movement)	জেহাদী	March 2001
জেউইস ডিফেন্স লিগ (JDL)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
হরকাতুল জিহাদ এ ইসলামী বাংলাদেশ (HUJI-B)	জেহাদী	October 2005
ফিনিস প্রিস্টুড (Phineas Priests)	সন্ত্রাসবাদী	------------
হরকতুল মুজাহীদিন (HUM)	জেহাদী	March 2001
সি সিপার্ড কনসার্ভেশান সোসাইটি (SSCS)	সন্ত্রাসবাদী	------------
হিজবুল্লাহ (Party of God)	জেহাদী	July 2008
ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন (IM)	জেহাদী	July 2012
ইসলামিক জিহাদ ইউনিয়ন (IJU)	জেহাদী	July 2005
ইসলামিক মুভমেন্ট অফ উজবেকিস্তান (IMU)	জেহাদী	November 2002
জাইস ই মুহাম্মাদ (JEM/Army of Muhammad))	জেহাদী	October 2005
জামাহ ইসলামিয়া অরগানাইজেশান (JIO)	জেহাদী	November 2002
জুন্দুল্লাহ (Jundullah)	জেহাদী	October 2005
কাতাইব এ হিজবুল্লাহ (KH)	জেহাদী	---------
লস্কর ই তাইয়েবা (LT/Army of the Righteous)	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
লস্কর এ ঝাঙ্গবী (LJ)	জেহাদী	March 2001
লিবারেশান টাইগারর্স অফ তামিল এলিয়ান (LTTE)	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ (LIFG)	জেহাদী	October 2005
মরক্কান ইসলামিক কোম্বাটেন্ট গ্রুপ (GICM)	জেহাদী	-----------
মুজাহিদীনে খলক ওরগানাইজেশান (MEK)	জেহাদী	-----------
ন্যাশনাল লিবারেশান আর্মি (ELN)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
প্যালিষ্টাইন লিবারেশান ফ্রন্ট (PLF)	জেহাদী	-----------
প্যালিষ্টাইন ইসলামিক জিহাদ (PIJ)	জেহাদী	March 2001
পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশান অফ প্যালিষ্টাইন (PFLP)	জেহাদী	June 2014
আল কায়াদা ইন ইরাক (AQI)	জেহাদী	---------
আল কায়দা (AQ)	জেহাদী	March 2001
আল কায়দা ইন দি অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (AQAP)	জেহাদী	-----------
আল কায়দা ইন দি ইসলামিক মাগরিব (GSPC)	জেহাদী	------------
লিভোলিউশনারী আর্মড ফোর্স কলম্বিয়া (FARC)	সন্ত্রাসবাদী	-----------

লিভোলিউশনারী অরগানাইজেশান ১৭ নভেম্বর (LO/17 NOV)	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
লিভোলিউশনারী পিপলস লিবারেশান পার্টি (LPLP)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
লিভোলিউশনারী স্ট্রাগল (RS)	সন্ত্রাসবাদী	----------
সিনিং পথ (Sendero Luminoso)	জেহাদী	-----------
তাহরিক এ তালিবান পাকিস্তান (TTP)	জেহাদী	January 2011
ইউনাইটেড সেলফ ডিফেন্স ফোর্স অফ কলম্বিয়া (AUC)	সন্ত্রাসবাদী	----------
কোংরা গেল (KGK, formerly Kurdistan Workers' Party, PKK, KADEK)	জেহাদী	-----------
জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ (JUH)	জেহাদী	----------
জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম (JUI)	জেহাদী	----------
সিমি (SIMI/Student of Islamic Movement in India)	জেহাদী	-------
আর. এস. এস (RSS/Rastriya Sayam Sebak Sangha)	সন্ত্রাসবাদী	-----------
বজরং (Bajrang)	সন্ত্রাসবাদী	----------
শিবসেনা (Shivsena)	সন্ত্রাসবাদী	------------
সিপাহে সাহাবা পাকিস্তান (SSP)	জেহাদী	March 2001
হিজবুল মুজাহিদীন	জেহাদী	------------
জামাআতে ইসলামী	জেহাদী	------------
হিজব ই ইসলামী	জেহাদী	October 2005
আল গুরাবা	জেহাদী	July 2006
আল ইত্তেহাদ আল ইসলামিয়া	জেহাদী	October 2005
আল মুরাবিতুন	জেহাদী	April 2014
আনসার আল শারিয়া তুনিসিয়া	জেহাদী	April 2014
আনসার আল সুন্না	জেহাদী	October 2005
আনসার বাইতুল মাদীস	জেহাদী	April 2014
আনসারুল মুসলিমিনা ফি বিলাদিস সুদান	জেহাদী	November 2012
আর্মড ইসলামিক গ্রুপ	জেহাদী	March 2001
বাব্বার খালসা	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
বাস্ক হোমল্যান্ড অ্যান্ড লিবার্টি	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
বেলুচিস্তান লিবারেশান আর্মি	জেহাদী	July 2006
বোকো হারাম (জামাআতুল আহলু সুন্না লিদ্দাওয়াতি ওয়াল জিহাদ)	জেহাদী	July 2013
কন্টিনিউটি আর্মি কাউন্সিল	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
কুমান না বান	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ	জেহাদী	March 2001
ফিন্না নাহ এরিয়ান	জেহাদী	February 2001
গ্রুপ ইসলামিক কোম্বাটান্ট মরোক্কান	জেহাদী	October 2005
ইমরাত কাভকাস	সন্ত্রাসবাদী	December 2013
ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইউথ ফেডারেশান	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
আইরিশ পিপল লিবারেশান ওরগানাজেশান	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি	সন্ত্রাসবাদী	February 2001

ইসলামিক আর্মি অফ অ্যাডেন	জেহাদী	March 2001
ইসলামিক ষ্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম	জেহাদী	June 2014
জামিয়াহ ইসলামিয়া	জেহাদী	November 2002
কাতিবা আল কাওসার	জেহাদী	June 2014
কুর্দিস্তান ওয়ার্কস পার্টি	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
লোয়ালিষ্ট ভোলিন্টিয়ার ফোর্স	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
মিম্বার আনসার দ্বীন	সন্ত্রাসবাদী	July 2013
ওরেঞ্জ ভোলেন্টিয়ার	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ	জেহাদী	March 2001
রেড হ্যান্ড কমান্ডো	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
রেড হ্যান্ড ডিফেন্ডার্স	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
রেভিলিউশানরী পিপলস লিবারেশান পার্টি	সন্ত্রাসবাদী	March 2001
সালাফিস্ট গ্রুপ ফর কল অ্যান্ড কমব্যাট	জেহাদী	March 2001
সোয়ার এয়ার	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
সোভিয়র সেক্ট	সন্ত্রাসবাদী	July 2006
তেহরিক এ নেফায শরিয়াত মুহাম্মাদী	জেহাদী	July 2007
তাইরে আজাদিয়া কুর্দিস্তান	জেহাদী	January 2011
তুর্কিয়া হলক কুরতুলুস পারতিসি ক্যাফেসি	সন্ত্রাসবাদী	June 2014
উলেস্টের ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশান	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
উলেস্টার ফ্রিডম ফাইটার্স	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
উলিস্টার ভলিন্টিয়ার ফোর্স	সন্ত্রাসবাদী	February 2001
তালিবান	জেহাদী	--------
আউম সিংরিখো	সন্ত্রাসবাদী	--------
জামাআতুল মুজাহিদীন	জেহাদী	--------
ন্যাশনাল লিবারেশান আর্মি	সন্ত্রাসবাদী	--------
রিয়াল আই আর এ	সন্ত্রাসবাদী	--------
রেভোলিউশনারী নিউক্লিয়াই	সন্ত্রাসবাদী	--------
কাহানে চাই	সন্ত্রাসবাদী	--------
তাইজিম কিয়াদাত আল জিহাদ ফি বিলাদ আল রাফিদিয়ান	জেহাদী	--------
ইউনাইটেড সেলফ ডিফেন্স ফোর্স অফ কলম্বিয়া	সন্ত্রাসবাদী	--------
কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)	সন্ত্রাসবাদী	--------
কমিউনিষ্ট পার্টি অফ নেপাল	সন্ত্রাসবাদী	--------
ডেমোক্রেটিক ফোর্স ফর দি লিবারেশান অফ রাওয়ান্ডা	সন্ত্রাসবাদী	--------
ইষ্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট	জেহাদী	--------
ফার্স্ট অফ অক্টোবর অ্যান্টফ্যাসিস্ট রেসিডেন্স গ্রুপ	সন্ত্রাসবাদী	--------
ইসলামিক গ্রেট ইষ্ট রাইডার্স ফ্রন্ট	জেহাদী	--------
ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল পিসকিপিং ব্রিগেড	জেহাদী	--------
জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ	জেহাদী	--------
জাপানিজ রেড আর্মি	সন্ত্রাসবাদী	--------
কুমপুলান মুজাহিদীন মালয়েশিয়া	জেহাদী	--------

লর্ড রেসিডেন্স আর্মি	সন্ত্রাসবাদী	--------
নিউ রেড ব্রিগেড	সন্ত্রাসবাদী	--------
পিপল এগেনস্ট গ্যাঙ্গস্টেরিজম অ্যান্ড ড্রাগস	সন্ত্রাসবাদী	--------
রাজাহ সোলাইমান মুভমেন্ট	জেহাদী	--------
রেভিলিউশনারী প্রোলেটারিয়ান ইনিটিয়েটিভ নিউক্লিয়াই	সন্ত্রাসবাদী	--------
রিয়াদুস সালিকিন রেকোন্নাইসেন্স অ্যান্ড সোবাটেজ ব্যাটালিয়ান অফ চ্যাচান মার্টায়র্স	জেহাদী	--------
স্পেশাল পার্পাস ইসলামিক রেজিমেন্ট	জেহাদী	--------
তিউনিসিয়ান কমব্যাট গ্রুপ	সন্ত্রাসবাদী	--------
তুপাক আমারু রেভোলিউশনারী মুভমেন্ট	সন্ত্রাসবাদী	--------
তুর্কিস হিজবুল্লাহ	জেহাদী	--------
আবু বদর মুজাহিদীন	জেহাদী	--------
আল ইত্তেহাদ আল ইসলামি	জেহাদী	--------
আলেক্স বোনচায়াও ব্রিগেড	সন্ত্রাসবাদী	--------
ইসলামিক আর্মি অফ অ্যাডেন	জেহাদী	--------
আফগান সাপোর্ট কমিটি	জেহাদী	--------
আল তাকওয়া ট্রেড	জেহাদী	--------
আল মানার	জেহাদী	--------
আল মাওনা	জেহাদী	--------
আল নুর হানী সেন্টার	জেহাদী	--------
আল রশীদ ট্রাস্ট	জেহাদী	--------
আল ওয়াফা আল লাগাথা আল ইসলামিয়া	জেহাদী	--------
আর্নাচিষ্ট ফ্যাক্সন ফর ওভারথ্র	সন্ত্রাসবাদী	--------
ব্যাঙ্ক আল তাকওয়া	জেহাদী	--------
জাইসুল্লাহ	জেহাদী	--------
নাদা ম্যানেজম্যান্ট ওরগানাইজেশান	সন্ত্রাসবাদী	--------
নিউ পিপল আর্মি	সন্ত্রাসবাদী	--------
রেভিভ্যাল অফ ইসলামিক হ্যারিটেজ সোসাইটি	জেহাদী	--------
দি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড	জেহাদী	--------
দি পেন্টাগন গ্যাঙ্গ	সন্ত্রাসবাদী	--------
উম্মাহ তামিরে নাউ	জেহাদী	--------
ইউসেফ এম নাদা	জেহাদী	--------
আল হামাতি	জেহাদী	--------
আল নুসরা ফ্রন্ট	জেহাদী	--------
হাগানা	সন্ত্রাসবাদী	--------
হাশোমার	সন্ত্রাসবাদী	--------
ইরগুন জ্ভাই লেউমি (IZL)	সন্ত্রাসবাদী	--------
লেহামে হেরুত ইজরাইল (LHI)	সন্ত্রাসবাদী	--------
হারকাতুল তেহরির আল - ওয়াতন ফিলিস্তিন	জেহাদী	--------
মুনাদামাত তাহরির ফিলিস্তিন (PLO)	জেহাদী	--------
জাইশ তাহরির ফিলিস্তিন (PLA)	জেহাদী	--------

আবতাল আন্দা (হিরোজ অফ দি রিটার্ন)	জেহাদী	--------
জাভাত আল-শা বিয়ালি তাহরির ফিলিস্তিন (PFLP)	জেহাদী	--------
জাভাত আল-কিফা আল-শাবি আল-ফিলিস্তিন (PRSF)	জেহাদী	--------
জাভাত আল-শাবিয়ালি তাহরির ফিলিস্তিন আল-কিয়াদা আল-আমা (PFLP)	জেহাদী	--------
সাইকা (অশনিসংকেত)	জেহাদী	--------
কিয়াদাৎ আল কিফা আল মুসালা (PASC)	জেহাদী	--------
জাভাত আল জাহরির আল অ্যাবারিয়া (ALF)	জেহাদী	--------
জাভাত আল দিমুক্রা তিয়া জাহরির ফিলিস্তিন (DFLP)	জেহাদী	--------
মুনাদামাত আয়ল্ল আল আসওয়াদ	জেহাদী	--------
জাভাত আল ওয়াতা নিয়া আল ফিলিস্তিনিয়া ফি আল আরাদি আর মুহাতলা (PNF)	জেহাদী	--------
জাভাত আল রাফাদ	জেহাদী	--------
মুনাদামাত হুজাইরান আল আসওয়াদ	জেহাদী	--------
সিন ফেইন	সন্ত্রাসবাদী	--------
প্রভিশনান আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্ড (PIRA)	সন্ত্রাসবাদী	--------
সিন ফেইন ওয়ার্কাস পার্টি	সন্ত্রাসবাদী	--------
সিন ফিন সোশ্যালিষ্ট পার্টি	সন্ত্রাসবাদী	--------
আলস্টার ভলান্টিয়ার ফোর্স (UVF)	সন্ত্রাসবাদী	--------
আলস্টার প্রোটেস্ট্যান্ট ভলান্টিয়ারস্ (UVP)	সন্ত্রাসবাদী	--------
আলস্টার ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন (UDA)	সন্ত্রাসবাদী	--------
আলস্টার ফ্রিডম ফাইটার্স (UFF)	সন্ত্রাসবাদী	--------
ফুয়ের্জাস আর্মডাস ডি লিবারেসিওন ন্যাসিওনাল (FLN)	সন্ত্রাসবাদী	--------
এজারসিতো পপুলার ডি বারিকুয়া (EBP)	সন্ত্রাসবাদী	--------
মাচেতেরোস	সন্ত্রাসবাদী	--------
কোআর্ডিনাসিওন ডি অর্গানাসিওনেস রেভোলিউসিওনারিওস ইউদিনাস (CORU)	সন্ত্রাসবাদী	--------
ওমেগা ৭	সন্ত্রাসবাদী	--------
ব্ল্যাক পন্থার পার্টি (BPP)	কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠন	--------
অর্গানাইজেশান অফ আফ্রো আমেরিকান ইউনিট	কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠন	--------
কু ক্লুক্স ক্ল্যান (KKK)	সন্ত্রাসবাদী	--------
ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ফর হোয়াইট পিপল'স পার্টি (NSWPP)	সন্ত্রাসবাদী	--------
এরিয়ান নেশন্স্	সন্ত্রাসবাদী	--------
ক্রিশ্চিয়ান পেট্রিয়টস ডিফেন্স লিগ	সন্ত্রাসবাদী	--------
দি কভেনান্ট, দি শোর্ড অ্যান্ড দি আর্ম অফ দি লর্ড	সন্ত্রাসবাদী	--------
দি অর্ডার	সন্ত্রাসবাদী	--------
পোজ কমিটাটাস	সন্ত্রাসবাদী	--------
স্কিনহেড্স	সন্ত্রাসবাদী	--------
জুইশ ডিফেন্স লিগ	সন্ত্রাসবাদী	--------
ইখওয়ানুল মুসলিমিন	জেহাদী	--------
গ্রুপ ইসলামিক আর্মি	জেহাদী	--------

মোরো ইসলামিক লিবারেশান ফ্রন্ট	জেহাদী	--------
পত্তনি ইউনাইটেড লিবারেশান অর্গানাইজেশান ()	জেহাদী	--------
মুজাহিদিন	জেহাদী	--------
জাভাত তাহরির ফিলিস্তিন (PLF)	জেহাদী	--------
কুর্দিস্তান ওয়ার্কস পার্টি (KKK)	সন্ত্রাসবাদী	--------
পি. এফ. এল. পি জেনারেল কমান্ড (PFLP-GC)	সন্ত্রাসবাদী	--------
রেড আই আর. এ	সন্ত্রাসবাদী	--------
রেভিউশনারি নিউক্লি	সন্ত্রাসবাদী	--------
রেভিউশনারি পিপল’স লিবারেশান আর্মি ফ্রন্ট (DHK/PL)	সন্ত্রাসবাদী	--------
আল আকসা মাসট্যার ব্রিগেড	জেহাদী	--------
ইসলামিক মুভমেন্ট অফ উজবেকিস্তান (IMU)	জেহাদী	--------
রিয়েল আই আর এ	জেহাদী	--------

পরিশিষ্ট : ৪

সন্ত্রাসবাদী ও মুজাহিদীনদের নামের তালিকা

নাম	সংগঠন	স্থান
ওসামা বিন লাদেন	আল কায়দা (AQ), সুন্নী	মুজাহিদ
মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ	তালিবান (Taliban), সুন্নী	মুজাহিদ
মাসউদ আযহার	জাইস ই মুহাম্মাদ (JEM), সুন্নী	মুজাহিদ
বাইতুল্লাহ মাহমুদ	তাহরিকে তালিবান পাকিস্তান (TTP) ,সুন্নী	মুজাহিদ
আবু বকর আল বাগদাদী	ইসলামিক ষ্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম, সুন্নী	মুজাহিদ
সিনিয়ার জর্জ ডব্লু বুশ	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
বারাক হোসেন ওবামা	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
বিল ক্লিন্টন	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
জুনিয়ার জর্জ বুশ	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
নরেন্দ্র মোদী	ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)	সন্ত্রাসবাদী
অটল বিহারী বাজপেয়ী	ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)	সন্ত্রাসবাদী
সাদ্দাম হোসেন	সুন্নী (ASWJ)	মুজাহিদ
আইমান আল জাওয়াহিরী	আল কায়দা (AQ), সুন্নী	মুজাহিদ
আনওয়ার আলাওয়াকী	আল কায়দা (AQ), সুন্নী	মুজাহিদ
সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী	জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ, সুন্নী	মুজাহিদ
ইসমাইল শহীদ দেহলবী	তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া (দেওবন্দী), সুন্নী	মুজাহিদ
সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী	তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া (দেওবন্দী), সুন্নী	মুজাহিদ
মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী	দেওবন্দী, সুন্নী	মুজাহিদ
সত্য রামপাল	হিন্দুত্ববাদী	সন্ত্রাসবাদী
আসারাম বাপু	হিন্দুত্ববাদী	সন্ত্রাসবাদী
সেখ হাসিনা	আওয়ামী লিগ (AL)	সন্ত্রাসবাদী
মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী	দেওবন্দী, সুন্নী	মুজাহিদ
মুহাম্মাদ বিন কাসিম	সুন্নী (ASWJ)	মুজাহিদ

নাথুরাম গডসে	আর. এস. এস (RSS)	সন্ত্রাসবাদী
হোসাইন আহমদ মাদানী	জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ (JUH), সুন্নী	মুজাহিদ
ডেভিড লেডলী	লস্কর ই তাইয়েবা (LT)	সন্ত্রাসবাদী
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	কংগ্রেস, দেওবন্দী, সুন্নী	মুজাহিদ
স্বামী অসীমানন্দ	আর. এস. এস (RSS)	সন্ত্রাসবাদী
প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর	আর. এস. এস (RSS)	সন্ত্রাসবাদী
হক নাওয়াজ ঝাঙ্গভী	সিপাহে সাহাবা পাকিস্তান (SSP), সুন্নী	মুজাহিদ
কিষেনজী	মাওবাদী (MAOIST)	সন্ত্রাসবাদী
অ্যাডলফ হিটলার	ফ্যাসিবাদী	সন্ত্রাসবাদী
মাও সে তুং	মাওবাদী (MAOIST)	সন্ত্রাসবাদী
আব্দুল্লাহ আযযাম	আল কায়দা (AQ), সুন্নী	মুজাহিদ
জালালুদ্দিন হাক্কানী	সুন্নী (ASWJ)	মুজাহিদ
রাবিশ চেনাইন	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
অ্যানড্রু রো	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
ধিরেন বারোত	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
লাল কৃষ্ণ আদবানী	ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)	সন্ত্রাসবাদী
অশোক সিংহল	হিন্দু মহাসভা	সন্ত্রাসবাদী
ছত্রপতি শিবাজী	দস্যু (ডাকাত)	সন্ত্রাসবাদী
এম. এস. গোলওয়ালকার	আর. এস. এস (RSS)	সন্ত্রাসবাদী
ইয়াসির আরাফাত	সুন্নী (ASWJ)	মুজাহিদ
দাউদ ইব্রাহীম	মুসলমান	সন্ত্রাসবাদী
উহুদ ওলমার্ট	ইহুদী (জায়নিস্ট)	সন্ত্রাসবাদী
বাল ঠাকরে	শিবসেনা (Shivsena)	সন্ত্রাসবাদী
জর্জ ওয়াশিংটন	খ্রিষ্টান	সন্ত্রাসবাদী
ধানু (রাজীব গান্ধীকে হত্যাকারী)	LTTE	সন্ত্রাসবাদী
সঞ্জয় দত্ত	হিন্দু	সন্ত্রাসবাদী
আবু সেলিম	মুসলমান (নামমাত্র)	সন্ত্রাসবাদী
আজমল আমীর কাসাব	মুসলমান (নামমাত্র)	সাধারণ মানুষ
মেনাফেম বেগেন	ইহুদী (জায়নিস্ট)	সন্ত্রাসবাদী
ফকির মজনু শাহ	স্বাধীনতা সংগ্রামী	মুজাহিদ
মীর নিসার আলী (তিতুমীর)	স্বাধীনতা সংগ্রামী	মুজাহিদ
হাজী শরীয়াতুল্লাহ	স্বাধীনতা সংগ্রামী	মুজাহিদ
শ্যারন	ইহুদী (জায়নিস্ট)	সন্ত্রাসবাদী
সতবন্তসিং (ইন্দ্রিরা গান্ধীর দেহরক্ষী)	শিখ	সন্ত্রাসবাদী
বিয়ন্ত সিং (ইন্দ্রিরা গান্ধীর দেহরক্ষী)	শিখ	সন্ত্রাসবাদী
সঞ্জয় দত্ত	হিন্দু	সন্ত্রাসবাদী
ইসামাইল খান	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
বাবর ইমরান	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
নাসীর (আবু ওমর)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
সোয়াইব (আবু সাহেব)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
নাযীর (আবু ওমর)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী

সোয়াইব (আবু সাহেব)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
নাযীর (আবু ওমর)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
হাফিয আরশাদ(আবু আব্দুর রহমান)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
জাভেদ (আবু আলী)	লস্কর এ তাইয়েবা	সন্ত্রাসবাদী
লাল কৃষ্ণ আদবানী	ভারতীয় জনতা পার্টী (BJP)	সন্ত্রাসবাদী
তসলিমা নাসরিন	নাস্তিক (কাফের)	সন্ত্রাসবাদী
সলমন রুশদী	নাস্তিক (কাফের)	সন্ত্রাসবাদী
প্রবীর ঘোষ	নাস্তিক (কাফের)	সন্ত্রাসবাদী

পরিশিষ্ট : ৫

সন্ত্রাসবাদী হিসেবে পরিচিত নয়, এমন কয়েকটি সংগঠন

সংগঠন	স্থান
অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স : ওআইসির সহায়ক সংস্থা	জেদ্দা
দি স্ট্যাটিস্টিক্যাল, ইকনমিক, সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টা ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ	আঙ্কারা, তুরস্ক প্রজাতন্ত্র
দি রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট অ্যান্ড কালচার	ইস্তাম্বুল তুরস্ক প্রজাতন্ত্র
দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি,	সদরদপ্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ
দি ইসলামিক সেন্টার ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ ট্রেড	সদর দপ্তর : কাসাব্লাঙ্কা, কিংডম অফ মরোক্কো
দি ইসলামিক ফিক (Fiqh) অ্যাকাডেমি,	সদর দপ্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব
দি একজিকিউটিভ ব্যুরো অফ দি ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড অ্যান্ড ইট্স্ ওয়াকফ,	সদর দপ্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব
দি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক : (IDB)	সদরদপ্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব
দি ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন : (ISESCO)	সদরদপ্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব
দি ইসলামিক স্টেটস ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন : (ISBO)	সদরদপ্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব
ইসলামিক চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	করাচি, পাকিস্তান
অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক ক্যাপিটালস্ অ্যান্ড সিটিজ	মক্কা/জেদ্দা, সৌদি আরব
স্পোর্টস ফেডারেশন অফ ইসলামিক সলিডারিটি গেমস্	রিয়াদ, সৌদি আরব
ইসলামিক কমিটি অফ দি ইন্টারন্যাশনাল সিক্রেট	বেনগাজি
ইসলামিক শিপওনার্স অ্যাসোশিয়েশন : (ISA)	জেদ্দা, সৌদি আরব
ওয়ার্লড ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল আরবো ইসলমিক স্কুলস্	জেদ্দা, সৌদি আরব
ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইসলামিক ব্যাঙ্কস্	(জেদ্দা, সৌদি আরব)
তবলিগ জামাআত	উৎপত্তি ভারত, কর্ম : সারা বিশ্ব
জামাত - ই - ইসলামি	(ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ)
স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (SIMI)	ভারত

অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম ইন্টেলেকচুয়ালস্ (ICMI)	ইন্দোনেশিয়া
ওয়ার্লড মুসলিম কমিটি ফর সলিডারিটি (KISDI)	ইন্দোনেশিয়া
ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অ্যাক্এ (Aceh) সুমাত্রা (জিপিকে-অ্যাক্এ, পরতাই পেরসাতুয়ান পেমবান্গুনান/PPP)	ইন্দোনেশিয়া
সিক্রেট অ্যান্ড স্টার : পরতাই বতন বেনতাঙ্গ (PBB)	ইন্দোনেশিয়া
দেওয়ান ডাকওয়া	ইন্দোনেশিয়া
পারতাই ইসলাম সে মালিশিয়া : (PAS) মালিশিয়ান ইসলামিক পার্টি	মালিশিয়া
দি ডাকওয়ান	মালিশিয়া
আল আরকাম	মালিশিয়া
ইসলামিক রিপ্রেজেন্টিভ কাউন্সিল (IRC)	মালিশিয়া
ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মুসলিম স্টুডেন্টস্	মালিশিয়া
মালিশিয়ান মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট : আংগকাতান বেলিয়া ইসলাম মালিশিয়া (ABIS)	মালিশিয়া
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (JUI), অ্যাসোসিয়েশন অফ উলামা অফ ইসলাম	পাকিস্তান,
জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, (JUP) অ্যাসোসিয়েশন অফ পাকিস্তানি উলামা	পাকিস্তান,
দি তালিবান (ছাত্র)	আফগানিস্তান
ওয়ার্লড মুসলিম লিগ,	সৌদি আরব
ইসলামিক আর্মি অফ অডেন	ইয়েমেন
দি ফাজিলত (ভার্চু পার্টি)	তুরস্ক
আল গামা আল ইসলামিয়া	ইজিপ্ট
ফ্রন্ট ইসলামিক দি সালুত (FIS)	আলজেরিয়া
দি অ্যাসোসিয়েশন অফ মুসলিম উলেমাস্	আলজেরিয়া
ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF)	সুদান
মুভমেন্ট দি লা তেনদেন্স ইসলামিকি (MTI)	তিউনিশিয়া
আল নাহাদা (জাগরণ)	তিউনিশিয়া
ইসলামি কল সোসাইটি	লিবিয়া
স্তংকো দেমোক্রাৎস্কে আকিজে (SDA)	ফ্রান্স
ইউনিয়ান দি অর্গানাইজেশন্ ইসলামিকি দি ফ্রান্স	ফ্রান্স
ইউনাইটেড কিংডম	ফ্রান্স
ইউনাইটেড কিংডম ইসলামি মিশন	ফ্রান্স

: সমাপ্ত :

তথ্যসূত্র

বই পুস্তক

(১) কুরআন শরীফ - ---
(২) কানযুল উম্মাল -
(৩) মুসনাদে আহমদ - ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)
(৪) বাইহাকী শরীফ - ইমাম বাইহাকী (রহঃ)
(৫) তিবরানী - হযরত ইমাম তিবরানী (রহঃ)
(৬) ফতহুল বারী - আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)
(৭) উমদাতুল কারী - আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ)
(৮) আল মিরকাতুল মাফাতিহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ - মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ)
(৯) আল বিদায়া ওয়াস সানায়া -
(১০) সুনানে নাসাই - হযরত ইমাম নাসাই (রহঃ)
(১১) হিন্দুধর্মের গোপন কথা - মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী
(১২) সন্ত্রাস এত বারছে কেন ? - সাংবাদিক জয়ন্ত সিংহ
(১৩) তেহেলকা (পত্রিকা) ট্র
(১৪) কী ঘটছে লালগড়ে ? - বিমান বসু
(১৫) বেনজির ভুট্টো ও পাক রাজনীতি - মিহির কর্মকার
(১৬) কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা
(১৭) স্বাধীনতার ফাঁকি - বিমলানন্দ শামসল
(১৮) আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান - ডঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ)
(১৯) আফগানিস্থানে আমি আল্লাহকে দেখেছি - উবাইদুর রহমান খান নাদবী
(২০) মুজাহিদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী - মুহাম্মাদ ওমর ফারুক
(২১) মুসলিম মৌলবাদ ও মুসলিম জনমানস - সেখ সাইদুল হক
(২২) কোলকাতা নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষন, তাং ১৬/১০/১৯৯৭ - মুলায়ম সিং যাদব
(২৩) আমাদের পূর্বসুরী ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গ -
(২৪) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের অবদান -
(২৫) রাভিলিউশন ইন ইনডিয়া এবং কুটওয়্যার পলিশি -
(২৬) উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন -
(২৭) দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রদত্ত ভাষন, দারুল উলুম দেওবন্দ - ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ
(২৮) কোলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষন, ইং-২৯/০১/১৯৯৪ - শিশির বসু
(২৯) ভারতের ইতিহাস, দশম শ্রেনী, জানুয়ারী ১৯৮৯ - অমলেন্দু দে
(৩০) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা - সত্যেন সেন
(৩১) আধুনিক ভারতের ইতিহাস ট্র
(৩২) আধুনিক ভারতের ইতিহাস - ড. কল্যান চৌধুরী
(৩৩) ভারত কি করে ভাগ হল ? - বিমলানন্দ শামসল
(৩৪) ১৯৬৩ সালের মে মাসে মীরাট শহরে প্রদত্ত ভাষন - পন্ডিত সুন্দর লাল
(৩৫) মুক্তি সংগ্রামে ভারত -
(৩৬) বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য - হীরন্দ্রেনাথ বন্দোপাধ্যায়
(৩৭) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান - সেখ আজিবুল হক
(৩৮) আক্রান্ত আমেরিকা অগ্নিগর্ভ বিশ্ব - সাংবাদিক বরুন মজুমদার

(৩৯) প্রসঙ্গ ঃ তালিবান, বৌদ্ধমূর্তি বিতর্ক, কোরআন অবমাননা ও কানপুর দাঙ্গা - (সম্পাদক) আবু রিদা
(৪০) আই. এস. আই অভিযোগ ও চক্রান্তের বেড়াজালে মাদ্রাসা, মসজিদ, মুসলিম ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান, সম্পাদক - আবু রিদা
(৪১) ফ্যাসিবাদ ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জল্লাদী স্বরুপ -শুভাশিস গুপ্ত
(৪২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিকল্প নরেন্দ্র মোদীর সাজানো পুলিসী সংঘর্ষ - (সম্পাদক) আবু রিদা
(৪৩) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম মৌলবাদ - ঐতিহাসিক প্রফেসার গৌতম রায়
(৪৪) গুজরাট ও হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ - ঐতিহাসিক প্রফেসার গৌতম রায়
(৪৫) ভারত ইতিহাসের ধারা ও সংঘ পরিবার - ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু
(৪৬) ইতিহাসের অন্তরালে - শ্যামাপ্রসাদ বসু
(৪৭) ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে ? মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
(৪৮) ম্যায়নে কাবুল বসতে দেখা (উর্দু) - মুহাম্মাদ মকসুদ আহমদ
(৪৯) সন্ত্রাসবাদের জন্য কি মুসলিমরা দায়ী ? - ড. জাকির নায়েক
(৫০) সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ - ড. জাকির নায়েক
(৫১) ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় - গোলাম আহমদ মোর্তাজা
(৫২) সন্ত্রাসবাদ না জেহাদ ? - গোলাম মোর্ত্তজা
(৫৩) ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধের কথা বলে তবুও মাদ্রাসা কেন সন্ত্রাসের কাঠগড়ায় ? - সম্পাদক মতিয়ার রহমান (জনতার আদালত পত্রিকার সম্পাদক)
(৫৪) লাশের পাহাড়ে ইহুদি শয়তান কাঁদে ফিলিস্তিন কাঁদে মুসলমান - (সম্পাদক) মতিয়ার রহমান
(৫৫) হিন্দুত্বের ইজরাইল দর্শন আগ্রাসনের চক্রান্তে ইহুদি শয়তান কী ভাবছেন আজকের মুসলমান - (সম্পাদক) মতিয়ার রহমান
(৫৬) ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান - ঐতিহাসিক শান্তিময় রায়
(৫৭) ইসলাম ৯/১১ ও বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদ - আই. পি. এস. অফিসার ড. নজরুল ইসলাম
(৫৮) প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং..... - প্রবীর ঘোষ
(৫৯) অধিকার হরণ হয় দিনে রাতে - জয়ন্ত সিংহ
(৬০) ইসলাম মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ - হোসেনুর রহমান
(৬১) মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা - ড. জাকির নায়েক
(৬২) পুস্তক সম্রাট - গোলাম আহমদ মোর্তাজা
(৬৩) The Culture and Civillization of India : V D Kosambi/Brahminical Conspiracy Behind Masjid Demolition : By M. Gopinath
(৬৪) Killing in the name of Good (Osama Bin Laden) By Jerrold M. Post M.D
(৬৫) The Indian Muslims By W.W Hunter
(৬৬) The India Struggle By Netaji Subhas Chandra Basu
(৬৭) Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif
(৬৮) What is Terrorism ? -
(৬৯) Foreign Terrorist Organization -
(৭০) Jihadi terrorists in Europe By Edwin Bakker
(৭১) List of Terrorist Organizations Whose Members and Supporters Are Barred Admission Under the INA
(৭২) How Successful Is Terrorism? By James M. Lutz and Brenda J. Lutz
(৭৩) Mapping Terrorist Organizations By Martha Crenshaw
(৭৪) The International Fight against Terrorism and the Protection of Human Rights By Wolfgang S. Heinz Jan-Michael Arend Study
(৭৫) Terrorism and Philippine Armed Groups: Networks, Lists, and the Peace Process

(Overview) - Soliman M. Santos, Jr.
(৭৬) Foreign Terrorist Organizations
(৭৭) Terrorist Exclusion List -
(৭৮) The Terrorism Act 2000: Proscribed Organisations By Sally lipscombe
(৭৯) L' Effroyable Imposture (English Name - The Horrible Fraud) By Thierry Meyssan
(৮০) The Age of Terrorism (2nd ed.) By Boston: Little & Brown)
(৮১) Inside Terrorism (New York: Columbia University Press) By Hoffman, Bruce.
(৮২) Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. Amsterdam: North Holland, Transaction Books. By - Schmid, Alex, & Jongman, Albert.
(৮৩) International Terrorism: National, Regional and Global Perspectives. New York: Praeger) By Alexander, Yonah (1976).
(৮৪) Terrorism: The Present Threat in Context. (Oxford: Berg Publishers.) By Sloan, Stephen.
(৮৫) League Convention (1937). Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.
Article
(৮৬) Joint Chiefs of Staff DOD (2008). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Washington, D.C.: DOD.
(৮৭) (U.S. Department of State (1996). Patterns of Global Terrorism: 1995. Washington, D.C.:
U.S. Department of State.)
(৮৮) Aiman Al-Zawahiri : The Ideologue of Modern Islamic Militancy - By Yousuf H. Aboul-Enein
(৮৯) The Taliban
(৯০) History of the Byzantine Empire
(৯১) A History of Europe By H. A. L. Fasher
(৯২) Historical Role of Islam By M. N. Roy
(৯৩) Terrorist Attacks in Mumbai: Picking Up the Pieces By Mr. Arabinda Acharya- Manager, Strategic Projects, ICPVTR Ms. Sujoyini Mandal, Senior Analyst, ICPVTR Ms Akanksha Mehta, Analyst, ICPVTR
(৯৪) The biography of Sheikh Abu Bakr Al-Baghdadi Amir of the Islamic State in Iraq and Al-Sham
(৯৫) Profile of Dr. Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden's Heir as Leader of Al-Qaeda

পত্র পত্রিকা

(৯৬) Indian Express -
(৯৭) The Times of India – (Editor) Robert Knight
(৯৮) Sunday Express - (Editor)
(৯৯) Milli Gazatte -
(১০০) দৈনিক পুধারী (পত্রিকা) -
(১০১) পুনে মিরর (পত্রিকা) ট্র
(১০২) মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন -

(১০৩) কমিউনিজম কমব্যাট -
(১০৪) দৈনিক লোকমত (পত্রিকা) -
(১০৫) দৈনিক ভাস্কর (পত্রিকা) -
(১০৬) সাপ্তাহিক নতুন গতি, কলকাতা - (সম্পাদক) ইমদাদুল হক নুর
(১০৭) সাপ্তাহিক জনতার আদালত, কলকাতা - সম্পাদক, মতিয়ার রহমান
(১০৮) দৈনিক আজকাল (পত্রিকা), কলকাতা -
(১০৯) কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা
(১১০) নেদায়ে ইসলাম ঃ ১৩শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা - হোসামুদ্দীন
(১১১) আফটারনুন, মুম্বাই,
(১১২) মিড ডে, মুম্বাই,
(১১৩) এশিয়ান এজ, মুম্বাই,
(১১৪) সকাল, পুনা (পত্রিকা)
(১১৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা - (সম্পাদক) অভীক সরকার
(১১৬) মারাঠী পত্রিকা 'বহুজন সংঘর্ষ' (পত্রিকা)
(১১৭) দ্য টেলিগ্রাফ, কোলকাতা (পত্রিকা)-
(১১৮) দ্য সান্ডে, কোলকাতা (পত্রিকা)-
(১১৯) হিন্দুস্তান টাইমস, দিল্লী (পত্রিকা)-
(১২০) আজ কা আনন্দ, পুনা (পত্রিকা)-
(১২১) তরুন ভারত, কোলহাপুর, (পত্রিকা) -
(১২২) সংবাদ প্রতিদিন, কোলকাতা (পত্রিকা), - (সম্পাদক) সৃঞ্জয় বোস
(১২৩) দৈনিক মারাঠী, মহারাষ্ট্র (পত্রিকা) -
(১২৪) নিউইয়ার্ক টাইমস (পত্রিকা) -
(১২৫) দৈনিক কলম (পত্রিকা) - সম্পাদক -

ওয়েবসাইট

(১২৬) www.siasat.com
(১২৭) www.amarujala.com
(১২৮) www.navbharattimes.indiatimes.com
(১২৯) www.aajkaal.net
(১৩০) www.bdmonitor.net
(১৩১) www.epaper.eisamay.com
(১৩২) www.zeenews.com
(১৩৩) www.archive.indianexpress.com
(১৩৪) www.m.timesofindia.com
(১৩৫) www.oneindia.com
(১৩৬) www.echarcha.com
(১৩৭) www.thefreelibrary.com
(১৩৮) www.dnaindia.com
(১৩৯) www.indiatomorrow.net
(১৪০) http://balthakreyexposed.blogspot.in
(১৪১) www.bhaskar.com
(১৪২) www.ajtak.in

(১৪৩) www.rediff.com
(১৪৪) www.indianexpress.com
(১৪৫) http//:www.quora.com/Is-it-true-that-VHPs-Ashok-Singhals-daughter-is-married-to-Mukhtar-Abbas-Nakv
(১৪৬) http//:www.islam-watch.org//home/73-brahmachari/943-love-jihad-suffering-of-victims.html
(১৪৭) www.islamicmehfil.com
(১৪৮) www.tauheed-sunnat.com
(১৪৯) www.islamic-creed.com
(১৫০) www.wikiislam.net/wiki/Mamta_Kulkarni_-_Conversion_to_Islam

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিত)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।

(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605

(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।

(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।

(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।

(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029

(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012

(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668

(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।

(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668

(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225

(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395

(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560

(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943

(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353

(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।
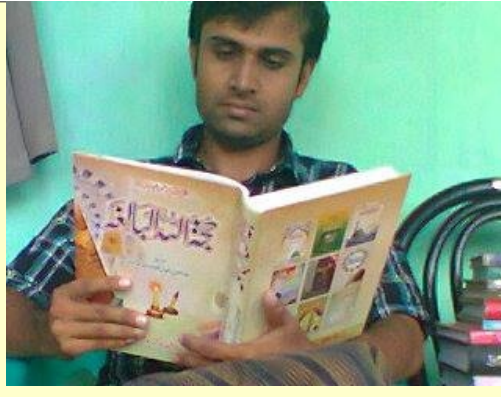
লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, ভারত, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমেরি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু কানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এর পর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

পেশা ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু ও বর্তমান পরিস্থিত নিয়ে লেখা ও বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা ।

শখ ঃ ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা, ক্রিকেট খেলা ও দেখা ।

প্রথম পুস্তক ঃ শিরক ও বিদ্আত সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক 'ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব' বিদ্আতীদের হাঙ্গামায় ২০১০ সালে বন্ধ হয়ে যায় ।